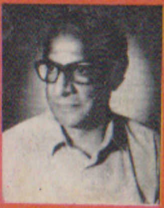

আসকার রচনাবলী

৬

আসকার
রচনাবলী

৬

www.pathagar.com

ISBN : 984-455-088-2
শিপ্র : ২৩৯ : ১৯৯৬
আসকার রচনাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড) সম্পাদনাঃ আবিদ আজাদ; প্রথম প্রকাশ ঃ ঢাকা বই মেলা ১৯৯৬ জানুয়ারি ১৯৯৬, মাঘ ১৪০২; স্বত্ব ঃ লেখক। প্রকাশক ঃ শিল্পতরু প্রকাশনী ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা- ১২০৫, পোষ্ট বক্স নং ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ মুদ্রণঃ শিল্পতরু প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড এ্যাডভার্টাইজার্স ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫, পোষ্ট বক্স নং ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ কম্পোজঃ সাইফুল, আইয়ুব। প্রচ্ছদ ঃ মৃণাল নন্দী।
মূল্য ঃ ২০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-455-088-2
SP : 239 : 1996
Askar Rachanabali (6th Vol) : Edited by Abid Azad; Date of Publication : Dhaka Book Fair 1996. January 1996. Magh 1402: Published by Shilpatoroo Prakashani 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352. 864264 Printed by Shilpatoroo Printers & Advertisers 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352. 864264 Copyright : Author Compose: Saiful. Ayub. Cover Design : Mrinal Nandi
Price : S 10 Only

www.pathagar.com

আসকার রচনাবলী ৬

সম্পাদনা
আবিদ আজাদ

শিল্পতরু প্রকাশনী

www.pathagar.com

'আসকার রচনাবলী'র ষষ্ঠ খন্ড লেখকের এমন একটা সময়কে প্রেক্ষাপটে নিয়ে সাজানো হয়েছে যে সময়টা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ও নানা মতামতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রচন্ড রকমে আক্রান্ত। এমনি পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার-প্রচারণার সুযোগ যথেষ্টই থাকে। বরং সুদূরপ্রসারী কোনো বিদ্বেষ ভিত্তিক মতলবী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এমন পরিস্থিতি সুবর্ণ সুযোগই এনে দেয়। আর তাতে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন সেই বিদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার উষাকালে এমনি বিপদেই পড়েছিলেন আসকার ইবনে শাইখ। সেই বিপদ ও তার থেকে পরিত্রাণ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর জীবন-কথার কিছু কথায়।

স্বাভাবিক ভাবেই এই বিপন্ন সময়টায় নিয়মিত নাট্যচর্চার সুযোগ তাঁর ছিল না। তবুও তিনি নাট্য প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেননি। আর্থিক অনটনের মধ্যেও নিজ বাসগৃহে চালিয়ে গেছেন নাট্য একাডেমীর কর্মকান্ড। তদুপরি, তাঁর কাছে শুনেছি—একাত্তরের ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে বায়াত্তরের জানুয়ারীর মধ্যে তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত অনেক নাটক-নাটিকার বই ও পান্ডুলিপি 'পরিকল্পিত ভাবেই' নষ্ট করে দেয়া বা সরিয়ে ফেলা হয়। নিজেরই কয়েকটি নাটক তিনি পরে ফুটপাতের নানা দোকান থেকে কিনে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। কোথা থেকে কি ভাবে তা করা হয়েছে তার বর্ণনায় না গিয়ে এই বলেই প্রসঙ্গটা শেষ করছি যে ওই সময়টা তাঁর জন্য সত্যিই ছিল এক চরম দুর্যোগকাল।

এই সময়ের কিছুটা আগেকার রচনাই প্রধানত এই খন্ডে উপস্থাপিত হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২ — আবিদ আজাদ

www.pathagar.com

১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত আমার জীবনের চরম দুর্যোগকালের সঙ্গী ও
সাহায্যকারী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট মোঃ এয়াকুব আলী
সাহেবের নামে উৎসর্গীত হল 'আসকার রচনাবলী'র এই ষষ্ঠ খন্ড –

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

তিতুমীর	রচনাকাল ঃ ১৯৫৩; প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৯
(মঞ্চ নাটক)	দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৮০
	প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
	মুদ্রাকর ঃ জেসমিন প্রিন্টিং প্রেস
	৬/১ নয়া পল্টন, ঢাকা–২
	মূল্য ঃ ৩·০০
একটি পুরনো বাক্স	রচনাকাল ঃ ১৯৬৬
(টেলি–নাট্য)	টেলিভিশনে প্রচারকাল ঃ ১৯৬৬
	প্রথম প্রকাশ ঃ দৈনিক ইনকিলাব
সমান্তরাল	রচনাকাল ঃ ১৯৬৭
(টেলি–নাট্য)	টেলিভিশনে প্রচারকাল ঃ ১৯৬৭
শিমুলতলী নাম	রচনাকাল ঃ ১৯৬৭
(টেলি–নাট্য)	টেলিভিশনে প্রচারকাল ঃ ১৯৬৭
	রেডিও পাকিস্তানের পাক্ষিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত
অপদার্থ	রচনাকাল ঃ ১৯৬৭
(টেলি–নাট্য)	টেলিভিশনে প্রচারকাল ঃ ১৯৬৭
শপথ নিলাম	রচনাকাল ঃ ১৯৬৬
(কিশোর–নাট্য)	টেলিভিশনে প্রচারকাল ঃ ১৯৬৬
নিঃসঙ্গ নীলিমা	রচনাকাল ঃ ১৯৬৭
(টেলি–নাট্য)	
বকুলগন্ধ ভোর	রচনাকাল ঃ ১৯৬৭
(টেলি–নাট্য)	টেলিভিশনে প্রচারকাল ঃ ১৯৬৭
সাতচল্লিশোত্তর	রচনাকাল ঃ ১৯৭১
আমাদের মঞ্চনাট্য	আসকার ইবনে শাইখ রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ
(প্রবন্ধ)	'বাংলা মঞ্চ–নাট্যের পশ্চাৎভূমি'তে অন্তর্ভুক্ত
সখী সোনার উপকথা	রচনাকাল ঃ ১৯৬৮
(উপকথা)	
রক্ত চাই	রচনাকাল ঃ ১৯৭৩; পুনর্লিখনকালঃ ১৯৮০
(টেলি–নাট্য)	
কিছু গান	রচনাকাল ঃ ষাটের দশক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মঞ্চ নাটক

তিতুমীর ৯

ছন্দোবদ্ধ কিশোর-নাট্য

শপথ নিলাম ১৯১

টেলি—নাট্য

একটি পুরনো বাক্স ৭৯

সমান্তরাল ১০৫

শিমূলতলী নাম ১৩৩

অপদার্থ ১৬৭

নিঃসঙ্গ নীলিমা ২৩৮

বকুলগন্ধ ভোর ২৬৭

প্রবন্ধ

সাতচল্লিশোত্তর

আমাদের মঞ্চ-নাট্য ২০৩

উপকথা

সখী সোনার উপকথা ২২৫

কিছু গান ২৩২

আত্মজীবনী ২৯৫

জীবন বৃত্তান্ত ৩১৫

www.pathagar.com

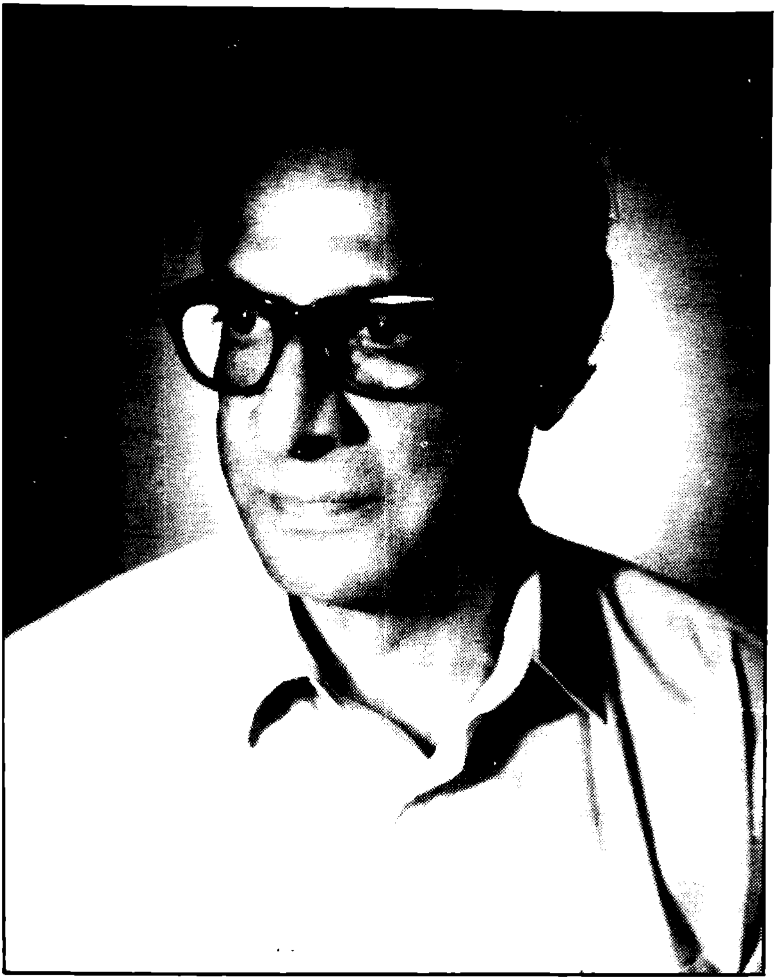

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

(প্রথম সংস্করণ)

অতীতের যেসব সংগ্রামী চরিত্র আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে, শহীদ তিতুমীর তাঁদের অন্যতম। পলাশীর প্রায় শতবর্ষ পর এই দেশ যখন পরাধীনতার লাঞ্ছনায় ও শাসন-শোষণের অত্যাচারে জীবন্মৃত, বিশেষ করে অধঃপতিত মুসলিম সমাজ যখন দারিদ্র আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এ-দেশবাসীর মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন। দেশভ্রমণে বের হন তিনি, পালন করেন পবিত্র হজ্বব্রত। ইসলামের শিক্ষায়-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে আসেন মাতৃভূমিতে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তখন সরহিন্দের বীর মুজাহিদ সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে চলছে 'ওয়াহাবী' আন্দোলন। এদেশেও তিতুমীর আরম্ভ করেন এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, যাকে বলা হত 'মুহাম্মদী' আন্দোলন। নিঃসন্দেহে, এ-আন্দোলনের আরম্ভ ধর্মীয় সংস্কার অবলম্বী হলেও তার লক্ষ্য ছিল দেশের মুক্তি-প্রয়াস। এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত তদানীন্তন দেশী-বিদেশী জমিদার-নীলকর প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা ভোগীরা তিতুমীরের লক্ষ্য নির্ণয়ে ভুল করে নি। তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা ইংরেজ সরকারের সহায়তায় ধ্বংস করে দেয় তিতুমীরের মুক্তি-আন্দোলনকে। ধ্বংস করে দেয় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাকে। কিন্তু তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা তো শুধুমাত্র একটা বাহিনীর আশ্রয়-কেন্দ্রই ছিল না, ছিল তারও চাইতে বেশি কিছু। প্রকৃত অর্থে, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল জাগ্রত মানুষের এক বিশ্বাস-দুর্গ, খাঁটি ইসলাম-অনুসারীদের মজবুত ঈমানের এক কেল্লা। বাহ্যতঃ এই কেল্লা ধ্বংস করা গেলেও, সেই ঈমান সেই বিশ্বাস ফল্গুধারার মত যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহিত হয়। সে-প্রবাহ আজও অনুভূত হয়ে চলেছে।

শহীদ তিতুমীরের এই সংগ্রাম-কাহিনী আজও আমাদের চেতনাকে দোলা দেয়। তাই 'তিতুমীর' নাটকের প্রকাশনায় আমরা অগ্রসর হয়েছি। নাট্য-কর্মী ও পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 'তিতুমীর' গৃহীত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

www.pathagar.com

তিতুমীর সম্পর্কে

ফকীর মজনু শাহ্, তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ্, দুদুমিয়া– এসব চরিত্র পরাধীনতার কালে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের প্রসাদপুষ্ট এদেশীয় 'সৌভাগ্যবানদের' কাছে 'ডাকাত', 'লুণ্ঠনকারী', 'খুনী' 'উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাকারী' প্রভৃতি বিশেষণে ছিল বিশেষিত। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসব চরিত্রকে এভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সেই সত্যের আলোকে এসব মহান চরিত্র আজ আমাদের কাছে পরাধীন দেশের মুক্তি-প্রয়াসী দেশভক্ত জাতীয় নকীব। পরাধীনতার গ্লানি–ভরা দুঃখ–রাতের ঘন অন্ধকারে তাঁরা ছিলেন মুক্তির দিশারী উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এ যাবৎ এঁদের নিয়ে যে সব ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা মিথ্যার সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি কিছু কিছু রচনায় এঁদের প্রকৃত সংগ্রামী কার্যাবলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' নামক বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থে সুপ্রকাশ রায় উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ধর্মের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে বলেন ঃ

"বঙ্গদেশের কয়েকটি কৃষক–বিদ্রোহে ধর্ম সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল–যেমন, প্রথম 'গারো–বিদ্রোহ' বা 'পাগলপন্থী–বিদ্রোহ', তিতুমীর পরিচালিত 'ওয়াহাবী–বিদ্রোহ' এবং 'ফারাজী–বিদ্রোহ'। ধর্মের এই সংগ্রামী ভূমিকা ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন রূপে আরম্ভ হইয়া ক্রমশ জমিদার–তালুকদার–মহাজন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণার উৎসে পরিণত হইয়াছিল। সামন্তপ্রথামূলক সমাজে শোষকগোষ্ঠীর প্রচলিত ধর্মও যখন জনসাধারণের শোষণ–উৎপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হয়, তখনই যে কোন সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলন শোষকগোষ্ঠী–বিরোধী গণসংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হইতে বাধ্য। এই ভাবেই গারোগণের 'পাগলপন্থী' বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ সুসঙ্গের হিন্দু–ধর্মাবলম্বী জমিদার পরিবারের বিরুদ্ধে গারোদের বিদ্রোহে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের 'ওয়াহাবী বিদ্রোহে' এবং ১৮৩৭–৪৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ফারাজী বিদ্রোহে'ও প্রচলিত মুসলমান–ধর্মের সংস্কার আন্দোলন জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ–উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কৃষকের মধ্যে হিদ্রোহের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।" (পৃঃ এগার)

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপেও এই প্রকার ধর্ম–সংস্কার আন্দোলন কৃষক–বিদ্রোহের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল।

আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা এ যুগের কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ ও বিহারব্যাপী 'সন্ন্যাসী–বিদ্রোহ', ত্রিপুরা জেলার শমশের গাজীর বিদ্রোহ, 'রংপুর–বিদ্রোহ' এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 'পাগলপন্থী গারো বিদ্রোহ', 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'মহাবিদ্রোহ'– এই সকল বিদ্রোহের প্রত্যেকটিই সর্বাত্মক ধ্বংস ও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহীদের মনে কখনও বৈদেশিক ও দেশীয় শত্রুদের সঙ্গে আপোষ স্থাপন ও তাদের নিকট আত্মসমর্পণের প্রশ্ন স্থান পায় নাই।

ইংরেজ শাসন ও জমিদার–তালুকদার–মহাজন গোষ্ঠীর শোষণ–উৎপীড়ন থেকে মুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বঙ্গদেশ তথা এই উপমহাদেশের কৃষক–বিদ্রোহগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষক–সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিল যে, শোষণ উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে হলে বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর নিকট থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই উপলব্ধি থেকেই বিভিন্ন বিদ্রোহে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিয়েছিল।

গ্রামাঞ্চলই যে এদেশের গণ–শাসনের মূল ভিত্তি তা–ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল এই কৃষক–বিদ্রোহগুলি। উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক–বিদ্রোহগুলির সেই প্রয়াস ব্যর্থ হলেও তা–ই আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসে গণশাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস হিসাবে চিরস্মরণীয়। তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' এদেশের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও মুক্তি–সংগ্রামের প্রতীক হয়ে আছে এবং থাকবে।

ঢাকা, মে ৭, ১৯৮০ সন — আসকার ইবনে শাইখ

www.pathagar.com

অবতরণিকা

কামান গর্জনে আঁধার রাত যেন চুপ মেরে আছে। – করুণ সুরের আলাপন চলছে আঁধার স্তব্ধতায়। – চবুকের শব্দ আর মানুষের গোঙানি বাতাসের বুক চিরে স্তব্ধতায় মিলিয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের পথের আঁধার এত জমাট যে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। এমনি পরিবেশে একজন প্রৌঢ় মুসলমান লণ্ঠন হাতে উদ্বিগ্ন মনে পথে দাঁড়িয়ে আছেন। ললাটে তাঁর চিন্তার রেখা। সুরের কান্নায় তাঁর মনও কাঁদছে। ক্রমে ব্যাকুল হয়ে উঠছেন; যে দিকে তাকান– অন্ধকার। উপরের দিকে চেয়ে কার সাহায্যের আশ্বাস যেন পান তিনি, চলে যান ত্রস্তপায়। সংগে সংগেই সেই পথে আসেন একজন হিন্দু, প্রায় প্রৌঢ়। তাঁর চোখে-মুখেও চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। তিনিও যেন আলোর প্রত্যাশী। কিন্তু সে-আলো কোথাও দেখতে পান না। দূরে পথের পানে তাকিয়ে দেখেন, কোন আলোর সন্ধান পান কিনা। দূরের লণ্ঠনের আলো মরীচিকা নয় তো? তবু তারই সন্ধানে হয়তো চলে যান তিনি। –

পথে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। কেউ বোঝা নিয়ে, কেউ চাষবাসের সরঞ্জাম নিয়ে। অদূরে শোনা যায় বিউগ্‌ল্, পল্টনের কুচকাওয়াজের শব্দ। ওরা ভীতিবিহ্বল চোখে পথের পানে তাকায়। তারপর ত্রস্তপায় চলে যায়।

www.pathagar.com

চরিত্র–পরিচিতি

তিতুমীর	বিপ্লবী নেতা
মাসুম	ঐ সহকারী
মিসকিন শাহ্	দরবেশ
ভৈরব রায়	জনৈক বিপ্লবী গ্রামবাসী
মনোহর রায়	জমিদার ও নীলকর
রামচন্দ্র	নীলকুঠির দেওয়ান
কলিন্স	নীলকর সেনানায়ক
বেনজামিন	নীলকর
কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট	কোম্পানীর সেনানায়ক
মতিউল্লাহ্	কৃষ্ণদেবের পাইক
আমিনুল্লাহ্	তিতুমীরের পত্রবাহক
নির্মলা	কৃষ্ণদেবের পুরোহিত–কন্যা
সাহানা	মাসুমের স্ত্রী
নসিবন	সাহানার পরিচারিকা
মেন্দা	
মাধু	
নিমাই	হিন্দু–মুসলমান গ্রামবাসী
মোনা	

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের কাছারীর অঙ্গন। বারান্দায় ফরাস ও নানারকম কেদারা ঠিকঠাক করছে মুচিরাম ও গোবর্ধন। আঙ্গিনায় হিন্দু–মুসলমান চাষীরা জমায়েত হয়েছে। কিন্তু চেহারা ও কাপড়-চোপড়ে কাউকেই মুসলমান মনে হয় না। ইতস্ততঃ দু' একজন আলাপ–আলোচনা করছে]

নিমাই : আর কত দেরী হবে রে ভাই মোনা? হুজুরের দোস্ত লোকেরা এখনও আসছে না যে! আমার ভাই বসে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা করছে।

মোনা : অত আরামের পিঠ চাষীদের থাকলে চলে না রে নিমাই। সবে তো সন্ধ্যা। হুজুরের কালীপূজা আরম্ভ হবে সেই রাত দুপুরে। দরকার হলে ততক্ষণ বসতে হবে।

নিমাই : তা অবশ্য পারতাম, আর পিঠও তেমন আরামের নয়। কিন্তু বেটা নীলকরেরা চাবকে পিঠে ঘা করে ফেলেছে। তাই কতক্ষণ বসলেই জায়গাটা টন্‌টন্ করে ওঠে।

মোনা : তোরই তো দোষ। কুঠির সাহেবরা বলল, আমাদের হুজুর বললেন, নীলের চাষ করতে। তুই সংগে সংগে না করে ঘাড় করতে গেলি কেন?

নিমাই : তাই তো ভাবি, সেই নীলের চাষ করলাম, কিন্তু চাবুক খেয়ে করলাম। তখন ভাবলাম, খানকতক ধানি জমি আমার, ছেলেপিলে বড্ড খেতে চায়। নীল তো আর খাওয়া যায় না, তাই ধান করতে মিনতি জানালাম।

মোনা : হেঁহ্, মিনতি জানালেই হল! এখন হল ইংরেজের রাজত্বি। ইংরেজ ভাত খায় না, রুটি খায় আর নীল খায়। কাজেই আমরা সাহেবদের নীল খাওয়াব, আর সাহেবরা আমাদের ভাত খাওয়াবে। ব্যস, সোজা কথা।

নিমাই : হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম। কিন্তু আর একটা কথা মোনা। আমাদের বউ-বেটির উপর যেন ওদের নজর একটু বেশী?

মোনা : তুই বড় সেকেলে নিমাই। বউ-বেটির দেখাশুনা আমরা আর কত করতে পারি বল্! তাই ওরা তা করে দেয়।

www.pathagar.com

নিমাই : কিন্তু বড় কষ্ট লাগে রে! মেয়েগুলোকে নাকি জোর করে নেয়।

মোনা : চেপে যা নিমাই, চেপে যা। হুজুররা শুনলে আর আস্ত রাখবেন না। হ্যাঁ, আর এক কাজ করবি। বলবি, ওরা যেন শরীরে ছাইটাই মেখে থাকে, তাহলে সাহেবদের চোখে পড়বে না।

নিমাই : কিন্তু দেশী মানুষেই যে খোঁজ দেয়।

(অন্যদের কথায় এদের কথা আর শোনা যায় না)

মাধু : দেখিস মেন্দা, হুজুররা এলে কিন্তু সেদিনের মত সেলাম করিস না। তাহলে ক্ষেপে যাবেন।

মেন্দা : না ভাই, ভুল করে সেদিন যে মার খেয়েছি, তা কি আর ভুলি রে মাধু! কিন্তু ভাই, মাটিতে লুটিয়ে পেন্নাম করাটা আজও আমার তেমন ঠিক হল না।

মাধু : কেন, তোরা তো মাঝে মাঝে নেমাজ পড়িস, তাতে লুটিয়ে পেন্নাম করতে হয়। সে রকম করলেই পারিস।

মেন্দা : কিন্তু কেউ কেউ কয়, আল্লাহ্ ছাড়া নাকি নামাজের মত সেজদা কাউকে করতে নেই।

মাধু : যারা কয়, তারা তো তোর মার খাওয়ার সময় ফিরায় না এসে।

মেন্দা : ঠিক কথাই রে মাধু। আচ্ছা, আমি একটু আলগোছে থেকে পেন্নামটা করব।

মাধু : তাই করিস। ভুলচুক হলেও দেখতে পাবেন না। আর হুজুরও তো যে-সে হুজুর নয়, যার নাম কৃষ্ণদেব রায়! হুজুরের মুখের হাসি তো সাপের ঠ্যাং। আমাদের মত চাষীর ভাগ্যে তা দেখা হয়ে ওঠে না। তবে হ্যাঁ, গোবরডাঙার হুজুর কালীপ্রসন্ন বাবু, গোবিন্দপুরের হুজুর দেবনাথ বাবু, চুতনার হুজুর মনোহর বাবু, হায়দারপুরের হুজুর গাজী সাহেব আর নীলকুঠির হুজুররা আমাদের হুজুরের হাসি মাঝে মাঝে দেখেন।

মেন্দা : আচ্ছা ভাই, হুজুর আমাদের সংগে হাসেন না কেন?

মাধু : আরে গরু, আমরা কি তাঁর পেয়ারের লোক যে হাসবেন? আমরা হলাম চাষা। ভগবান আমাদেরে গরুর মতই অবোলা করে বানিয়েছেন! আমাদের সংগে হাসবেন কি?

মেন্দা : তা ঠিক। তবে হুজুর বেদরদীর মত বড় মারে!

মাধু : মারবেই তো। হুজুরের রাগ তুললে মারবে না?

মেন্দা : ঠিকই। আমাদেরও তো রাগ উঠলে গরুকে মারি। আচ্ছা ভাই,

www.pathagar.com

আজও পূজার শেষে কারণের ব্যবস্থা আছে নাকি?

মাধু : নীলকুঠির সাহেবলোক আসছেন, অন্যান্য জমিদারবাবুরা আসছেন, কারণ ছাড়া জমবে কেন?

মেন্দা : আমার কিন্তু ওটা খেতে ডর করে। মাথাটা কি রকম ঘোরায়। আর মোল্লাজী কয়, আমাদের ধর্মেও নাকি ওটা মানা।

মাধু : ওসব মোল্লা আর ধর্মের কথা বাদ দে মেন্দা। আমরা হলাম চাষী, আমাদের আর ধর্ম কি রে? হুজুরের প্রজা আমরা, হুজুরের ফসল খাই। হুজুরই আমাদের ধর্মাধর্ম, হুজুরই আমাদের সব।

মেন্দা : তা ঠিকই। ধর্ম তো আর ভাত দিয়ে যায় না?

মাধু : আর এই মাথা ঘুরানোর কথা বললি না? ওটাই তো মজা রে। সারা দিনরাত তো আমরা হুজুরের হারামজাদা। কিন্তু কাজকর্ম সেরে যেই দুই ঢোক গিললি, অমনি?

মেন্দা : হ্যাঁ, অমনি অবশ্য মনে হয়, আমিও একজন হুজুর।

মাধু : তবে? এই মজা ছাড়া যায়?

মেন্দা : তা ঠিক। কিন্তু ...

মাধু : তুই তো সবই ঠিক বললি, আর কিন্তু কি? তা ছাড়া কারণ কি মদ? ওটা তো প্রসাদ। আমাদের ওই কালী মা আছে না? কারণ হল তাঁর আশীর্বাদ, খেলে ভাল হয়।

মেন্দা : তা ঠিক। আচ্ছা দিস অল্প, খাব।

(মতিউল্লাহ আসে)

মতিউল্লাহ্ : তোমরা সবাই ওঠ। হুজুররা আসছেন।

(সবাই উঠে দাঁড়ায়। কৃষ্ণদেব, মনোহর রায়, গাজী সাহেব ও মিঃ বেনজামিন আসেন। সবাই মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। হুজুরেরা আসন গ্রহণ করেন)

কৃষ্ণদেব : মেতো!

মতিউল্লাহ্ : মালিক!

কৃষ্ণদেব : গোক্না কুঠির মিঃ কলিন্স এলেন না, আর কুঠির দেওয়ান রামচন্দ্রও দেরী করছে!

মতিউল্লাহ্ : খবর পেলাম, তাঁরা রওয়ানা হয়ে এসেছেন। কিন্তু অত দেরি –

কৃষ্ণদেব : তাহলে ওদেরকে আরম্ভ করতে বল্।

(মতিউল্লা'র ইংগিতে চাষীরা নেচে–গেয়ে নীলের উপর রচিত জারী আরম্ভ করে)

গায়েন ।। হায় হায়রে!

www.pathagar.com

শোনা কথা বলছি ভাইরে শুন দিয়া মন,
বহুদিনের কথা এটা অতি পুরাতন।

সকলে ।। প্রাচীন কাল হইতে বাংলায় চলতো নীলের চাষ,
নীল চাষ করিয়া চাষীর চলতো বার মাস।

গায়েন ।। ওরা কয় নীলকর করলো সর্বনাশ,
ধনে প্রাণে চাষীকুল হইল বিনাশ।

সকলে ।। আমরা কই নীল ছাড়া সাড়ে–সর্বনাশ,
ধনে প্রাণে চাষীকুল হইবে বিনাশ।

(জারী গানের শেষে আর্থার কলিন্স ও রামচন্দ্র আসে)

গায়েন ঃ ওরা কয় নীলকর করলো সর্বনাশ,

কৃষ্ণদেব ঃ আসুন, আসুন মিঃ কলিন্স। আপনার জন্য বেনজামিন সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ওরে কে আছিস? সাহেবের জুতোতে ধুলো লেগেছে। মুছে দে'।

(মুচিরাম ও গোবর্ধন এসে জুতো সাফ করে। কলিন্স উপবিষ্ট এদের একজনের উপর পা রেখে কথা বলে)

কলিন্স ঃ লেকিন আমি আওরত আছি না। Why so anxious Mr. Benjamin?

বেনজামিন ঃ But you know, বাদ্‌শা জাতের আদমী সকল – I mean the Moslems are on action again.

কলিন্স ঃ On action at home, I suppose?

(সাহেব দু'জন হেসে ওঠে। মুচিরাম ও গোবর্ধন কাজ সেরে চলে যায়)

কৃষ্ণদেব ঃ অবিশ্যি চুতনার মনোহর রায়ও আসতে কিছুটা দেরি করেছেন।

মনোহর ঃ আমি ঠিক সময়ে এসেই পৌঁছুতাম। কিন্তু বাঙলার বনপথ, পথের শ্যামলিমা আসতে দিল কই? দু'চোখ ভরে তা দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কলিন্স ঃ লেকিন ইহারা সব চুপচাপ কেন? রামচন্দর!

রামচন্দ্র ঃ স্যার। ও, ওদের নাচগানের কথা বলছেন স্যার? আমি understand করেছি। নাচ হে নাচ, গাও। হ্যাঁ, তোমাদের ওই যে indigo-র গানটা – মানে নীলের গান – ওটা স্যারকে শুনিয়ে দাও।

www.pathagar.com

কলিন্স : Indigo?

রামচন্দ্র : Yes sir, ওরা indigo খুব like করে। তাই indigo নিয়ে একটা song তোয়ের করেছে। দিনরাত ওরা তাই গান করে।

কলিন্স : I see! That's nice.

(বেনজামিনের দিকে চায়)

মনোহর : কিন্তু ওটা একবার গাওয়া হয়ে গেছে সাহেব।

কলিন্স : That's all right, আমি আশা করি, মিঃ বেনজামিন তাহা শুনিয়াছেন। Then the purpose is served. হাঃ হাঃ হাঃ –What next?

(একজন মেয়ে বেশধারী চাষী বালক নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে)

কৃষ্ণদেব : আচ্ছা, নাচ চলুক। আপনারা আসুন, সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে।

(কলিন্স বুঝতে না পেরে রামচন্দ্রের দিকে তাকায়)

রামচন্দ্র : সামান্য জলযোগ স্যার, মানে few breakfast সাহেব, অর্থাৎ সময় হয়েছে।

(সাহেবরা রামচন্দ্রের ইংরেজী শুনে হাসতে থাকে)

কলিন্স : Few breakfast! Yes, (কৃষ্ণদেবকে) You go. আমি গান শুনিব,নাচ দেখিব।

(রামচন্দ্র দমে যায়। অন্যেরা চলে যায়)

রামচন্দ্র : Sir, আমিও go করি?

কলিন্স : Na-o. They will give us few breakfast later on. তুমি আমার পাশে থাকো।

রামচন্দ্র : আচ্ছা sir। ওরে, তোরা কি নাচবি নেচে ফেল্ না বাবা। সময়ের মূল্য বুঝিস না!

(নাচ আরম্ভ হয়)

কলিন্স : Ram Chunder! What's the matter? Is the nautch girl 'he' or 'she'?

রামচন্দ্র : Sir, আজও আমাদের এই backward ছোটলোকদের মধ্যে 'she' nautch-girl-এর চল্ হয় নাই। ছেলেই মেয়ে সেজেছে।

কলিন্স : That's amusing !

(নর্তকীর কাছে গিয়ে তামাসা উপভোগ করতে থাকে।

www.pathagar.com

কাছারীর দরজায় কোলে ছেলে নিয়ে নির্মলাকেও দেখা যায়। সেদিকে চোখ পড়ায় সাহেব নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে। নির্মলা ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়)

So lovely ! ... Ram Chunder ! Who is she ?

রামচন্দ্র : Sir ! She মানে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের পুরোহিত আছে না, মানে priest, তার বিধবা মেয়ে, এখানেই থাকে।

কলিন্স : বি-ধ-বা! Means she has no husband ?

রামচন্দ্র : Yes sir, একসময় had, তবে এখন vacant মানে has not.

কলিন্স : Hm ! ... Ram Chunder !

রামচন্দ্র : Sir !

কলিন্স : (অর্থপূর্ণ কণ্ঠে) You mean what I mean?

রামচন্দ্র : Yes sir, কিছু কিছু mean করতে পারছি। কিন্তু বড় difficult sir.

কলিন্স : Why?

রামচন্দ্র : রায়বাবুর পুরোহিতের daughter কিনা sir !

কলিন্স : But কিষেনদেব আমার কাজে রায় দেবেন। তুমি বেবোস্থা কর।

রামচন্দ্র : Sir, আশেপাশের গ্রামে ছোটলোকদের many daughter, sister, wife আছে। আপনি তাদের দেখেন sir, যাকে like করেন আমি arrange করি।

কলিন্স : No, no. I am tired of those low castes. আওর ছোট আদমি নেহি। She is sweet, lovely, a full-blown flower ! Her youth is full to the brim.

(হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে)

Ram Chunder ! তুমি না পারিলে আমার কুঠিতে দেওয়ান আছ কেন? তোমাকে dismiss করিয়া আমি দোসরা দেওয়ান নিতে পারি।

রামচন্দ্র : No, no sir, আবার দোসরা servant কেন? আমি পারব না not say, but difficult.

কলিন্স : তুমি তবে ওস্তাদ না আছ?

রামচন্দ্র : No sir, আমি এসব বিষয়ে খুব ওস্তাদ আছি। ব্রাহ্মণের ছেলে কিনা sir, তাই heart-টা মাঝে মাঝে curved হয়ে যায়।

www.pathagar.com

যাক্‌গে, আজ রাত্রেই এর প্রমাণ দেব sir. কিন্তু ...

কলিন্স : What কিন্তু? Must I have her to-night.

রামচন্দ্র : Yes sir, তবে প্রয়োজন হলে আপনাকে আরও এক night stay করতে হতে পারে।

কলিন্স : আওর এক night? ঠিক আছে। I will wait and dream her dreaming eyes, listening to the murmurs of the mind ... But ... Ram Chunder. she has gone! চল আমরা যাই, আওর উসকো জোয়ানীকা বাহার দেখি।

রামচন্দ্র : কিন্তু breakfast sir?

কলিন্স : Damn your breakfast. Come with me.

(কৃষ্ণদেব ও অন্যান্যেরা আসেন)

কৃষ্ণদেব : আমাদের একটা জরুরী পরামর্শ ছিল সাহেব।

কলিন্স : পরামর্শ। Yes, I guess that. But আপনারা সব আছেন, আপনারা যাহা করিবেন, আমি ditto দিব। লেকিন Remember : Give me mine and you have yours. Come on Ram Chunder.

কৃষ্ণদেব : আমিও তাই বলছি sir, breakfast-টা ....

কলিন্স : হাঁ – few breakfast আমরা খাইব, লেকিন ঘোড়া বাদ।

(রামচন্দ্রসহ চলে যায়)

বেনজামিন : মিঃ কলিন্স একটা restless young hero আছে কিষেনদেব। He goes for sightseeing. আপনি আপনার কাজ আরম্ভ করেন।

কৃষ্ণদেব : মেতো। ওদের যেতে বল্।

(মতিউল্লা'র ইংগিতে চাষীরা চলে যায়)

আজকের পরামর্শ এমন একটা বিষয়ে যার সংগে সম্পর্ক রয়েছে সকলের। এ দেশে আমরা হিন্দু-মুসলমান জমিদার ও নীলকর যারা আছি, সবাই নিশ্চয়ই শান্তি-শৃঙ্খলায় বসবাস করতে চাই। আরও চাই, এই শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে ইংরেজ নীলকর আর কোম্পানী এদেশে শান্তিতে বাস করুক। আশা করি, এতে আপনারা সকলেই একমত?

গাজী সাহেব : একমত বলতে একমত, অবশ্যই একমত।

www.pathagar.com

মনোহর : শান্তিতে বসবাস করতে কে না চায় বলুন?

বেনজামিন : হাঁ কিষেনদেব, আমরা সব নীলকর শান্তি চাই।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু বর্তমানে তিতুমীর নামে এক অহাবী মুসলমান আমাদের সে শান্তি নষ্ট করতে এগিয়ে এসেছে।

গাজী সাহেব : তিতুমীর? সে আবার কে?

বেনজামিন : হাঁ, তাহার নাম আমি শুনিয়াছি।

গাজী সাহেব : ও– তিতুমীর! হ্যাঁ, তার নাম তো শুনেছিই।

কৃষ্ণদেব : নীলকরদের বিরুদ্ধে সে সমস্ত চাষীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

গাজী সাহেব : সাহস তো বড় কম নয়! নীলকর মানে সাহেবদের বিরুদ্ধে?

মনোহর : কিন্তু যতদূর জানি, সে একজন পীর, ধর্ম–প্রচারক মাত্র। শান্তির পথে বিঘ্ন নয়।

কৃষ্ণদেব : এটা তার ছদ্ম আবরণ মাত্র। আসলে সে চায়, এ দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়িয়ে হিন্দুদের দমন করে, আবার মুসলমান রাজ্য স্থাপন করতে। অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মুসলমানদের সে ইংরেজ ও হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। চাষী, জোলা, তাঁতি, পটুয়া – এই সমস্ত ছোটলোক নিয়ে তোয়েব করেছে এক বিদ্রোহী বাহিনী।

মনোহর : ওরা সত্যি উত্তেজিত হয়েছে কিনা, আর হয়ে থাকলেও তাতে আমাদের উত্তেজিত হওয়া উচিত কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু এই ভাবনার সুযোগে ওরা আমাদের শান্তির নীড় ভেঙে দেবে মনোহর রায়।

গাজী সাহেব : হ্যাঁ, তাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে তো।

মনোহর : আমার তো মনে হয়, তা পারবে না ওরা। তাছাড়া আমাদের শান্তি রক্ষক হিসাবে তো ইংরেজই রয়েছেন। আমাদের যে কোন অশান্তির আগুন ওঁরা শান্তি–বারিতে নিভিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণদেব : আপনি ব্যাপারটাকে আরও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুন মনোহর রায়।

গাজী সাহেব : ব্যাপারটা মোটেই সাধারণ নয় মনোহর বাবু।

মনোহর : অযথা গুরুত্বে কোন জিনিষের ভারই বাড়ে শুধু, সার বাড়ে না। আর শান্তির নামে অশান্তির আগুন যারা জ্বালাতে চায়, আমরা

www.pathagar.com

কেন তার অনুসারী হতে চাইব?

কৃষ্ণদেব : চাইব এজন্য যে সেই অশান্তির আগুনে আমাদের ঘরও পুড়বে।

মনোহর : পোড়াঘর আর পুড়বে কি কৃষ্ণবাবু?

বেনজামিন : আমি জানি, তিতুমীর এত সামান্য মানুষ আছে, যাকে control করতে কিষেনদেবই যথেষ্ট আছেন। তাহা ছাড়া কালী বাবু, দেবনাথ বাবু, গাজী সাহেব আছেন ...

গাজী সাহেব : অবশ্যই। আমরা যাঁরা শরীফ খানদানের লোক, তাঁরা তিতুর মত একটা সামান্য মানুষকে ...

বেনজামিন : হাঁ, আওর মনোহর বাবু আছেন। সকলে মিলে তিতুকে সহজেই ধ্বংস করতে পারেন।

মনোহর : না না, আমার সাহায্য আর কি ... কৃষ্ণবাবু একাই তাকে শায়েস্তা করতে পারবেন।

কৃষ্ণদেব : তবু আপনাদের জানিয়ে রাখা দরকার। বলা তো যায় না, মুসলমান – (গাজী সাহেবকে মনে পড়ায় সামলে নিয়ে) মানে এসমস্ত মুসলমান হল ঘা খাওয়া সাপ, কখন কি ভাবে দংশন করে। অবিশ্যি গাজী সাহেবের মত মুসলমান দেশের সম্পদ!

(গাজী সাহেব কৃতার্থের হাসি হাসেন)

মনোহর : তা ঠিক। আটঘাট বেঁধেই এ পথে এগোন দরকার। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, ইংরেজ-হিন্দু তাড়িয়ে এখানে রাজ্য স্থাপনের অসম্ভব দুরাশা তিতুমীর করেন।

কৃষ্ণদেব : আপনি নিজের মন দিয়ে তিতুর মনের পরিচয় পেতে চাচ্ছেন।

মনোহর : তাই হয়তো স্বাভাবিক। হয়তো আপনিও নিজ মনের প্রতিধ্বনিই শুনছেন তার মন থেকে!

বেনজামিন : হাঁ কিষেনদেব, এ বিষয়ে যাহা করিতে হবে, আপনি করেন। দরকার হলে আমাদের সাহায্য আপনারা পাবেন।

কৃষ্ণদেব : এই আশ্বাসই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি অবিশ্যি বসে নেই। তিতু ও সমস্ত মুসলমানের কাছে এক পরওয়ানা জারী করিয়েছি।

(নায়েব আসে)

এই যে নায়েব, সে পরওয়ানা জারী করা হয়েছে?

নায়েব : আজ্ঞে কর্তা, সে কাজ সুসম্পন্ন।

বেনজামিন : আপনি আপনার কাজ করেন, আমি বাইরে যাই।

কৃষ্ণদেব : নায়েব, তুমি সাহেবের সংগে যাও।

www.pathagar.com

বেনজামিন : No. No. আমি একেলা যেতে পারব।

গাজী সাহেব : আমিও সাহেবের সংগে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আমাকে আবার চলে যেতে হবে।

কৃষ্ণদেব : আচ্ছা,আসুন।

(দু'জন চলে যায়)

মনোহর : আচ্ছা, পরওয়ানাটার মর্মার্থ কি শুনতে পারি না?

কৃষ্ণদেব : অবশ্যই।নায়েব!

নায়েব : পরওয়ানা মানে যারা তিতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অহাবী হবে, দাড়ি কাটবে, গোঁপ ছাটবে, বাপ-পিতামোর রাখা গোপাল, নেপাল, গোবর্ধন এসব নাম বদলে আরবী ভাষায় অহাবী নাম রাখবে, মসজিদ তোয়েব করবে, তাদের জমিদার সরকারে সেসবের জন্য একটা খাজনা দিতে হবে।

মনোহর : আমাদের পূর্বপুরুষরা ভাগ্যে আগেই স্বর্গীয় হয়েছেন, নইলে আপনাদের পরওয়ানা বলে হয় দাড়ি কাটতে হত, নয় খাজনা দিতে হত।

কৃষ্ণদেব : তিতু আমার হিন্দু-মুসলমান প্রজার উপর যে অত্যাচার করছে, তার তুলনায় এ কিছুই নয় মনোহর রায়।

মনোহর : না, এ আর তেমন কি! কিন্তু এতে মুসলমানদের ধর্মে আঘাত দেওয়া হচ্ছে না কি? কোম্পানী কিন্তু আজও এতটা করার সাহস পাচ্ছে না। তিতুমীর যাই করুক, মুসলমানদেরই করছে। কোন হিন্দুকে অহাবী করে তুলছে না।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু মুসলমানও আমার প্রজা।

মনোহর : জমিদার কি প্রজার ধর্মেরও মালিক?

কৃষ্ণদেব : নয় কেন? অশিক্ষিত প্রজাকে কুকথা বুঝিয়ে কুপথে নিয়ে যাবে, আর জমিদার তাই সহ্য করবে?

মনোহর : কৃষ্ণবাবু, এখানে কোন মুসলমান উপস্থিত নেই যার জন্য ঘুরিয়ে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের হিন্দু সমাজেই তো বহু গোলমাল রয়েছে। দাস করে রেখে রেখে প্রায় সমস্ত হিন্দুর মনুষ্যত্বের মেরুদন্ডই ভেঙে দিয়েছি আমরা। আপনার আমার পূর্বপুরুষ মান-ধন-সম্প্রদায়ের শাণিত তলোয়ারে এই সমাজ-দেহকে খন্ড বিখণ্ড করে গেছেন। আজ এসেছে ইংরেজ, শোষণ আর শাসনদন্ড হাতে নিয়ে। হিন্দুর জন্য সত্যি যদি আপনার প্রাণ

www.pathagar.com

কাঁদে, তাহলে আসুন – অন্য চিন্তা ছেড়ে এই সমাজ–প্রতিষ্ঠাতার শান্ত-সৌম্য-উদার মূর্তিকে ভালবেসে তাঁর সত্য–শিব-সুন্দর মানবতার উদাত্ত কণ্ঠে লাঞ্ছিত মানুষকে জাগরণের আহ্বান জানাই। তিতু বা অন্য কেউ যদি অন্যায় প্রতিষ্টার স্বপ্ন দেখে, জাগ্রত মানুষের মিলিত কণ্ঠে সে স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

কৃষ্ণদেব ঃ আপনার মত এ স্বপ্ন আমিও দেখি মনোহর রায়। একে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে তা–ই হত সর্বাংগসুন্দর। কিন্তু তাতে প্রথম বাধা এইসব মুসলমান। আমাদের উদাত্ত কণ্ঠ ওদের দানব চীৎকারে তলিয়ে যাবে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এই দানব–কণ্ঠকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া। তারই জন্য ইংরেজের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। তারপর এক কাঁটা দূর হলে ওই ইংরেজ কাঁটাকে উঠিয়ে ফেলতে কষ্ট হবে না।

মনোহর ঃ কিন্তু তা তো সম্ভব নয় কৃষ্ণবাবু! মুসলমান এ দেশেরই মানুষ। দেশের অর্ধেককে পঙ্গু রেখে অন্য অর্ধাংশ দিয়ে কোন দেশ মনুষ্যত্বের স্বর্ণ–সীমায় পৌছুতে পারে না। আর মুসলমানকে আমাদের ভয় কি? দুই অর্ধাংশ যদি নিজের মত করে সুন্দর হয়, তাতে সমগ্র দেহই হবে সুন্দর। মুসলমানকে ভয় নয় কৃষ্ণবাবু, ভয় ওই ইংরেজকে, যারা এ দেশের কেউ নয়, তাদেরকে।

কৃষ্ণদেব ঃ আপনার কোমল অন্তর দিয়ে কূটনীতির সূক্ষ্ম চাল বোঝা সম্ভব নয় মনোহর বাবু। আপনার আশাকেই আমি রূপ দিতে চাই, কিন্তু সম্ভাবিত পথে। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

মনোহর ঃ আমি বাধা দিচ্ছি না, এটাও তো সাহায্য। আচ্ছা, আমিও একটু ঘুরে আসি।

(চলে যান। কৃষ্ণদেব রায় কি ভাবেন)

কৃষ্ণদেব ঃ কাপুরুষ !... (তারপর বলেন) নায়েব! বরকন্দাজ যে মুসলমানটাকে ধরে এনেছে, সেটাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

(নায়েব চলে যায়, আসে রামচন্দ্র)

এস রামচন্দ্র। বস। সাহেবরা কি দেখছে?

রামচন্দ্র ঃ আজ্ঞে কর্তা, দেখছে অনেক কিছুই। কিন্তু one thing নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি কর্তা।

www.pathagar.com

কৃষ্ণদেব : ব্যাপার কি? সাহেবের নজর কোথাও পড়েছে নাকি হে?

রামচন্দ্র : আজ্ঞে, পড়েছে বড় বেজায়গায় কর্তা। তাই ভয় হয়, কর্তা আবার mind করেন কিনা। অবিশ্যি তার বদলে সাহেব হুজুরের কেনা হয়ে থাকবে। আর যে রকম বদমেজাজী সাহেব, কাজটা না হলে কতটুকু সাহায্য –

কৃষ্ণদেব : বলই না কোথায়?

রামচন্দ্র : আজ্ঞে কর্তা, পুরুত মশাইর অন্দরে বড় বেসামাল জিনিষ কিনা, তাই –

(শুনে কৃষ্ণদেব রায় অবাক হয়ে যান)

কৃষ্ণদেব : আমার কুল–পুরোহিতের কন্যা? কালী কৈবল্যদায়িনী।

রামচন্দ্র : আমার mind-এও খুব shock লেগেছিল, কিন্তু সাহেবের obedient servant কর্তা –

কৃষ্ণদেব : হুঁম্। এতটুকু নীচে যেতে – হ্যাঁ দেখ, আমি এসব নোংরা কথা শুনতে বা জানতে চাই না।

রামচন্দ্র : আজ্ঞে কর্তা, understand করেছি। এতেই আমার মুস্কিল আসান হয়ে গেছে।

(মুচিরাম মুসলমান প্রজাকে নিয়ে আসে)

প্রজা : হুজুর মা বাপ। দয়া চাই হুজুর, দয়া।

কৃষ্ণদেব : হাঃ হাঃ হাঃ ... দয়া! ফাঁদে আটকে গেছ, তাই আজ দয়ার প্রার্থনা? আগে ভুলে গিয়েছিলে, কৃষ্ণদেব রায় এখনো জীবিত। মুচিরাম!

মুচিরাম : হুজুর!

কৃষ্ণদেব : নিয়ে যা বেটাকে আমার গুম ঘরে।

প্রজা : হুজুর, হাতে একটি পয়সা নাই। এবারের মত দয়া চাই।

কৃষ্ণদেব : জমি ভোগ করবি, খাজনা দিবিনে, আদেশ মানবিনে আমার, তিতুর পরামর্শে করবি বিদ্রোহ, আমি কি করব বল্? বিনি পয়সায় ফসল খাবি, জমি তো আর তোদের নয়।

প্রজা : দু’দিনের সময় চাই হুজুর।

কৃষ্ণদেব : সময় কি আমার ঘরের জিনিষ যে তোদের দেব?

প্রজা : হুজুর মা-বাপ।

কৃষ্ণদেব : মুচিরাম! নিয়ে যা এটাকে। যতদিন খাজনার টাকা আমার হাতে না আসে, ততদিন ওই গুম ঘরে থাকবে এটা।

www.pathagar.com

রামচন্দ্র : তাছাড়া ভয় কিরে বেটা? ওখানে আরও friend পাবি। দু'বেটা চাড়ালও রয়েছে। বেশ যোগাযোগ হবে। যা বাবা, নেড়ে আর চাড়াল গলা জড়াজড়ি করে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকবি। টাকার চিন্তা টাকাইকরবে।

(মুচিরাম প্রজাটিকে টেনে নিয়ে যায়)

কৃষ্ণদেব : রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র : কর্তা!

কৃষ্ণদেব : অগ্নিস্ফুলিংগ সামান্য হলেও তাকে হেলা করতে নেই। আজ যা ধিকিধিকি জ্বলছে, কাল তা-ই দেখা দেবে সর্বদাহী শিখা হয়ে। বিদ্রোহী তিতুমীরকে আর প্রশয় দেওয়া চলে না। দিনের পর দিন তারউচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই চলেছে।

রামচন্দ্র : Yes কর্তা, double হয়ে বাড়ছে।

কৃষ্ণদেব : তার কি স্বপ্ন জান?

রামচন্দ্র : না কর্তা, এটা যে mind-এর ব্যাপার!

কৃষ্ণদেব : বাংলা তথা ভারতের শাসনভার আজ ইংরেজের হাতে। রাজ্যহারা মুসলমান চায় আজ তারই পুনরধিকার।

রামচন্দ্র : কর্তা যদি কিছু mind না করেন, তাহলে এবার আমাকে কিছু হাঁসতে হয়। হেঃ হেঃ ... হাঃ হাঃ ... কথায় বলে না —

হাতী ঘোড়া গেল তল
মুষিক বলে কত জল।

নওয়াব সিরাজ, মীর কাসেম, টিপু সুলতান ভেস্তে গেল, আর আজ এলেন কিনা তিতুমীর! তিত্‌পুটি চিনেন কর্তা, তিত্‌পুটি? এক প্রকার মাছ, small, ছোট্ট - নতুন জলে ভীষণ ছুটোছুটি করে - হেঃ হেঃ ...

কৃষ্ণদেব : না না রামচন্দ্র, এ হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়। সামান্য হলেও তার এই শক্তিকে সুকৌশলে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। ছলে বলে যেমন করে হোক, তিতুকে দমন করতেই হবে।

রামচন্দ্র : বল আর লাগবে না কর্তা, ছলেই কাজ ফতে হবে। মীরজাফর মরেও এদেশে বাচ্চা রেখে গেছে অনেকগুলো।

কৃষ্ণদেব : রামচন্দ্র!

রামচন্দ্র : কর্তা!

কৃষ্ণদেব : এর দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। তুমি শিক্ষিত।

www.pathagar.com

রামচন্দ্র : English শিক্ষিত কর্তা।

কৃষ্ণদেব : সাহেবদের তুমি ইংরেজীতে ভাল করে বোঝাবে। তারা সর্বরকমের সাহায্য করলে ...

রামচন্দ্র : আপনি নিশ্চিন্তে দিবা-নিদ্রা দিন কর্তা। তিতুর চিন্তা আমি করছি। অবশ্য ..... মানে .... এই সংসারের চিন্তা যদি না করতে হয়, তা হলে এই মাথায় এমন চিন্তা আসবে কর্তা ...

কৃষ্ণদেব : তোমার পরিবারের চিন্তা আমি করব।

রামচন্দ্র : ব্যস। দেখে নেবেন কর্তা, আমার চিন্তা আর কলিন্স সাহেবের খুশী, দু'য়ে মিলে এমন জিনিষ তোয়ের হবে ... হেঃ হেঃ ... ভারী তো এক বাহিনী তিতুর। যতসব চাষা, জোলা, ঢালী, পটুয়া দিয়ে সে করবে যুদ্ধ!

কৃষ্ণদেব : না না রামচন্দ্র, তুচ্ছ মনে করো না এই ছোটলোকদের। এদের নিয়ে তিতু গঠন করেছে এক অগ্নি-বাহিনী।

রামচন্দ্র : কিন্তু এই আগুনে ওরাই যে পুড়ে মরবে কর্তা।

কৃষ্ণদেব : পোড়াতেও তো পারে রামচন্দ্র! তিতুর বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপতি ওই গোলাম মাসুম।

রামচন্দ্র : হাঃ হাঃ হাঃ ... সেনাপতি! তিতুর আবার বাহিনী, তার আবার সেনাপতি। নাহ্, আর হাসব না কর্তা, বেশী হাসলে আবার চোখ দিয়ে water আসে। যাক, কাল দেখতে পাবেন কর্তা কোথাকার water কোথায় গিয়ে stand করেছে। শাস্ত্রে বলে– কন্টকেনৈব কন্টকম্। আসি কর্তা। সাহেব আবার পাগলা কুকুর হয়ে আছে। তিতুর অগ্নি-বাহিনী। আজ দশ বছর সাহেবের কুঠিতে দেওয়ানগিরি করছি। – ফুঁ, একটি মাত্র ফুঁতেই ওই অগ্নিটি দপ করে নিভে যাবে কর্তা। লাঠি দিয়ে পাইকগিরি করা চলে, যুদ্ধ করা চলে না।

(রামচন্দ্র চলে যায়, নায়েব আসে)

নায়েব : হুজুর! এক পত্রবাহক এসেছে।

কৃষ্ণদেব : কার পত্র?

নায়েব : বোধ হয় তিতুর।

কৃষ্ণদেব : নিয়েএস।

নায়েব : মুচিরাম!

(মুচিরাম গিয়ে আমিনুল্লাকে নিয়ে আসে। সে হাত তুলে সালাম করাতে কৃষ্ণদেবের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়)

www.pathagar.com

কৃষ্ণদেব ঃ কার পত্র?

আমিন ঃ হযরত আলীর পত্র।

কৃষ্ণদেব ঃ হযরত আলী কে?

আমিন ঃ চাঁদপুরের মীর সাহেব, আমার মুরশেদ। সৈয়দ নিসার আলী।

কৃষ্ণদেব ঃ সেই অহাবী তিতু? তুই কে?

মুচিরাম ঃ ওর নাম আমন মন্ডল হুজুর! ওর বাবার নাম কামন মন্ডল। হুজুরের প্রজা। আগে দাড়ি কামাত, এখন রেখেছে। তাই হুজুর চিনতে পারছেন না।

কৃষ্ণদেব ঃ হুঁম্। (নায়েবকে) পড়।

নায়েব ঃ যনাব বাবু কৃষ্ণদেব রায় জমিদার মহাশয়

সমীপে –

মহাশয়!

আমি আপনার প্রজা না হইলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলাম যে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাকে অহাবী বলিয়া আপনি মুসলমানদিগের নিকট হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি কেন এরূপ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারা মুস্কিল। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করিয়া হুকুম জারি করা। আমি দ্বীন ইসলাম জারী করিতেছি। মুসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি। ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকিতে পারে? যাহার ধর্ম সেই বোঝে। আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। অহাবী ধর্ম নামে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। আল্লা'র মনঃপুত ধর্মই ইসলাম। ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আযহার কোরবানী করা ও আকীকার কোরবানী করা মুসলমানের উপর আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম। আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ-বিধিনিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি আশা করি, আপনি আপনার অন্যায় হুকুম প্রত্যাহার করিবেন।

হাকির ও নাচিজ

সৈয়দ নিসার আলী ওর্ফে তিতুমীর

(রাগে কৃষ্ণদেব কাঁপতে থাকেন)

www.pathagar.com

কৃষ্ণদেব : হুঁম্। তুই দাড়ির খাজনা দিয়েছিস?

আমিন : না, দাড়ির খাজনা দেওয়া হয় নাই।

কৃষ্ণদেব : নাম বদল করেছিস, তার খারিজানা দিয়েছিস?

আমিন : হজুর! দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ। নাম সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাও ঠিক না। আমার আসল নাম আমিনুল্লাহ, আমার পিতার নামও কামালউদ্দিন। লোকে আমাদের আমন ও কামন বলে ডাকে। ওগুলো আমাদের ডাক নাম।

কৃষ্ণদেব : কে আছিস?

(বরকন্দাজ আসে)

আমার সামনে এ তর্ক করছে।

(বরকন্দাজ ও মুচিরাম আমিনুল্লাকে ধরে টেনে নিয়ে যায়)

নায়েব! ওর ব্যবস্থা কর। ওই দেখ, মা আমার রক্তলাল জিহ্বা মেলে হাসছেন।

(নায়েব চলে যায়)

কালী করালী! তোর রক্তের লালসা পূর্ণ হোক মা!

(অদূরে আমিনের আর্তনাদ। মতিউল্লাহ্ পিছন দিক দিয়ে এসে তা শুনে থমকে দাঁড়ায়)

যবনের রক্ত–সরসীতে তোর কামনা–শতদল ফুটে উঠুক মা।

(মতিউল্লা'র চোখে জিজ্ঞাসা)

কে? ... ও ... তুই যা মেতো। এখানকার আলো নিভিয়ে দে'।

(আমিনের আর্তনাদ)

আমি মায়ের পূজায় যাচ্ছি।

(চলে যান কৃষ্ণদেব রায়। মতিউল্লাহ্ কাছে ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হয়ে যায়। সে আলো নিভিয়ে দেয়। অন্ধকারে নির্মলা আসে ছেলে কোলে, ত্রস্ত পায়। ছেলেটা কেঁদে ওঠে)

নির্মলা : চুপ, চুপ কর্ বাবা। কাঁদিসনে। ওই শয়তান শুনতে পাবে।

(অঙ্গন পার হয়ে চলে যায় সে। তারপরই কলিন্স এসে তাকে খোঁজাখুঁজি করে। রামচন্দ্র আসে)

কলিন্স : Where is she?

রামচন্দ্র : তা.তো ঠিক catch করতে পারলাম না sir, বোধ হয় গাঁয়ের পথে ...

কলিন্স : Damn fool ! Come along.

(ওরা দ্রুত বেরিয়ে যায়। মতিউল্লাহ্ নত মস্তকে ধীর পায় যেতে থাকে)

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক
দ্বিতীয় দৃশ্য

[গাঁয়ের পথ। আঁধার রাত। ভৈরব রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে এসে দাঁড়ায়]

ভৈরব : এ জমাট আঁধার যে আর সহ্য করতে পারি না। ... এ আঁধার দূর করে দাও, আশার আলো জ্বেলে দাও প্রভু। এ–দেশের মরা প্রাণে জীবনের বন্যা দাও। — কে?

(লণ্ঠন হাতে একজন প্রৌঢ় মুসলমান আসেন)

প্রৌঢ় : কে এখানে?

ভৈরব : আমি এক পথচারী।

প্রৌঢ় : এ আঁধার পথে একা দাঁড়িয়ে? আপনি কি পথ হারিয়েছেন?

ভৈরব : না, পথ হারাই নি। তবে অন্য এক পথের সন্ধান করছি।

প্রৌঢ় : কোথায় যেতে চান? সম্ভব হলে আমি সে পথ দেখিয়ে দিতে পারি।

ভৈরব : পারেন আপনি? শুনেছি, তিতুমীর নামে এক দেশভক্ত এমনি রাতের আঁধারে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। আমি তাঁর সংগে দেখা করতে চাই। পারেন সে পথের সন্ধান দিতে যে পথে তাঁর দেখা পাব?

প্রৌঢ় : আপনার নাম? পরিচয়? অবিশ্যি যদি আপত্তি না থাকে।

ভৈরব : দেবার মত পরিচয় আমার নেই। আমি ভৈরব রায়, শূদ্র।

প্রৌঢ় : আপনাকে বড় উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। ঘর ছেড়ে এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

ভৈরব : দেশী-বিদেশী নীলকরের অত্যাচারে আমি ঘর হারিয়েছি। আমি আজ সর্বহারা, তাই পথই আমার সম্বল।

প্রৌঢ় : কিন্তু তিতুমীর তো মুসলমান! তার কাছে কি সান্ত্বনা আপনি আশা করেন?

ভৈরব : আপনি বোধ হয় শয়তান কৃষ্ণদেবের কথারই প্রতিধ্বনি করছেন। আমার আশা : তিতুমীর মানুষ, দেশভক্ত। আমি দেশভক্ত মানুষের সাহায্য আশা করি।

প্রৌঢ় : হিন্দু হয়েও এত বিশ্বাস তিতুর উপর? যে তিতু এ-দেশ থেকে হিন্দুকে তাড়িয়ে দিতে চায়, তার উপর?

www.pathagar.com

ভৈরব : হ্যাঁ, তাঁর উপর। কারণ আমি জানি, যে মন দেশের দুঃখে কাঁদে, সে মনে হিংসার স্থান হয় না। দুশমণের এ প্রচার আমি বিশ্বাস করি না।

প্রৌঢ় : এ বিশ্বাস আপনাকে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দিক, এ কামনা করি। যতদূর জানি, তিতুকে মাসুমের বাড়ীতে পাবেন।

ভৈরব : অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আপনার পরিচয়?

প্রৌঢ় : আমি এক সামান্য মুসলমান, আপনারই মত পথচারী। আচ্ছা, রাত-ভোরে মাসুমের বাড়ীতে আবার দেখা হতে পারে। আদাব।

ভৈরব : আদাব।

(প্রৌঢ় চলে যান)

শান্ত, সৌম্য চেহারা। অথচ নাম বললেন না, কে ইনি।

(অদূরে নির্মলার আর্তনাদ শোনা গেল : বাঁচাও, কে আছ? বাঁচাও।)

কে?

(নির্মলা দৌড়ে এসে আছড়ে পড়তে যায়। ভৈরব রায় তাকে ধরে)

কে তুমি মা? কি হয়েছে তোমার?

নির্মলা : ওই, ওই শয়তানেরা ধাওয়া করেছে।

ভৈরব : কারা ধাওয়া করেছে?

(কলিন্স আসে। হাতে একটা আলো)

কলিন্স : তুম্ কাঁহা মেরা darling ? I see, you are here ! (ভৈরবকে দেখে) তুম্ কৌন্?

ভৈরব : ও! তুমিই ধাওয়া করেছ?

কলিন্স : Leave her to me. She is mine.

(হাঁপাতে হাঁপাতে রামচন্দ্র আসে)

রামচন্দ্র : এই যে, find out করা গেছে! ওরে বাপ্‌রে! একে তো কোমরে gout, তার উপর এই দৌড়াদৌড়ি। আশ্চর্য sir, মেয়েমানুষ এত run করতে পারে?

ভৈরব : মান আর জানের জন্যে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র : কে? ভৈরব রায় নাকি? তুমি এখানে কেন?

ভৈরব : মেয়েটি কি কৃষ্ণদেবের পুরোহিত-কন্যা রামচন্দ্র?

নির্মলা : হ্যাঁ বাবা, ওরা আমাকে ঘর থেকে ধরে এনেছিল। আমি কোন রকমে পালিয়েছিলাম। কিন্তু ...

ভৈরব : বুঝেছি মা। কৃষ্ণদেবের বন্ধু-প্রীতি।

www.pathagar.com

কলিন্স : Leave her নিগার। নির্মালা আমার আছে। ছোড় দো।

ভৈরব : শুনছ না সাহেব, মেয়েটি আমাকে বাবা বলে ডাকছে? ওর কোলের শিশু তোমাদের ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি কি আর মাকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি? তুমি 'সভ্য' ইংরেজ, তুমি কি বুঝতে পার না?

কলিন্স : You see, আমার হাতে পিস্তল আছে। নির্মালাকে ছোড় দো।

রামচন্দ্র : Sir, ভৈরব রায় আমাদের old দুশমণ।

কলিন্স : নির্মালাকে দিয়ে দাও নিগার।

ভৈরব : আর তা হয় না সাহেব। তুমি ফিরে যাও।

কলিন্স : তাহলে তুমিই শাস্তি গ্রহণ কর।

(পিস্তল উঁচিয়ে ধরে। ঠিক তখনই মাসুম পিছন দিক থেকে এসে সাহেবের পিঠে বল্লমের প্রান্ত ছোঁয়ায়)

মাসুম : তার আগে তোমার এ জুলুমী হাত আমি ভেঙ্গে দেব সাহেব। পিস্তল যথাস্থানে রাখ।

কলিন্স : (পিস্তল রেখে) Who are you?

রামচন্দ্র : এ কি happen করল Sir! তা হলে তো একটা অস্ত্রের খোঁজ করতে হয়!

(চলে যায়)

কলিন্স : কোথায় যাইতেছ রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : (নেপথ্যে) আসিতেছি স্যার, আসিতেছি!

কলিন্স : কাপুরুষ। (মাসুমকে) তুমি তিতুর সেনাপতি মাসুম আছ?

মাসুম : আর তুমি নীলকর সেনানায়ক আর্থার কলিন্স?

কলিন্স : তোমাকে আমি স্মরণ রাখিব।

মাসুম : তোমার কথাও আমার স্মরণ থাকবে সাহেব।

কলিন্স : আবার দেখা হবে।

মাসুম : সে আশাই করব আমি।

(কলিন্স চলে যায়)

তুমি কে মা?

ভৈরব : কৃষ্ণদেবের পুরোহিত-কন্যা।

মাসুম : আপনি কে?

ভৈরব : আমার নাম ভৈরব রায়। সিংহ-শাবক মাসুমের শৌর্যের কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। এখন দেখলাম, মাসুম সাহেব সিংহ-

www.pathagar.com

শাবকই বটে।

মাসুম : আমাকে বাড়িয়ে বলছেন। আপনার নাম আমি শুনেছি। শুনেছি, জালেমের বিরুদ্ধে আপনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। চলুন, পথে থাকা নিরাপদ নয়। যেতে যেতে আলাপ করব। চল মা।

নির্মলা : তুমি কি দেবতার আশীষ বাবা?

মাসুম : আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে এ আমার কর্তব্য মা। চল।

(ওরা চলে যায়)

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[মাসুমের বাড়ী। ঘরের অঙ্গন দেখা যায়। খোলা দরজা-পথে গাজী সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। পিছনে আসে সাহানা]

গাজী সাহেব : মা সাহানা! তোমাদের বাড়ীটার জৌলুস কিন্তু আর নেই।

সাহানা : জ্বি। দেখাশুনা করবার লোকও তো তেমন নেই চাচাজী। বড় ভাইজান জেহাদে যাবার পর উনিও কেমন হয়ে গেছেন। এসব দিকে,তেমন মন নেই।

গাজী সাহেব : হুঁম্। ... যাক্। অনেক রাত হল, এখনও মাসুম ফিরে এল না। আমি তো আর দেরী করতে পারি না মা।

সাহানা : আজ রাতটুকু আপনি এখানেই থেকে যান চাচাজী। বুড়ো মানুষ, রাত্রে যেতে আপনার কষ্ট হবে।

গাজী সাহেব : না মা, কষ্ট আর কি। পাল্কী রয়েছে, যেতে আর কতক্ষণ লাগবে?

সাহানা : আপনি বলে পাঠালেই উনি গিয়ে দেখা করতেন। শুধু এজন্য আপনাকে কষ্ট করে আসতে হত না।

গাজী সাহেব : লোক পাঠিয়েছিলাম মা। কিন্তু বাবাজীর সাক্ষাতই তো পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ব্যাপারটা খুব জরুরী। তাই কৃষ্ণদেবের বাড়ী থেকে ফেরার পথে ভাবলাম, বাবাজীর সংগে দেখাটা করেই যাই। তা ছাড়া তোমাকেও বহুদিন দেখি নি, তাই এলাম মা।

সাহানা : আপনি তো আমাকে ভুলেই গেছেন। আপনাদের খবরই শুধু পাই, চোখের দেখা তো পাই না।

www.pathagar.com

গাজী সাহেব ঃ সময় করে উঠতে পারি না মা। তা না হলে মাঝে মাঝে অবশ্যই আসতাম। তোমার জন্য মনটা পোড়ে। কিন্তু জমিদারীর কাজ-কাম করতে করতেই সময় চলে যায়।

(মাসুম আসে। সাহানা ভিতরে যায়)

এই যে বাবাজী! এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

(মাসুম সালাম করে)

মাসুম ঃ বাইরে একটু কাজ ছিল। আপনি কখন তশরীফ ফরমালেন? আমি খবর জানতাম না।

গাজী সাহেব ঃ তা প্রায় আধ ঘন্টা হবে। হ্যাঁ, একটা বিশেষ আলোচনার জন্য তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তখনও তুমি বাড়ীতে ছিলে না।

মাসুম ঃ আপনার নাশ্‌তা ...

গাজী সাহেব ঃ হয়েছে। এসব তোমার ভাবতে হবে না বাবাজী। মা আমার গাজীবাড়ীর মেয়ে। হ্যাঁ, আলোচনাটা হয়েই যাক।

মাসুম ঃ ফরমায়েস করুন।

গাজী সাহেব ঃ আলোচনা মানে– আচ্ছা, চাঁদপুরের মীর সাহেবের সংগে নাকি কৃষ্ণদেব রায়ের মনোমালিন্য ...

মাসুম ঃ মনোমালিন্য নয়। তবে কৃষ্ণবাবু মীর সাহেবের ধর্ম প্রচারে বাধার সৃষ্টি করছেন।

গাজী সাহেব ঃ কিন্তু সরফরাজপুরে মীর সাহেবের কাজ-কামে নাকি হিন্দু-মুসলমান খুব ক্ষেপে গেছে?

মাসুম ঃ জ্বি, হিন্দু-মুসলমানই ক্ষেপেছে। তবে সেসব হিন্দু-মুসলমান শুধু ওই কৃষ্ণবাবু, কালী বাবু, আর তাদের পোষ্য লোকজন।

গাজী সাহেব ঃ যাই হোক– ধর্ম প্রচারই বল, আর নিজ মত প্রচারই বল, কৃষ্ণবাবু যখন মীর সাহেবের বিরুদ্ধে, তখন তিনি কি এ–কাজে সফল হতে পারবেন? তা ছাড়া অহাবী আন্দোলন এখানে করার পিছনে কতটুকু যুক্তি আছে, তাও ভাবি।

মাসুম ঃ তিনি তো অহাবী আন্দোলন এখানে করছেন না চাচাজী?

গাজী সাহেব ঃ যতদূর জানি, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ সাহেব কলকাতায় বসে ইংরেজ আর হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আর মীর সাহেব সেই সভায় হাজিরও ছিলেন।

মাসুম ঃ জ্বি। তিনি তাতে হাজির ছিলেন। আর বাংলাদেশে তিনি সেই

www.pathagar.com

জেহাদের বিরোধিতাও করেছেন। তারই ফলে হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি এই বাংলার মুক্তি-আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টাই যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে। অবিশ্যি সে-আন্দোলন এখনই আরম্ভ হতে পারে না।

গাজী সাহেব : অথচ এখানে তিনি ইংরেজ আর হিন্দু জমিদারের সংগে বিবাদে মেতেছেন। ঠিক বুঝতে পারছি না, তিনি কি চান!

মাসুম : এখন তিনি চান বাংলার আত্মভোলা ঘুমন্ত মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষায় ও দীক্ষায় জাগিয়ে তুলতে।

গাজী সাহেব : কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে এইসব জাগানো-টাগানোর ব্যাপার কতটুকু সফল হবে, তাও তো বুঝতে পারি না বাবা!

মাসুম : আপনি ভুল শুনেছেন চাচাজী। হিন্দুর বিরুদ্ধে কিছু করা দূরে থাক, বাঙালীর এই জাগরণে হিন্দুদের সমর্থনই তিনি অন্তর দিয়ে কামনা করছেন। তা সাম্প্রদায়িকতার বিষে কলুষিত নয়। মুসলমানের সংগে হিন্দুও জাগবে, এই তিনি চান।

গাজী সাহেব : তিনি কি হিন্দুদের মুসলমান বানিয়ে জাগাতে চান নাকি?

মাসুম : জ্বি না। হিন্দুরা হিন্দু হয়েই জাগবেন। সেই জাগ্রত জনতার মিছিলে হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে চলবে।

গাজী সাহেব : যাক, চললেই ভাল। কিন্তু আমি ভাবছি, এই সব ছোটলোক হিন্দু-মুসলমানকে আস্কারা দেওয়াটা খুব ভাল হবে? মানে আমাদের সামান্য জমি-জমা রয়েছে, বিশিষ্ট খান্দান রয়েছে! ভাবি– এসব আন্দোলনে যে আগুন জ্বলবে, তাতে না সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়! জন-মান দুই-ই যদি গেল, তবে এসব মুক্তি-ফুক্তির আন্দোলন করে লাভ কি?

মাসুম : মীর সাহেবের মতামত এসব ব্যাপারে একটু ভিন্ন। খানদানি শরাফতীকে তিনি স্বীকার করেন না। বলেন, মানুষ সবাই সমান। আর তা তিনি বিশ্বাস ও পালনও করেন।

গাজী সাহেব : হুঁম্। কিন্তু মীর সাহেব যা করতে যাচ্ছেন, তাতে ইংরেজও ঠিক নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না, বাধা দেবে।

মাসুম : সেই বাধা যদি আসেই, তা অতিক্রম করার চেষ্টাও করা হবে।

গাজী সাহেব : তুমিও কি মীর সাহেবের মতামত সমর্থন কর?

মাসুম : জ্বি। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষায়-দীক্ষায়-অর্থে অন্যের গোলাম থাকলে মানুষ কোনদিন মানুষ হতে পারে না।

www.pathagar.com

গাজী সাহেব ঃ তাহলে গাঁয়ের সমস্ত চাষা, জোলা, কৈবর্ত, তাঁতি, ধোপা, নাপিত এসবকে তোমরা মানুষ করতে চলেছ?

মাসুম ঃ জ্বি। দোয়া রাখবেন চাচাজী। আমরা শুধু এসব লাঞ্ছিত হতভাগাদের বলে দিতে চাই, তোমরাও মানুষ। সমস্ত দেশের লোককে বলতে চাই, দাসত্ব আর মানুষ্যত্ব এক সাথে চলে না।

গাজী সাহেব ঃ হুঁম্। আমি তোমাদের পরমাত্মীয়। সাহানাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে তোমরা-আমরা এক হয়ে গেছি। তাই ভবিষ্যতের বিপদের কথা ভেবেই তোমাকে সাবধান করতে এসেছিলাম বাবা। এখনও বুঝে দেখ। মীর সাহেবের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছেন এ-দেশের বড় বড় জমিদার ও ইংরেজ সাহেবরা। তাঁর সংগে জড়িত থাকলে তুমিও সেই বিপদ থেকে রেহাই পাবে না। কাজেই বলছিলাম, কি প্রয়োজন এসব হাঙ্গামায়? আমরা যারা শরীফ মুসলমান আছি, তাঁদের যাত্রাপথ হিন্দু জমিদারদের যাত্রাপথ থেকে ভিন্ন নয়।

মাসুম ঃ কিন্তু ইসলামে আশরাফ–আতরাফ বলে মানুষে–মানুষে ফারাক করার বিরুদ্ধেই নির্দেশ রয়েছে।

গাজী সাহেব ঃ ও। এই তাহলে তোমার শেষ কথা?

মাসুম ঃ মীর সাহেবের পথ ও মতের সংগে আমার পথ ও মতের কোন পার্থক্য নেই চাচাজী।

গাজী সাহেব ঃ এ পথে চললে যে আগুন জ্বলবে, তাতে যদি পুড়ে মর?

মাসুম ঃ এই দেহটাই তাতে পুড়তে পারে, সত্য চিরদিন অমর।

গাজী সাহেব ঃ আজ তাহলে উঠি বাবা?

মাসুম ঃ আজ রাতটুকু এখানে থেকে গেলে হত না?

গাজী সাহেব ঃ না। কতটুকুই বা পথ। হ্যাঁ, আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ, বিনা কারণে কোন বিপদে পা বাড়াতে চাই না।

মাসুম ঃ আল্লা'র উপর শুধু ভরসা করাই মানুষের উচিত। কোন আত্মীয়-স্বজনকে বিপদে আমি ফেলব না চাচাজী।

(গাজী সাহেব চলে যান। মাসুম নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। সাহানা আসে)

সাহানা ঃ রোজ এত রাত করলে শরীর খারাপ হবে যে! ঘরে এস।

মাসুম ঃ সাহানা! তুমি চাচাজীর কথা শুনেছ। আমি চাই না, আমার জন্য অন্যেরা বিপদে পড়ুক। তুমি ভেবে দেখ।

সাহানা ঃ বাঃ, আর ভেবে দেখব কি? তুমি কি মনে কর, বিপদে

www.pathagar.com

তোমাকে একা ফেলে আমি নিরাপদ দূরত্বে চলে যাব? এ সন্দেহ তোমার মনে আসে কেন? এসব বাজে চিন্তা করো না। এবার বিশ্রাম করবে, এস।

মাসুম : আমার সাহানাকে আমি চিনি। তুমি যে আমার জীবন-দোসর। তবু চারদিকের এ ভীরুতার, স্বার্থপরতার বেড়াজালে মন হাঁপিয়ে ওঠে। মন জানতে চায়, আপনজন তার আপনই আছে।

সাহানা : এসব কথা যাক। আব্বা জিন্দা থাকলে চাচাজীর মত এ কথা বলতেন না। ওঁরা দূরে থাকতে চান, থাকুন। এস।

মাসুম : আজ এক অভাগিনীর কথা তোমাকে বলব।

সাহানা : এস, শুয়েশুয়ে বলবে।

(ভিতরে যায়। অঙ্গনে আঁধার নামে। একটু পরে বাইরে কে ডাকেন)

নেপথ্যে : মাসুম! মাসুম!

(ভিতরে আসেন। সেই পূর্বোক্ত প্রৌঢ় মুসলমান। হাতে সেই লণ্ঠন।

মাসুম ঘুমিয়ে পড়েছ?

মাসুম : (ভিতর থেকে) কে?

প্রৌঢ় : ওঠ মাসুম।

মাসুম : (ভিতর থেকে) কে আপনি?

প্রৌঢ় : আমি তিতু, তিতুমীর।

মাসুম : (বাইরে এসে) হযরত! আপনি এই রাত্রে!

তিতুমীর : হ্যাঁ মাসুম। আমরা যে রাত্রিরই যাত্রী। বাইরে একজন মেহ্‌মান আছেন।

মাসুম : মেহ্‌মান কে হযরত?

তিতুমীর : উনি পেশোয়ার থেকে এসেছেন। তোমার ভাইয়ের বন্ধু।

মাসুম : আমার ভাইয়ের কি খবর হযরত?

তিতুমীর : রণজিৎ সিংহের বাহিনীকে পরাস্ত করে পেশোয়ার দখল করতে গিয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তোমার ভাই তাঁদেরই একজন।

মাসুম : শহীদ হয়েছেন! ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিতুমীর : দুঃখ করো না মাসুম। তোমার ভাই বীর শহীদ। মৃত্যু জীবনেরই রূপান্তর, ধ্বংস নয়।

মাসুম : না হযরত, দুঃখ করব না। আল্লা'র বান্দা আল্লা'র রাহে প্রাণ দিয়েছে। তার জন্য দুঃখ কিসের! কিন্তু মেহ্‌মান সাহেব এত তকলীফ করে এখানে এসেছেন, তাঁর যথাযোগ্য সমাদর ...

www.pathagar.com

তিতুমীর ঃ না মাসুম। তোমার দাওয়াত কবুল করবার সময় ওঁর নেই। যদি পার, ওঁকে কিছু চাঁদা দাও, মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্য।

মাসুম ঃ সাহায্য।

তিতুমীর ঃ তোমার ভাই এই অন্তিম অনুরোধ জানিয়ে গেছেন যে ইসলামের খেদমতে তোমার ভান্ডার যেন উম্মুক্ত থাকে।

মাসুম ঃ হযরত।আমি আসছি।

(ভেতরে গিয়ে একটু পরে বেরিয়ে আসে। হাতে তার গহনা)

ইসলামের খেদমতে এ আমার সামান্য দান।

তিতুমীর ঃ মা'শাল্লাহ্! মাসুম! এই মন যতদিন বেঁচে থাকবে, মুসলমান বেঁচে থাকবে ততদিন। যুগে যুগে ঈমানদারের এমনি দানে ভরে উঠেছে ইসলামের ভান্ডার। এস, তুমি নিজের হাতে দেবে।

(দু'জন বেরিয়ে যান। সাহানা আসে। একটু পরে মাসুম ফিরে আসে)

মাসুম ঃ সাহানা!

সাহানা ঃ আমি খুশী হয়ে দিয়েছি এ-গহনা।

মাসুম ঃ আমিজানি।

সাহানা ঃ সুখ-ভোগ ত্যাগ করে যিনি জান কোরবান করলেন ইসলামের জন্যে, তাঁর অনুরোধের মর্যাদা কি এই সামান্য গহনায় হয়?

মাসুম ঃ তা হয় না। আমি ভাবছি, আল্লা'র কোমল সৃষ্টি এই নারী শক্তির কত বড় উৎস!

সাহানা ঃ আমাকে তুমি এমন করে বাড়িয়ে দিও না। তোমার মনযিলে মকসূদের পথে আমি যেন কোনদিন বাধা না হই!

মাসুম ঃ এমনি করে তুমি আমার প্রেরণা-ধারার সামনে থেকে বাধাবন্ধন দূর করে তার প্রবাহ বাড়িয়ে দিও। একি! তোমার কাজল চোখ ছলছল করছে?

সাহানা ঃ ও কিছু না। কিন্তু কোথা থেকে ওঁরা এত শক্তি পান?

মাসুম ঃ অন্তর থেকে সাহানা।। বহুদিন পর ঘুমন্ত মুসলমানকে ডাক দিয়েছেন রায়বেলীর সৈয়দ আহমদ। এ-দেশের দিকে দিকে সে আহ্বানে সাড়া জেগেছে! আত্মায় আত্মায় তারই প্রতিধ্বনিঃ আমি আছি।

সাহানা ঃ জানি, এ উদাত্ত আহ্বান মহান, মধুর। কিন্তু এর মহত্ত্বকে, মাধুর্যকে বরণ করতে প্রাণ যে কেঁপে ওঠে!

মাসুম ঃ কোমল প্রাণ তোমার, তাই।

www.pathagar.com

সাহানা ঃ রায়বেরেলীর সৈয়দ সাহেবকে আমি দেখি নি। কিন্তু ওই মীর সাহেবকে দেখে আমার কেমন ভয় করে।

মাসুম ঃ ভয় কেন সাহানা?

সাহানা ঃ ওঁর শান্ত, সৌম্য চেহারা দেখে। কত ভাল। বুকভরা মমতা, চোখভরা দরদ। কিন্তু মনে হয়, মমতা দিয়ে ওঁরা সর্বস্ব কেড়ে নেন।

মাসুম ঃ সর্বস্ব ফিরে পাওয়ার জন্যই বোধ হয় সাহানা! তোমার ঘরের শান্তি বজায় রাখার জন্যই প্রয়োজন এই আপাতঃ শান্তিনাশ।

সাহানা ঃ এত স্পষ্ট করে তুমি বলো না। আমাকে ধীরে ধীরে মন শক্ত করতে দাও। মীর সাহেব কোথায়?

মাসুম ঃ তিনি পেশোয়ারের দোস্তকে এগিয়ে দিতে গেছেন।

(ঝড়ের শব্দ)

সাহানা ঃ দেখ, আকাশে ঝড় উঠছে!

মাসুম ঃ ঝড়!

তিতুমীর ঃ (দূর থেকে) মাসুম!

মাসুম ঃ হযরত!... তুমি ঘরে যাও সাহানা।

(সাহানা চলে যায়। আসেন তিতুমীর)

তিতুমীর ঃ মাসুম! ঝড় উঠছে আকাশে। সারা জাহানের ঈমানদারের বুকে জ্বলছে অগ্নি-শিখা। দেশের দিগন্ত ছেয়ে আজ ঝড়ের দুরন্ত আহ্বান!

(বজ্রনাদ)

জেগেছে অগ্নিপুরুষ কোরাণের শিক্ষা নিয়ে, রসুলের দীক্ষা নিয়ে।

(ঝড়ের শব্দ বাড়ে)

মাসুম ঃ হযরত!

তিতুমীর ঃ মাসুম! দিকে দিকে আজ সাড়া জেগেছে। জীবনকে আজ মুসলমান একান্ত করে পেতে চায়। মৃত্যুকে তাই সে দোসর করেছে। আত্মোপলব্ধির মাঝে সে মুক্তি খুঁজে ফিরছে। এই নব জাগরণের দিনে, খাস মুসলিম হওয়ার এই উদাত্ত আহ্বানে আমরা কি নীরব থাকতে পারি?

মাসুম ঃ না হযরত। রাহেলিল্লার কাফেলায় সামিল না হলে মনুষ্যত্বের খেলাফ হবে।

তিতুমীর ঃ চির আযাদ মুসলমান আজ গোলামীর জিন্‌জির গলায় পরে মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

www.pathagar.com

শেখজী : (নেপথ্যে) হযরত!

তিতুমীর : কে? শেখজী! আসুন। কি খবর শেখজী?

(শেখজী এসে সালাম জানায়)

শেখজী : গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তার প্রজা মনসুর হাজীকে কয়েদখানায় আটক করেছে।

মাসুম : হাজী সাহেবের অপরাধ?

শেখজী : অপরাধ, তিনি মুসলমান। অপরাধ, তিনি আমাদের দলভুক্ত।

মাসুম : হযরত! এদের কার্যকলাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

শেখজী : শক্ত হয়ে না দাঁড়ালে আমাদের মেরুদন্ড ওরা ভেঙে দেবে হযরত! আজ সমস্ত মুসলমানের উপর ওরা জুলুম চালিয়েছে।

তিতুমীর : (আবেগময় কণ্ঠে) জুলুম ... (সংযতহয়ে) শেখজী! কি বলছে আমার মুসলমান ভা'য়েরা? তারা কি ভয় পেয়ে গেছে শেখজী? বর্জন করবে তারা আমার মুক্তি-আন্দোলন?

শেখজী : না, হযরত। যে বাণী তাদের কানে আজ পৌছেছে, জালেমের ঘৃণ্য শাসনে তারা তা ভুলে যাবে না।

তিতুমীর : সত্য, সত্য শেখজী?

শেখজী : সত্য হযরত।

ভৈরব : (নেপথ্যে) ভাই মাসুম!

মাসুম : কে? ও-ভৈরব রায়, আসুন। (ভৈরব রায় আসে) কিন্তু এই রাতেই এলেন?

ভৈরব : হ্যাঁ ভাই। ঘরই নেই, রাত আর দিন কি? মীর সাহেব কোথায়?

মাসুম : ইনিই তিতুমীর– সৈয়দ নিসার আলী।

তিতুমীর : বসুন ভৈরবরায়।

ভৈরব : আপনিই তিতুমীর?

তিতুমীর : এ-দেশের এক সামান্য মানুষ।

ভৈরব : আপনার সংগেই আমার দেখা হয়েছিল?

তিতুমীর : ভৈরব রায়ের নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, অধঃপতিত ওই বাঙালীর জন্য তাঁর মন কাঁদছে। তাঁর সাক্ষাতের জন্য আমিও ছিলাম ব্যাকুল। সে সাক্ষাত যখন পেলাম, পথে ছিল অন্ধকার। পরিচয় দিতে ভয় হল। ভাবলাম, আমাদের পরিচয়ে মোহের ছোঁয়া না থাক। এখন এই আলোতে আমরা পরিচিত হই। আপনি বুঝে নিন, হিন্দুকে আমরা ঘৃণা

www.pathagar.com

করি কিনা। তাড়াতে চাই কিনা।

ভৈরব : আমার মনে কোন সংশয় নেই। জনাব, দেশভক্তের মনে কোন আবিলতা থাকার কথা নয়। হিন্দু-মুসলমান এ দেশেরই লোক। মাসুম সাহেব আর আমি পরপস্পরকে ভাই বলেই ডাকছি। আর এ-ডাকে কোন সংকোচ নেই আমাদের।

তিতুমীর : আমি এ দেশের মুসলমানকে সত্যিকার মুসলমান করে গড়ে তুলতে চাই।

ভৈরব : আপনার এই নিঃসঙ্কোচ স্বীকৃতিকে আমি সশ্রদ্ধ সমর্থন জানাই। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

তিতুমীর : ইংরেজ আর হিন্দু-মুসলমান জমিদার আমার এ-কাজে বাধা দিচ্ছে।

ভৈরব : ওরা স্বার্থে অন্ধ। কিন্তু বাঙলার জনসাধারণ আপনার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাবে জনাব।

তিতুমীর : কলকাতায় আমাদের যে সভা হয়, তাতে আমার প্রস্তাবক্রমে স্বীকৃত হয় যে, এ দেশের জনসাধারণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিতে পারে।

ভৈরব : আমি কি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি না জনাব?

তিতুমীর : নিশ্চয়ই। হিন্দু জনসাধারণ আপনার কথা শুনবে। বুঝবে, কৃষ্ণদেব-কালীপ্রসন্ন-দেবনাথ রায় আর গাজী সাহেবের গোলামী করা মনুর নির্দেশ নয়। হিন্দুকে আপনি মনুর প্রকৃত আদর্শে জাগিয়ে তুলুন। জাগ্রত হিন্দু-মুসলমানের মুক্তি-পথে আমরা হাতে হাত রেখে চলতে পারি।

ভৈরব : আজ থেকে এই-ই আমার ব্রত। যখনই প্রয়োজন হবে, আমাদের সাহায্য আপনি পাবেন।

মনোহর : (নেপথ্যে) বাড়ীতে কে আছেন?

মাসুম : কে? ভিতরে আসুন।

(মনোহর রায় আসেন। সবাই অবাক হয়ে যায়)

ভৈরব : আপনি! চুতনার মনোহর রায়! এখানে?

মনোহর : মাসুম সাহেব কৃষ্ণবাবুর পুরোহিত-কন্যাকে ধরে এনেছেন?

তিতুমীর : আরও বোধ হয় শুনেছেন, তিতুর দল হিন্দুকে ঘৃণা করে, হিন্দুর উপর জুলুম করে, হিন্দুকে এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়? এতসব শুনেও দুশমণের ডেরায় আপনি এলেন?

www.pathagar.com

মনোহর : হ্যাঁ। সবই আমি শুনেছি। জানি– তিতুমীর বিদ্রোহী, চোর ডাকাত নয়। আর আসবার মত সাহস আমার আছে। আছে না ভৈরব রায়?

ভৈরব : এ-দেশীজমিদার-নীলকরের মধ্যে মনোহর রায় ব্যতিক্রম।

মনোহর : আমার প্রশ্নের উত্তর?

ভৈরব : আপনি বোধ হয় কৃষ্ণবাবুর বাড়ী থেকেই এখানে আসেছেন। নইলে দেখতে পেতেন, মা নির্মলা আপনার মায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে। আর মেয়েটির ভবিষৎ চিন্তা করে মাসুম সাহেবই মা-কে ওখানে পৌছে দিয়ে এসেছেন।

মনোহর : ও, বেশ বেশ। তাহলে সত্যিই আপনারা অমানুষ নন?

ভৈরব : মনোহর বাবু! মনের দ্বিধা কাটিয়ে কর্তব্য নির্ণয়ের সময় কি এখনও হয় নি?

মনোহর : আমার জন্য তো হয় নি। বুঝতে পারছ না ভৈরব রায় আমিও জমিদার, নীলকর। এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে আসার মত আবেগ আমার মনে আসে নি। তবে আসতে পারে। যাক, কৃষ্ণবাবুর নেতৃত্বে সমস্ত হিন্দু সমাজ ঘটনাটি নিয়ে বেশ হৈ চৈ আরম্ভ করেছে। অচিরেই তা হয় তো পল্লবিত হয়ে ফল দান করবে। আচ্ছা, আমি আসি।

(চলে যান)

ভৈরব : এখনও দ্বিধা, সংকোচ! এখনও মোহ-তন্দ্রা!

তিতুমীর : আমাদের আহ্বান এখনও প্রতি ঘরে পৌছায় নি ভৈরব রায়। দানবের অট্টহাসে সে-আহ্বান আজও তলিয়ে যায়।

(মতিউল্লাহ্ আসে)

কে? মতিউল্লাহ্ না? বসুন।

মতিউল্লাহ্ : কিন্তু আমার পরিচয় কি আপনার অজানা হযরত? আমি কৃষ্ণদেবের পাইক।

তিতুমীর : তবু এখানে আপনি মেহ্‌মান। কৃষ্ণদেবের আর কোন ফরমান আছে কি?

মতিউল্লাহ্ : জ্বি না। তবে খবর আছে।

তিতুমীর : বলুন।

মতিউল্লাহ্ : আপনার পত্রবাহক আমিনুল্লাহ্ বোধ হয় ফিরে আসে নি?

তিতুমীর : না। সে হয়তো তার বাড়ী হয়ে আসবে।

www.pathagar.com

মতিউল্লাহ্ : কিন্তু সে চিরকালের জন্য নিজের বাড়ীতে চলে গেছে।

তিতুমীর : কি বলছেন আপনি?

মতিউল্লাহ্ : পত্র বহনের অপরাধে সে জীবন দিয়েছে।

সকলে : এ্যাঁ!

তিতুমীর : ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। প্রথম শহীদ তাহলে আমিনুল্লাহ্!

মতিউল্লাহ্ : আপনি আমাকে পথের সন্ধান দিন জনাব। কৃষ্ণদেবের গোলামীতে আমি ইস্তফা দিয়েছি। বুঝেছি, তার চাকরী করা গুণাহ্।

তিতুমীর : আমার এ-আন্দোলন আপনাদের আন্দোলন। এখানে সবার সমান অধিকার।

মাসুম : আমাদের স্বপ্ন কি সফল হবে না হযরত?

তিতুমীর : হবে মাসুম, হবে। আজ না হোক কাল, কাল না হোক তারও পরে, এ-স্বপ্ন রূপ নেবেই। দেখছ না, ভৈরব রায় আজ আমাদের পাশে? গোলামীর জিন্‌জির ভেঙে মতিউল্লাহ্ মুক্ত। সত্যের বার্তাবহ আমিনুল্লাহ্ শহীদ! মানুষের প্রাণে যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সাফল্যের শান্তিবারি ছাড়া তা তো প্রশমিত হবে না বাবা।

মাসুম : কিন্তু এ-আগুন কি সবার মনেই জ্বলবে জনাব?

তিতুমীর : জ্বলবে। তবে তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। ... মাসুম! ভৈরব রায়! কোন ভয় নেই। ওদের বাধা যতই প্রবল হবে, আমাদের শক্তির ভান্ডার ততই ভরে উঠবে। সত্যের পথে আল্লাহ্ মানুষের সহায়।

(দূরে মিসকিন শা'র হাসি শোনা যায়)

কে? কে হাসছে মাসুম?

(মাসুম বেরিয়ে যায় ও মিসকিন শাহ্‌কে নিয়ে ফিরে আসে)

জনাব।

মিসকিন : কে? ও– তিতুমীর? ভাল ভাল, আমি তোমার কাছেই এসেছি ভাই। আমি মিসকিন, মিসকিন।

তিতুমীর : আপনি? শাহ্ কামালের প্রিয় শিষ্য মিসকিন শাহ্? আমার পরম সৌভাগ্য।

মিসকিন : না– না জনাব, না। আমরা দু'জনে ভাই। সৌভাগ্য আমার যে

www.pathagar.com

তোমার মত পুণ্যাত্মার দেখা পেয়েছি। আমার মুর্শেদ আমাকে পাঠিয়েছেন।

তিতুমীর : ফরমায়েস করুন জনাব। আপনার কাঁধে এসব কি?

মিসকিন : ও– হ্যাঁ হ্যাঁ, এসব কত কি। এই দেখ– কত চাল, ডাল, কত টাকা এনেছি। দিয়েছে, দিয়েছে সবাই। যার কাছে চেয়েছি, কেউ ফিরিয়ে দেয় নি।

তিতুমীর : এত চাল-ডাল কার জন্যে জনাব?

মিসকিন : শুনলাম আমিনুল্লাহ্ শহীদ হয়েছে। তার পরিবার পরিজন ছেলেমেয়ে রয়েছে, ওদের জন্যে কিছু লাগবে তো? ... বোকা! কিছু বুঝতে পারছ না? আমি এসেছি তোমার পাশে, তোমার এ-আন্দোলনে সাহায্য করতে। (আপনমনে) আল্লাহ্ হক।

তিতুমীর : জনাব, আমার ক্বাল্ব্ অস্থির হয়ে যাচ্ছে। এত আকর্ষণ আমাকে করবেন না।

মিসকিন : ওরে, ওরে পাগল! তুই যে আমার ভাই! তুই যে মানুষ! মানুষের কত দুঃখ! আহ্ তিতু, আমার দোজাহানের বাদশাহ্, আমার আরব-দুলাল সেই মহাভিখারীর আশাকে সফল করে তোল্ তিতু!

তিতুমীর : জনাব, আমরা তা পারব? সামনে যে অনেক বাধা!

মিসকিন : বাধা! হাঃ হাঃ হাঃ ... স্বপ্নভংগ নির্ঝরের গতি– পাগলের মত ছুটে চলে। কোন বাধা তাকে আটকে রাখতে পারে না। বাধা যদি আসে, দ্বিগুণ হয় তার গতি। সত্যের গতি, বাধা তার বন্ধন নয়। হাঃ হাঃ হাঃ ... যাবে, যাবে। সব ভেসে যাবে।

তিতুমীর : কিন্তু এত বিরাট দায়িত্বের বোঝা কি আমরা বইতে পারব জনাব?

মিসকিন : পারবে পারবে, বইতে পারবে। ঢেউএ ঢেউএ পাগল দরিয়া, সন্ধানী কর্ণধার একাই পারে শত আরোহীর তরণী পারে নিয়ে যেতে। তুমি পারবে। হ্যাঁ, আমি যাই। আমার আবার কত কাজ! যেতে হবে গোবরডাঙায়। বোকা জমিদার মনসুর হাজীকে কয়েদ করেছে। বোকা! হাঃ হাঃ হাঃ– জানে না, আল্লা'র বান্দা আর রসুলের উম্মতকে আটকে রাখা যায় না। হ্যাঁ, ভয় নেই তিতু। আমি আসব, সময় হলেই আসব।

(যাওয়ার জন্য পা বাড়ান। তখনই মাসুমকে দেখে বলেন–)

www.pathagar.com

তুমি? তুমি না গোলাম মাসুম? আমার তিতুর ডান হাত? হাঃ হাঃ হাঃ ... বেশ বেশ। আর তুমি?

ভৈরব : আমি ভৈরব রায় জনাব।

মিসকিন : ও- হোঃ হোঃ হোঃ ... তিতু! আর ভয় নেই। সব মানুষ আসছে। আলো জ্বালো। সব ... সব আঁধার কেটে যাবে।

তিতুমীর : দোয়া চাই জনাব।

মিসকিন : দোয়া? হাঃ হাঃ হাঃ ... পাগল! দোয়া সবাই করছে, সবাই। একই সূতায় বাঁধা সব মন। এক মনে টান দিলে সব মন জেগে ওঠে। বলেঃ আছি, এই তো আমি আছি। হাঃ হাঃ হাঃ ... (আপন মনে) আল্লাহ্ হক। হ্যাঁ, এবার আমি আসি। আর ঝড়-বাদলায় ভয় নেই। আমি আসব, হ্যাঁ আসব। হাঃ হাঃ হাঃ ...

(মাসুম ও ভৈরবের হাত তিতুমীরের হাতে রাখেন)

তিতুমীর : জনাব!

মিসকিন : আরে! মানুষের জন্য মানুষের কাজ করছ। ভয় কি? হ্যাঁ, আল্লাহ্কে ডেকো। আল্লাহ্ বলেছেন, ডাকলেই তিনি সাড়া দেন। বিপদে তাঁকে ডেকে বলোঃ তোর জন্য তোর কাজ করছি। তোর 'আমি'কে তুই সাহায্য কর্। দেখবে কথা না ফুরাতেই সাহায্য আসবে। হাঃ হাঃ হাঃ (আপন মনে) আল্লাহ্ হক। আল্লাহ্ হক।

(ভোরের পাখী ডাকে। আযান ভেসে আসে। দূরের পানে চেয়ে মিসকিন শাহ্ আপন মনে হাসেন। তন্ময় হয়ে যান যেন মিসকিন শাহ্। হঠাৎ সম্বিত পেয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান)

মাসুম : আশ্চর্য মানুষ এই মিসকিন শাহ্!

তিতুমীর : জান তো মাসুম, কস্তুরী সৌরভে চঞ্চল মৃগ ছুটে বেড়ায়! মাসুম, ভৈরব রায়, আর চিন্তা নেই। দরবেশের দোয়া পেয়েছি। এবার কাজের পালা। রাত্রি শেষ। ওই শোন ভোরের আযান। চল।

(নেপথ্যে কোলাহল, আগুনে বাড়ী পোড়ার শব্দ)

একি! কার বাড়ীতে আগুন লেগেছে। মাসুম, ভৈরব রায়, শিগ্গির চল।

(সবাই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যায়)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কৃষ্ণদেবের বাড়ী। বাড়ীর অঙ্গনে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। উত্তেজিত রামচন্দ্র তাদের সঙ্গে কথা বলছে]

রামচন্দ্র ঃ ইস্! কত বড় সাহস দেখলে? ইংরেজের kingdom, তাতে কৃষ্ণদেব রায়ের মত জমিদার। তা ছাড়া তোমরা village-এর কতগুলো people, এর মধ্যে আগুন ধরালে! বাপরে বাপ! সাহসের কথা think করলেই আমার heart কেঁপে ওঠে। অথচ ঠিক ঠিক আগুন ধরালে! আর বুকে সাহস থাকবে না কেন? ছোটকাল থেকে ওই ব্যাটা তিতুমীর বুক ডন করে করে বুকের অবস্থা যা করেছে, তাতে ডর-ভয় কি করে ঢোকে বল! হুঁক্ করে বুক ডন দিত তিতু, সেই শব্দ তোমরা শোন নি?

একজন ঃ তা আর শুনি নাই বাবু। প্রথম দিন শুনে তো ভয়ই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বুঝি বাঘে ডাকছে।

রামচন্দ্র ঃ তারপর কুস্তি। Big big পালোয়ানের কাছে প্যাঁচ-ট্যাঁচ শিখেছে। আর তার ভাগ্নে মাসুমও তাই। এখন think কর, ইয়া বড় বুক, এত শক্তি যাদের আছে, তারা মানুষের সঙ্গে গোলমাল করবে না কেন? আবার শুনেছি, ওরা প্রথম একচোট ঘর পুড়িয়ে তারপর মানুষসহ ঘর পোড়াবে।

একজন ঃ মানুষও পোড়াবে বাবু? কথাটা ভাবলেই শরীরটা কেমন করে।

রামচন্দ্র ঃ করবেই তো, শরীরটার দোষ কি। আগুন ধরে গেলে এই শরীরটা ছেরাৎ ছেরাৎ করে পুড়তে থাকবে তো।

একজন ঃ বাবু, এসব কথা মনে করলে ভয় করে।

রামচন্দ্র ঃ তাহলেই think কর, তিতুর পার্টিটা কি। মুসলমান হয়ে ওরা মুসলমানের ঘর জ্বালিয়ে দেয়। দিন দিন আরও পরিচয় পাবে।

একজন ঃ বাবু, মুখে তো ভাল ভাল কথা বলে।

রামচন্দ্র ঃ তা-ই বলতে হয়, নিয়ম আছে। তা না হলে এতদিন আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে বসবাস করছিলাম! পরস্পর ভাই-ভাই, চাচা-চাচা বাবা-বাবা মামা-মামা হয়ে একজন আরেকজনকে help করেছি। মনে নেই মেকো, ওই যে একদিন নীলের ঝগড়ায় প্রাণ যখন যায়-যায়, তখনও আমি

www.pathagar.com

নিজের জীবনটা নিয়ে শুধু দৌড় দিই নি, তোর হাত ধরে একসঙ্গে দৌড় দিলাম?

মেকো : মনে আছে বাবু। আমাদের মধ্যে হিংসা কি? আপনি দৌড়ে এসে আমার হাতে দুই গেলাস পানি খেলেন।

রামচন্দ্র : হ্যাঁ ... ইয়ে ... খেলাম মানে হ্যাঁ, তাহলেই think কর, কখন আমাদের মধ্যে হিংসা ছিল! আজও আমরা সদাশয় কোম্পানীর অধীনে হিন্দু-মুসলমান গলা জড়াজড়ি করে বাস করছি। হিন্দুর festival-এ মুসলাম জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্য করছে, আর মুসলমানের festival-এ হিন্দু অংশ গ্রহণ করছে। কেমন, করছে কিনা?

সকলে : হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো করছেই।

রামচন্দ্র : কিন্তু ওই তিতুর পার্টি আজ আমাদের মধ্যে হিংসার দেওয়াল তুলতে চায়। ওদের ইচ্ছা, হিন্দু-মুসলমান quarrel করে মরুক, আর সেই সুযোগে ওরা লুটতরাজ করে বড়লোক হোক।

একজন : সাংঘাতিক লোক তো!

রামচন্দ্র : তার উপর তারা চায় ইংরেজদের বিরুদ্ধ fight করতে।

একজন : সর্বনাশ।

রামচন্দ্র : Think কর। আদার ব্যাপারী হয়ে ইষ্টিমারের খবর! ওদের হাতে কেউ আমরা নিরাপদ নই। সকলকে ওরা পুড়িয়ে মারবে।

একজন : এ্যাঁহ্! মামার বাড়ীর আব্দার আর কি! আমরা গা পেতে দিয়ে বসে থাকব?

রামচন্দ্র : এ বিবেচনা তোমাদের। আর একটি কথা তো শুনেছই। কৃষ্ণদেবের পুরোহিতের daughter-কে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া মাসুমের উচিত হয়েছে? কৃষ্ণদেবের পুরোহিত মানে আমাদের সকলের পুরোহিত, আমাদের পুরোহিতের daughter আমাদের সকলের daughter, আমাদের mother. সেই বিধবা mother-এর উপর এই জুলুম! আর এ–কাজে মাসুমকে সাহায্য করেছে নীল-হাঙ্গামার কুখ্যাত ভৈরব রায়। অবিশ্যি খারাপ charracter-এর জন্যে কোন হিন্দু জমিদারও এ-কাজ সমর্থন করতে পারেন। তোমরা তো বুঝতেই পারছ । এবার think করে দেখ, এ-সব কাম-কাজ তোমরা নীরবে সহ্য করবে কি না!

www.pathagar.com

সকলে ঃ নিশ্চয়ই না। আমরা এসব সহ্য করব না।

রামচন্দ্র ঃ তা হলে এস, আমরা সকলে মিলে এই জুলুমের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াই। জমিদার বাবুরা সবাই আমাদের সাহায্য করবেন।

একজন ঃ করবেন তাঁরা সাহায্য?

রামচন্দ্র ঃ নইলে এতক্ষণ বলছি কেন? Help করার জন্য তাঁরা অধীর হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া ওই যে indigo-র সাহেবরা আছেন না, তাঁরাও help করবেন। আরে, ইংরেজ হল একটা প্রকান্ড গাছ। সেই গাছের ডালপালা, লতাপাতা হলাম আমরা। সেই ছায়াতে আমরা হিন্দু-মুসলমান সুখে শান্তিতে বাস করছি। ওরা চায় সেই গাছ কেটে আমাদের অসহায় করতে। ইংরেজ হল আমাদের father, আমরা তাঁদের son, তাই না?

সকলে ঃ তা তো নিশ্চয়ই।

রামচন্দ্র ঃ তাহলে আজ সকলে এই কথা বলবে ওই কৃষ্ণবাবুর কাছে।

একজন ঃ আমরা কি বলতে জানি? আপনি শিক্ষিত–

রামচন্দ্র ঃ English শিক্ষিত। আচ্ছা, আমিও তোমাদের হয়ে বলব। বেশী লোক দেখলে সাহেবরা আবার রাগটাগ করতে পারে।

(সকলে চলে যায়। রামচন্দ্র ক্লান্তিতে বসে পড়ে। নায়েব বাবু আসে)

নাবেয় বাবু। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ব্যাটা চাষাদের বোঝানো কি সহজ? নিজেরা আগুন লাগিয়ে তার দোষ ফেললাম তিতুর উপর! (রুচিহীনের মত হেসে ওঠে)

নায়েব ঃ একগ্লাস জল দেব?

রামচন্দ্র ঃ আপনি কেন আর কষ্ট করবেন?

নায়েব ঃ আরে, যে উপকার আপনি করলেন, তাতে আমি কেন, কৃষ্ণবাবু দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হবেন না।

রামচন্দ্র ঃ হ্যাঁ,এতক্ষণ গলা মারলাম। তা যদি দিতেই চান, তবে আর water কেন, শরবত দিতে পারেন- ঘোলের শরবত, ঘোল্‌স্‌ water.

(নায়েব যেতে চায়। কৃষ্ণদেব রায় আসেন)

কৃষ্ণদেব ঃ শোন। (রামচন্দ্রকে) কোম্পানীকে ভাল করে বোঝাতে হবে, তিতুর শক্তি সামান্য নয়। তাকে দমন না করলে অচিরেই সে রাজ-শক্তির মোকাবেলা করবে।

www.pathagar.com

রামচন্দ্র : Yes কর্তা, ওই কাজ একদম ফিনিস।

কৃষ্ণদেব : (নায়েবকে) নীলের জমি নষ্ট করিয়েছ?

নায়েব : আজ্ঞে কর্তা, বেনজামিন সাহেব পর্যন্ত জেনে ফেলেছে যে তিতুর দল তার নীল-ক্ষেত ধ্বংস করে দিয়েছে।

কৃষ্ণদেব : মোল্লাআটি কুঠির ম্যানেজার মিষ্টার ডেভিস কালীপ্রসন্ন বাবুর বন্ধু। ডেভিসের অধীনে আছে বহু লেঠেল আর সড়কীওয়ালা। আমার এই পত্র কালীবাবুর কাছে তুমি নিজে নিয়ে যাবে। ডেভিসকে আমাদের দলে চাই। আর নির্মলার ব্যাপারটা শুনে হিন্দু ছোটলোকেরা কি বলাবলি করছে।

নায়েব : আজ্ঞে বলছে, তিতুর হাত থেকে আর রক্ষা নেই।

কৃষ্ণদেব : রামচন্দ্র! তুমি শোন নি, সেদিন তিতু গোমাংস দিয়ে হিন্দুর দেবালয় অপবিত্র করেছে? আর এক ব্রাহ্মণের মুখে কাঁচা গো-মাংস গুঁজে দিয়ে তার জাতিনাশ করেছে?

রামচন্দ্র : (আমতা আমতা করে) না কর্তা, এখনও ...

কৃষ্ণদেব : আহ্, বুঝতে পারছ না? মানে–

রামচন্দ্র : ও– yes কর্তা। Understand করেছি। হ্যাঁ, এসব গোমাংসের কথাবার্তা আমি শুনেছি, আর village-এরও অনেকেই শুনবে।

কৃষ্ণদেব : নায়েব! হুগলী কুঠির এজেন্ট মিঃ পাইরণ, আরও কিছু নীলকর কলকাতার লাটু বাবুর বন্ধু। তোমাকে লাটু বাবুর কাছেও যেতে হবে। হ্যাঁ, বশীরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তী কি বললেন?

নায়েব : আজ্ঞে কর্তা, তিনি রাজী আছেন। বলেছেন, হিন্দু জাতির এ-মহান কাজে প্রাণ দিয়েও যদি সাহায্য করতে হয়, তিনি করবেন। তিনি তিতুকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করবেন।

কৃষ্ণদেব : বেশ। ওই বুঝি কলিন্স সাহেব এলেন। সাহেবকে সামলাও রামচন্দ্র।

(কলিন্স আসে)

কলিন্স : Here you are kishen Deb!

কৃষ্ণদেব : কেমন আছেন সাহেব?

কলিন্স : আমি কেমন আছি, আপনি জানেন কিষেণ দেব। আজ আমার কেবল এক চিন্তা। রামচন্দ্র!

রামচন্দ্র : Sir!

www.pathagar.com

কলিঙ্গ : নির্মালার খবর আছে?

রামচন্দ্র : খবর sir খুব good নয়, মানে ...

কলিঙ্গ : What?

রামচন্দ্র : Not sir, অন্য কিছু না। মানে নির্মলাকে আমরা পাবই। কিন্তু তার আগে বহুত গোলমাল–

কলিঙ্গ : আওর কি গোলমাল। গোলমাল তো লাগিয়া আছে। I want to have her. তাহার কত দেরী?

রামচন্দ্র : দেরী তেমন নেই। তবে তিতু আর মাসুমের হাতে পড়েছে কিনা...

কলিঙ্গ : মাসুম, মাসুম।

কৃষ্ণদেব : রামচন্দ্র। সাহেবকে যুদ্ধের কথা বল।

রামচন্দ্র : Sir! তাড়াতাড়ি নির্মলাকে হাত করায় উপায় তিতুকে যুদ্ধ করে শেষ করে দেওয়া।

কলিঙ্গ : No, আমি জানি নির্মালা তিতুকা পাশ না আছে।

কৃষ্ণদেব : সাহেব, এবার একটু বিশ্রাম করে নিন।

কলিঙ্গ : No, আমার সময় নাই। চললাম।

রামচন্দ্র : আমিও come sir?

কলিঙ্গ : No. No need.

(গম্ভীরভাবে চলে যায়)

কৃষ্ণদেব : ব্যাপার কি রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : সাহেবের character কর্তা, underdtand করা সহজ নয়।

কৃষ্ণদেব : খুব সাবধান রামচন্দ্র। সাহেবের বোধ হয় সন্দেহ জেগেছে।

রামচন্দ্র : একেবারে পাগলা dog হয়ে আছে কিনা কর্তা, তাই যতই দেরী হচ্ছে,ততই সন্দেহ করছে।

কৃষ্ণদেব : হুঁম্। তুমি যাও রামচন্দ্র। আমার লেঠেল, সড়কীওয়ালা প্রস্তুত কিনা দেখে এস। আজই তিতুকে শায়েস্তা করতে বেরুতে হবে।

রামচন্দ্র : আজই কর্তা?

কৃষ্ণদেব : হ্যাঁ, দেরীতে অনেক অনিষ্ট হতে পারে। আর তুমি সাহেবকে ভাল করে বোঝাও যে নির্মলা তিতুর বাড়ীতে ...

(মনোহর রায় আসেন)

মনোহর : কিন্তু নির্মলা যে আমার বাড়ীতে রায় বাবু? তাকে তো মাসুম বা

www.pathagar.com

ভৈরব রায় ছিনিয়ে নিয়ে যায় নি? বরং যে পাষন্ড আপনার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আপনারই আশ্রয় থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার হাত থেকে বাঁচিয়ে মাসুম তাকে আমার বাড়ীতে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

(রামচন্দ্র চলে যায়)

কৃষ্ণদেব : এ্যাঁ! তাই নাকি? তা হলে খুব রক্ষা তো! মা কালী! হিন্দুর মান রক্ষা করেছ মা।

মনোহর : সেই মান কিন্তু রক্ষা করেছেন তিনি এক মুসলমাদের হাত দিয়ে!

কৃষ্ণদেব : মায়ের লীলা বোঝে কার সাধ্য মনোহর রায়? হ্যাঁ, মেয়েটিকে এখানেই তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন না কেন? তার পিতা আশ্রয় না দিলেও আমি তো ছিলাম।

মনোহর : মেয়েটি এখানে তেমন নিরাপদ মনে করছে না।

কৃষ্ণদেব : হাঃ হাঃ ... শোন কথা। নিজের পিতা, আমিও পর নই, অথচ এখানে আসতে চাইছে না। কি আ-চর্য! শাস্ত্রে বলে অবিশ্যিঃ

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

আপনি আমি সাধারণ মানুষ মনোহর রায়। নারী চরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

মনোহর : কিন্তু এর মধ্যে রহস্যোদ্‌ঘাটনের কি আছে? আমি যতদূর ভাবতে পেরেছি, মনে হয়েছে অন্যায় তিতুর দল করছে না, করছেন আপনারা, করছি আমরা।

কৃষ্ণদেব : মনোহর রায়! আপনি যে মন নিয়ে এ-জগৎকে দেখেন, জগৎটার ঠিক সেই মনটি নেই। আপনার মন কোমল, সুন্দরের ধ্যানই আপনার মনের কাম্য। কিন্তু জানেন তো, কোন সত্যই চরম সত্য নয়। আপনি যা ভেবেছেন, তার বাইরেও সত্য থাকতে পারে।

মনোহর : কিন্তু মাসুম আর ভৈরব রায় যে মেয়েটিকে নেয় নি, নিতে চেয়েছিল আপনারই বন্ধু আর্থার কলিন্স- এ বিষয়ে তো আর আপনি সন্দেহ করতে পারেন না?

কৃষ্ণদেব : যদি বলি, মেয়েটির চরিত্রের দুর্বলতা বশতঃই মাসুম-ভৈরবের হাতে পড়ে তাদের বোল বলছে, তাহলে? যদি বলি কলিন্স সাহেব মেয়েটির চরিত্রের স্বরূপ জেনে মাসুম-ভৈরবের সঙ্গে

www.pathagar.com

ভাগ বসাতে চেয়েছিল, তাহলে আপনি অবিশ্বাস করবেন কি করে? আরও যদি বলি, মাসুম-ভৈরব কলিন্স ও তার পিতার হাতে থেকে নিরাপদ অভিপ্রেত স্থানে রাখবার জন্যই মনোহর রায়ের কোমল মনের সুযোগ নিয়েছে, তাহলে?

মনোহর : তাহলেও মেয়েটির মুখের স্বীকৃতিতে আপনার সমস্ত সন্দেহই অমূলক প্রমাণিত হয়ে যায়। আপনার সন্দেহ সন্দেহই। তাকে সত্যের আলোকে তুলে ধরবার মত প্রমাণ আপনার নেই।

কৃষ্ণদেব : তাহলে জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটি তার পিতার কাছে ফিরে আসতে চায় না কেন?

মনোহর : কারণ, সে জানে তার পিতা তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু আরেকটি কথা। কলিন্স সাহেব আমার বাড়ীতেই মেয়েটিকে আক্রমণ করতে পারতেন। তিনি ওকে গাঁয়ের পথে ধরতে যাবেন কেন? আর ঠিক সেই সময়ই মাসুম আর ভৈরব রায় তাকে রক্ষা করবার জন্য ওখানে হাজির হবে কেন? আপনার চিন্তাকে এ-পথেও বিচরণ করতে অনুরোধ জানাই মনোহর রায়।

মনোহর : বেশ, চিন্তা আমি করব। আবার আসবো আমি।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু এ-ঘটনার সংগে তিতুকে দমন করার কোন সম্পর্ক আছে? আমরা কি হিন্দু হিসাবেই এক হয়ে সংগ্রাম করতে পারি না?

মনোহর : কিন্তু তার আগে দেখতে হবে, আমার এ-হিন্দুত্ব ফলাতে গিয়ে দেশের কোন অমংগল না হয়।

(চলে যান। রামচন্দ্র আসে সন্তর্পণে)

রামচন্দ্র : কর্তা!

কৃষ্ণদেব : কি ব্যাপার রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : ব্যাপার সাংঘাতিক কর্তা। সে এসেছে।

কৃষ্ণদেব : কে এসেছে রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : সে। যার জন্য এত প্ল্যান, সে এসেছে।

কৃষ্ণদেব : স্পষ্ট করে বল, কে এসেছে?

রামচন্দ্র : নির্মলা।

কৃষ্ণদেব : এ্যাঁ। নির্মলা এসেছে? ... কিন্তু যাতে আবার যথাস্থানে সে ফিরে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা কর। সাহেব যেন ঘুণাক্ষরেও টের না

www.pathagar.com

পায়, নির্মলা এখানে এসেছিল।

রামচন্দ্র : ব্যাপরটা understand করতে পারলাম না কর্তা।

কৃষ্ণদেব : রামচন্দ্র! তুমি একটি বোকা। কলিন্স সাহেবকে আমার চাই। কলিন্স সাহেবকে পাওয়ার অর্থ তার দুরন্ত স্বভাবকে পাওয়া। সাহেব নির্মলাকে এখন পেতে পারে না। পেতে আমি দেব না। তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমান চাষীর সমর্থনও আমার দরকার। তুমি যাও।

(দু'জন দু'দিকে চলে যায়)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গাঁয়ের পথ। আলাপ করতে করতে এসে দাঁড়ান তিতুমীর ও শেখজী]

শেখজী : ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ পর্যন্ত যা করবার সাহস পায় নি, কৃষ্ণদেব তাই করল। মসজিদ পুড়িয়ে দিয়ে মুসল্লীদের পুড়িয়ে মারল।

তিতুমীর : এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই শেখজী। ইংরেজ চায় রাজত্ব আর শোষণ। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টিতেই সে-উদ্দেশ্য সফল হবে তাদের। কিন্তু কৃষ্ণদেব যে এ দেশকে ইসলাম-মুক্ত করতে চায়!

শেখজী : কিন্তু এতগুলো মুসলমানকে নির্মূল করার কল্পনা তার আসে কি করে?

তিতুমীর : ভুল করলেন শেখজী। নামধারী মুসলমানের সংখ্যা সে কমাতে চায় না, চায় মুসলমানের বুক থেকে খাঁটি ইসলামকে মুছে ফেলতে। মোহ বিস্তার করে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে।

শেখজী : কিন্তু জুলুম করে জাগ্রত মানুষকে সে ঘুম পাড়াবে কি করে?

তিতুমীর : জাগ্রত যারা, তারা যদি ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘুমন্তের মত শুয়ে থাকে, তবেই তার আশা সফল হয়। এখানেই আমাদের মনোবল ও ঈমানের পরীক্ষা শেখজী। যে আগুনে মসজিদ পুড়ে গেল, সে

www.pathagar.com

আগুনকে ভয় করি আমি তখনই, যখন তা আমাদের ঈমানকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে। কিন্তু এ আগুনে সেই ঈমানের কালিমা পুড়ে যদি খাঁটি সোনা হয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে, তাহলে অচিরেই আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারব এমনি কত মসজিদ।

শেখজী : কিন্তু কোম্পানীর একি অবিচার! আমাদের নালিশে তারা কর্ণপাতও করলেন না! আমার মনে হয়, শক্তি দিয়ে সকল জালেমের মোকাবিলা করা উচিত।

তিতুমীর : এখনও তার সময় আসে নি শেখজী। এখন আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন।

(মাসুম আসে)

মাসুম : কিন্তু দুশমণ আজ আমাদের সেই বড় প্রয়োজনের মূল্যেই আঘাত হানছে জনাব। অঙ্কুরিত শক্তিকে ধ্বংস করতে তারা বদ্ধপরিকর। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াসের মাঝখানে হিংসার প্রাচীরকে সুদৃঢ় করার জন্য কৃতসংকল্প।

তিতুমীর : কিন্তু মাসুম, এখনও যে আমাদের লাঞ্ছিত ভায়ে'রা একত্রিত হয় নি।

(ভৈরব রায় আসে)

ভৈরব : তাদের একত্রিত করার জন্যই, অঙ্কুরিত শক্তির কিশলয়কে বিরাট মহীরূহে পরিণত করার জন্যই, আজ আত্মরক্ষার প্রয়োজন জনাব।

তিতুমীর : আমার শুধু ভয়, সেই কচি কিশলয়ের গায়ে না জানি কত বড় আঘাত লাগে! আজ আমাদের সবেচেয়ে বড় প্রয়োজন শক্তি সঞ্চয়ের, লাঞ্ছিত হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের!

ভৈরব : কিন্তু কৃষ্ণদেব নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই জনাব!

মাসুম : আমি শুদু আত্মরক্ষার আবেদনই জানাতে চাই জনাব। ... কে, নির্মলা?

(নির্মলা আসে)

নির্মলা : হ্যাঁ, আমি। আমি আবার ফিরে এসেছি আমার বাড়ী থেকে।

ভৈরব : কিন্তু সেখানে তুমি গেলে কেন মা? যদি কৃষ্ণদেব তোমাকে ফিরে আসতে বাধা দিত?

মাসুম : মনোহর রায়ের বাড়ী কি তোমার জন্য নিরাপদ ছিল না?

www.pathagar.com

নির্মলা : ছিল। কিন্তু আমাকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে নীলকরের কাছে মনোহর রায় নিরাপদ ছিলেন না। তাঁর মায়ের এই শঙ্কা বুঝেই আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমার পিতার আশ্রয়ে।

তিতুমীর : সে আশ্রয় কি তোমার ভেঙে গেছে মা?

নির্মলা : হ্যাঁ বাবা, কৃষ্ণদেবের স্বার্থের আঘাতে সে আশ্রয় আমার ভেঙে গেছে। আমি নাকি জাতিভ্রষ্টা। কালী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বাবা আমাকে এই কথাই বললেন।

ভৈরব : জনাব, আমাদের নামে কলংক দিতে, হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেই কৃষ্ণদেবের প্রয়োজন নির্মলাকে এমনিভাবে ঘরহারা করবার।

নির্মলা : বাবা, পথের অন্ধকার কি দূর হবে না?

তিতুমীর : হবে মা, হবে। তোর কোলের এই শিশুকে বাঁচিয়ে তোল মা। তাকে বড় কর, মানুষ কর। আজ হিন্দু-মুসলমান ভুল করছে সত্য, কিন্তু তোর ছেলেরা সে ভুল করবে না। যে দিন তোর অপমানের কথা সে বুঝতে পারবে, সেদিন কৃষ্ণদেবের দল এত সহজে ওদের ভুল বোঝাতে পারবে না। আজ যদি মা রাতের অন্ধকার তোর চলার পথ ঢেকে দেয়, কাল ওর মনের সত্যে সে পথ তোর আলোময় হয়ে উঠবে। ভৈরব রায়, আমার মায়ের ব্যবস্থা কর।

ভৈরব : তুমি কোথায় যাবে মা?

নির্মলা : যেখানে এই শিশু নিরাপদে থাকবে, ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে আজ থেকে আমি সেখানেই থাকব।

ভৈরব : এস।

(নির্মলা ও ভৈরব চলে যায়। মতিউল্লাহ্ আসে)

মতিউল্লাহ্ : জনাব! এক দুঃসংবাদ পেয়েছি।

তিতুমীর : আবার কি কৃষ্ণদেবের দল আমাদের আক্রমণ করতে আসছে?

মতিউল্লাহ্ : জ্বি জনাব। এবার আসছে কৃষ্ণদেব, বেনজামিন, কলিন্স আর ডেভিস সাহেব। তাদের একদল আসছে ইছামতি দিয়ে, অন্যদল আসছে স্থলপথে।

তিতুমীর : মাসুম!

মাসুম : আমরা প্রস্তুত জনাব। আজ শুধু আত্মরক্ষা নয়, আজ নীলকর ও কৃষ্ণদেবের দলকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আগুনে হাত দিলে হাত

www.pathagar.com

পোড়ে।

তিতুমীর : তুমি ইছামতির দিকে রওয়ানা হও, আর আমি থাকছি অন্যদলের মোকাবিলা করতে। ভয় নেই মাসুম, আল্লাহ্ আছেন।

(একদিকে তিতুমীর ও মতিউল্লাহ্, অন্যদিকে মাসুম ও শেখজী পা' বাড়ায়)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[মাসুমের বাড়ীর উঠান। অন্ধকারে হাতে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাহানা ও নসিবন]

সাহানা : নসিবন! আজকের রাত কি ভোর হবে না রে?

নসিবন : হবে বিবি সাহেবা, হবে। একটু আগে পাখি ডেকেছিল গাছে গাছে। অর্ধেক রাত কেটে গেছে। কিন্তু আপনি ঘুমুতে যাবেন না বিবি সাহেবা?

সাহানা : ঘুম?–নসিবন! আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, ঘুম আমাকে চিরতরে ছেড়ে গেছে!

নসিবন : কেন বিবি সাহেবা?

সাহানা : জানিসনে, আমার জীবনের শান্তি ওই আঁধার রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! নসিবন, এখনও উনি এলেন না! তাহলে কোন বিপদ–

নসিবন : না বিবি সাহেবা, বিপদ হলে খবর পেতাম।

সাহানা : খবর দেওয়ার কথা কি ওঁর মনে থাকে? উনি হয় তো ভুলেই গেছেন যে আমি রাত জেগে পথে দাঁড়িয়ে আছি। নসিবন, আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ কতদিন?

নসিবন : তা প্রায় এক বছর হবে।

সাহানা : তার অর্ধেক সময়ও আমি ওঁকে একান্ত করে কাছে পাই নি। আজ দুর্যোগ ঘনিয়েছে দেশের ভাগ্যে, আমার ভাগ্যেও।

নসিবন : এ দুর্যোগ কেটে যাবে বিবি সাহেবা।

সাহানা : যাবে? রাতদিন আল্লা'র কাছে মোনাজাত করি, তাই যেন হয়। কিন্তু রাতের আঁধারে আমার মনে নামে নৈরাশ্যের ছায়া। আজ নদীতে ওঁর সংগে যুদ্ধ হচ্ছে দুশমণের।

নসিবন : ভয় কি বিবি সাহেবা? উনি বীর।

www.pathagar.com

সাহানা : তুই জানিসনে নসিবন, ইংরেজদের হাতে আছে বন্দুক। হয়তো–

নসিবন : থাক না বন্দুক, আল্লাহ্ আছেন আমাদের সহায়।

সাহানা : তবু যদি আঘাত লাগে ওঁর গায়?

নসিবন : মীর সাহেব আছেন, ভয় কি?

সাহানা : কিন্তু নদীর ঢেউ-এ যদি নৌকা ডুবে যায়?

নসিবন : আল্লা'র নৌকা ডুববে না বিবি সাহেবা।

সাহানা : নদীতে যদি ঝড় ওঠে?

নসিবন : তৌহিদের নৌকা পার হবেই।

সাহানা : তাই যেন হয় আল্লাহ্। ... নসিবন! ওই বুঝি আসছে সে, আসছে আমার দুরন্ত বিজয়ী। চল, তার অভ্যর্থনার আয়োজন করি গে'।

(চলে যায়। কথা বলতে বলতে আসে মাসুম ও শেখজী)

মাসুম : ইংরেজ নীলকর বুঝতে পেরেছে শেখজী যে বাঙালী ভীরু নয়!

শেখজী : শুধু নীলকর কেন, কোম্পানীর কর্মচারীরাও একথা ভাল করেই বুঝেছে।

মাসুম : বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার নিজে এসেছিল কালা আদমীকে টিট করতে। এসেছিল নীলকরদের আগের পরাজয়ের শোধ নিতে।

শেখজী : শেষতক নিজেই টিট হয়ে গেল মাসুম সাহেব। কিন্তু আত্মীয় হয়েও গাজী সাহেব কি করে ওদের সাহায্য করলেন?

মাসুম : গণ-অভ্যুত্থানকে যারা ভয় করে, আত্মীয়ের সর্বনাশ করতে তারা মোটেই পিছপা হয় না।

শেখজী : কেন তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে, ইংরেজ এ-দেশবাসীর দুশমণ?

মাসুম : বুঝতে পারে না, তা নয়। বুঝতে পেরেই, হুজুর বলতে শিখেছে বলেই তো আজ ওরা জমিদার, শান্ত সুখী মানুষ!

শেখজী : গোলামের আবার শান্তি ও সুখ!

মাসুম : দেখছেন না, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুরটা কত আয়েশে দিন কাটায়!

শেখজী : তা-ই। কিন্তু মীর সাহেব এখনো ফিরে এলেন না?

তিতুমীর : (নেপথ্যে) মাসুম !মাসুম!

মাসুম : আসুন জনাব। আমরা এখানেই রয়েছি।

(তিতুমীর আসেন হাসি মুখে)

www.pathagar.com

তিতুমীর : এই যে শেখজীও রয়েছেন। ওরা আমাদের খাঁটি পরিচয় পেয়েছে তো?

শেখজী : ঊর্ধশ্বাসে পলায়ন করতে গিয়ে নিশ্চয়ই এ সত্য বুঝতে পেরেছে। আপনার বিজয় সংবাদও আমরা পেয়েছি।

তিতুমীর : কিন্তু চেয়ে দেখুন শেখজী, আকাশে কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

মাসুম : তবু ভোরের সূর্য হেসে উঠবেই জনাব।

তিতুমীর : এবার আয়োজন কর। কাল আমরা নারকেলবেড়িয়ার যাব।

মাসুম : নারকেলবেড়িয়ায়?

তিতুমীর : হ্যাঁ, সেখানেই গড়ে উঠবে আমাদের শক্তির কেল্লা, বাঁশের কেল্লা। ঘর আমাদের আর নিরাপদ নয়। তাই গড়ই হবে আমাদের আশ্রয় স্থল।

(হাসতে হাসতে মিসকিন শাহ্ আসেন)

মিসকিন : হাঃ হাঃ হাঃ ...

তিতুমীর : জনাব!

(সবাই সালাম জানায়)

মিসকিন : আল্লা'র রাজ্য, ঘর আর গড় সমান। কোন তফাৎ নেই। ওরা বুঝি হেরে গেছে? বেশ বেশ, এমনি করে হারিয়ে দাও। পাহাড় প্রমাণ বাধা, এক দিনে হয় তো ধ্বসে পড়বে না। কিন্তু বারবার কর আঘাত, দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ। পড়বে, একদিন ভেঙে পড়বেই। জালেমের শক্তি আল্লাহ্ ভেঙে দেন। কিন্তু কাজ করতে হয় মানুষকে। তোমরা মানুষ, কাজ করে যাও। একদিন এ শক্তি ভাঙবেই। আচ্ছা, আমি আসি– এ্যাঁ?

তিতুমীর : একটু বসবেন না জনাব?

মিসকিন : না। দেখতে এসেছিলাম। দেখে গেলাম। আবার আসব। আল্লাহ্‌র কাছে শোকর আদায় কর।

(দূরে বন্দুকের আওয়াজ)

ও কিছু না। জালেম-শক্তির আস্ফালন। ভয় নেই। তিতু, আল্লা'র শান্তিরাজ্য স্থাপন করা সহজ কাজ নয়। বড় পরিশ্রম। নিরাশ হয়ো না। আচ্ছা, আমি আসি। আল্লাহ্ হক।

(হাসতে হাসতে চলে যান। আবার বন্দুকের আওয়াজ হয়। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক
চতুর্থ দৃশ্য

[কৃষ্ণদেব রায়ের কাছারীর প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যা হয়-হয়। কৃষ্ণদেব রায় পায়চারী করছেন। পাশে রয়েছে রামচন্দ্র। অদূরে পূজোবাড়ীতে বাদ্যধ্বনি হচ্ছে। কৃষ্ণদেব গভীর চিন্তামগ্ন]

কৃষ্ণদেব : আহ্! এত গোলমাল হচ্ছে কেন রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : আজ্ঞে কর্তা, গোলমাল তো নয়, mother কালীর আরতির সময় হয়েছে কিনা, তাই বাদ্য বাজাচ্ছে। একে গোলমাল বলা পাপ কর্তা।

কৃষ্ণদেব : ও হ্যাঁ। ... রামচন্দ্র! ভাবছি, কত শক্তি ওই সামান্য তিতুর। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার সাহেবকে পর্যন্ত হারিয়ে দিলে।

রামচন্দ্র : হয় কর্তা, এ-রকম হারজিত মাঝে মাঝে হয়।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে তিতুর দল জয়ী হচ্ছে, ভাবনার কথা।

রামচন্দ্র : হ্যাঁ কর্তা, কথাটা ভাবনারই বটে। তবে এসব win তো আর win নয়, defeat-এর introduction.

কৃষ্ণদেব : কিন্তু ভাবছি, তিতুর অপরাধ কতটুকু। অথচ যুদ্ধবিগ্রহ, দুঃশ্চিন্তার আগুন ... তিতুর হাতে প্রাণ দিল গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়, প্রাণ দিচ্ছে কত লোকজন।

রামচন্দ্র : তা- অপরাধ হয়তো তেমন কিছু নেই, তবে এবারে একটা কথা বলি কর্তা। শুনেছি মদ খাওয়া ছেড়ে দিলে মাতালের স্বাস্থ্য ভংগ হয়, অকালে মারাও যায়।

কৃষ্ণদেব : তুমি কি বলতে চাও রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : আজ্ঞে কর্তা, mother কালীর আরতি কানে যখন গোলমাল হয়ে বাজল তখনই বুঝেছি, ভাবনাটা আপনার চলার পথে এগোচ্ছে না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

কৃষ্ণদেব : না না, যে পথে এগিয়ে চলেছি, এগিয়ে যাব সে পথে। থেমে গেলে চলবে না রামচন্দ্র। ঢোঁড়া সাপ আজ কেউটে হয়ে ছোবল দিয়েছে।

রামচন্দ্র : হ্যাঁ কর্তা, তারই বিষে তো পাগল হয়ে যাচ্ছি আমরা। আর কথা আছে না, সাপকে আঘাত করে ছেড়ে দিলে নিরাপদ শয্যায় এসে দংশন করে। তাই বলছিলাম ... অবিশ্যি আরাম কি আমিও চাই

www.pathagar.com

না? ঘুমের সুখে নাক ডাকত, স্বাস্থ্যটা ভালো হত-

(কলিন্স আসে ব্যস্ত হয়ে)

কলিন্স : Here you are Ramchunder! What's the news?

রামচন্দ্র : (আপন মনে) এই যে আমার স্বাস্থ্য! Sir, news খুব good sir, সব কিছুই yes।

কলিন্স : হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার plan-এ সবকিছু yes আছে। লেকিন আমার news-এ আছে এক big no.

রামচন্দ্র : No sir, কৃষ্ণবাবুর yes আর আপনার no-এর মধ্যে একটা relation আছে sir, ভালো relation.

কৃষ্ণদেব : বসুন আর্থার কলিন্স।

কলিন্স : No, আমি শান্তিতে বসতে পারি না। I have no peace of mind. আমি নির্মালাকে চাই, লেকিন পাইতে পারি না।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু একদিনে তো সব কাজ সফল হতে পারে না সাহেব। নির্মলাকে পেতে হলে চাই তিতুর ধ্বংস।

রামচন্দ্র : Yes sir, আর সে ধ্বংস yes yes করছে। সামনে শুধু ছোট্ট একটা no. আর কিছুদিন ...

কলিন্স : Stop you bluffer, আওর কিছুদিন বাদ কি হবে?

রামচন্দ্র : নির্মলাকে পাবেন sir.

কলিন্স : But I know, তোমরা তাহা চাও না।

কৃষ্ণদেব : আমরা তা চাই না সাহেব?

কলিন্স : No, আমি শুনিয়াছি নির্মালা আসিয়াছিল, লেকিন আপনি নির্মালাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণদেব : সে কি কথা সাহেব! কার কাছে শুনলেন?

(কৃষ্ণদেব ও রামচন্দ্র মুখ চাওয়াচাওয়ি করে)

রামচন্দ্র : সে কি কথা sir! যার জন্যে চোখের ঘুম বাদ দিয়ে ঘুরাফেরা করছি, তাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেব?

কৃষ্ণদেব : এ নিশ্চয়ই আপনার শোনা কথা?

কলিন্স : হ্যাঁ, আমি শুনিয়াছি।

(কৃষ্ণদেব সাহেবের দিকে চেয়ে থাকেন)

রামচন্দ্র : সাহেব answer- মানে উত্তর চায় কর্তা।

কৃষ্ণদেব : শোনা কথার প্রমাণ কি সাহেব?

রামচন্দ্র : Sir, এত বড় একটা plan নিয়ে কাজ করছি, চারদিকে কত

www.pathagar.com

enemy sir, ওদের রটানো কথায় আপনি বিশ্বাস করবেন sir?

কলিন্স : কেন বিশ্বাস করিব না? তোমাদের কাজে কোম্পানী আগাইয়া আসিল, কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট ভি আসিতেছে তিতুকে crush করিতে, but what about নির্মালা?

রামচন্দ্র : সাহেবের মনে অবিশ্বাস বড় strong কর্তা।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু এখন অবিশ্বাস মানে সবকিছু ভেস্তে যাওয়া।

(অদূরে ঘোড়ার পদ শব্দ)

রামচন্দ্র : Sir, কর্তা। ষ্টুয়ার্ট সাহেব বুঝি এলেন।

কলিন্স : Yes, that's a good news for you.

কৃষ্ণদেব : কিন্তু সাহেব, আপনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন। এ সময়ে দুশমণের চক্রান্তে পড়ে আমাদের সকলের সর্বনাশ করবেন না।

কলিন্স : এ-কথায় আপনি ঠিক থাকিবেন?

কৃষ্ণদেব : হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন। আমার কথার নড়চড় হবে না।

রামচন্দ্র : একেবারে right সাহেব। কৃষ্ণবাবু যা বলেন, তার কোনদিন নড়চড় হয় না।

কলিন্স : ঠিক আছে। আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করিলাম্।

(কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট আসে)

Here comes Col. Stuart.

ষ্টুয়ার্ট : Good afternoon my friends. You are ...

কলিন্স : I am Arthur Collins, army officer of an indigo planter.

ষ্টুয়ার্ট : Very glad to meet you Mr. Collins.

কলিন্স : He is Mr. Kishen Dev, our friend, and he is Ramchunder, Dewan of Gokna kuthi.

কৃষ্ণদেব : আমাদের পরম সৌভাগ্য, কর্ণেল সাহেব আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন।

রামচন্দ্র : কর্ণেল সাহেব আমাদের father-mother...

ষ্টুয়ার্ট : হ্যাঁ, দেখুন কিষেনদেব, আমার সাথে আছে একশ' আংরেজ সওয়ার, কিছু নেটিভ সিপয়, আওর দুইটি কামান। Any help from you?

রামচন্দ্র : সাহেব সাহায্যের কথা বলছেন কর্তা।

www.pathagar.com

কৃষ্ণদেব : সাহায্য? বলে দাও রামচন্দ্র, আমার সমস্ত লোক সাহেবের কথায় যুদ্ধ করবে।

রামচন্দ্র : Sir, কৃষ্ণবাবু বলছেন his men help করবে। আমরা fight করতে ready.

ষ্টুয়ার্ট : But আমাকে আওর জানিতে হবে, তিতু rebel আছে কি নাই।

রামচন্দ্র : What you tell সাহেব! তিতুমীর ইংরেজ তাড়িয়ে king হতে চায়। সে তো অনেকদিন ধরে burn houses, kill men, defeat English people.

ষ্টুয়ার্ট : A scoundrel, a rogue!

রামচন্দ্র : I sir?

ষ্টুয়ার্ট : No, Titu Mir.

রামচন্দ্র : Hundred times, sir, hundred times. তিতু নারকেলবেড়িয়া মে এক bamboo-stockade গড়ে তুলেছে।

ষ্টুয়ার্ট : What! Bamboo-stockade? Bamboo-stockade মে কেয়া ফায়দা হবে?

রামচন্দ্র : যুদ্ধের সময় এই বাম্বো-ষ্টকেড মে থাকবে আর কি!

ষ্টুয়ার্ট : আমি তিতু আওর তাহার party-কে দমন করিতে নারকেলবেড়িয়া মে যাইব! লেফটেনান্ট-গভর্ণর আমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমি আমাকে নারকেলবেড়িয়ার খবর দিতে পার না?

রামচন্দ্র : Yes sir, খুব পারি। পথ আমি চিনি। আমি সব পথ আপনাকে দেখিয়ে দেব sir.

ষ্টুয়ার্ট : হ্যাঁ দাওয়ানবাবু, তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পার?

রামচন্দ্র : ঘোড়ায়– হ্যাঁ পারি, মানে পারি যদি horse বেশী move না করে।

ষ্টুয়ার্ট : But how can it run without moving?

রামচন্দ্র : Yes sir, move মানে সামনের দিকে একটু slowly move করলে তেমন অসুবিধা হয় না। কিন্তু sir, এদিক–ওদিক যদি বেশী move করে, তাহলে ... আমার আবার gout আছে কিনা ... একটু অসুবিধা হয়।

www.pathagar.com

ষ্টুয়ার্ট : ঠিক আছে, আমার লোক তোমার সাথে থাকিবে।

রামচন্দ্র : তাহলে মানে একটু help করলে sir, পারি, ঘোড়ায় ভালই চড়তে পারি।

ষ্টুয়ার্ট : Yes, I guess that. ঘোড়া slowly যাবে। লেকিন ঘোড়া চি-হি-হি করিলে ভয়ে চীৎকার করিও না।

রামচন্দ্র : হেঃ হেঃ no sir ... yes sir ... হেঃ হেঃ ... কি বলব sir ... হুজুর আমাদের father mother sir.

(ষ্টুয়ার্ট ও কলিন্স চলে যায়)

আবহাওয়া খুব গরম কর্তা।

কৃষ্ণদেব : এই শেষ চেষ্টা রামচন্দ্র। যদি জয়ী হই –

(মনোহর রায় আসেন)

মনোহর : জয়ী আপনারা নিশ্চয়ই হবেন কৃষ্ণবাবু। কিন্তু সে জয় কি হিন্দুর হবে?

কৃষ্ণদেব : মনোহর রায়! হঠাৎ আপনি?

মনোহর : অসময়ে আসতে হল শুধু একটা কথা বলতে যে, ভুল সংশোধন করার সময় এখনও আছে কৃষ্ণবাবু। নিজের ভাইকে ধ্বংস করে নিজের অংগ হানি করা থেকে এখনও নিবৃত্ত হোন।

কৃষ্ণদেব : মনোহর রায় কি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন?

মনোহর : হ্যাঁ। দ্বিধা-সংশয় আমার কেটে গেছে কৃষ্ণবাবু। হিন্দু হলেও আমি এদেশবাসী। আর এ পরিচয়ে আমি গৌরবান্বিত। ঐ মন্দিরে মায়ের পূজো হচ্ছে। ভ্রাতৃনাশের সংকল্প মনে নিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াবেন কৃষ্ণবাবু?

কৃষ্ণদেব : ভ্রাতৃনাশের সংকল্প নয় মনোহর রায়, সংকল্প আমার ম্লেচ্ছহীন স্বাধীন দেশে মাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ মহান সংকল্প আমার অনড়, অটল।

মনোহর : এবার আমি আসি কৃষ্ণবাবু। জানি না আপনার এ সংকল্পে মায়ের চোখে জল এসেছে কিনা!

(চলে যান)

রামচন্দ্র : যতসব অকাজের বাধা। পথ চলতে পিছু ডাক।

কৃষ্ণদেব : দুর্বলের এ-ডাকে সাড়া দেবার অবসর আমার নেই রামচন্দ্র।

www.pathagar.com

তুমি বাকী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কর। রাতের আঁধারে ছেয়ে গেছে পৃথিবী। তিতুর ভাগ্যাকাশে যেন আর সূর্য হেসে না ওঠে।

(কৃষ্ণদেব সিঁড়ি ভেঙে ঘরে উঠতে যান। কিন্তু পা পিছলে সিঁড়ির উপরেই পড়ে যান তিনি। প্রাঙ্গণ তখন আঁধারে ঢাকা। রামচন্দ্র তাকে তাড়াতাড়ি তুলে ধরে)

রামচন্দ্র ঃ পায়ে আঘাত লেগেছে কর্তা?

কৃষ্ণদেব ঃ আঘাত? না, তেমন কিছু নয়। মায়ের মন্দিরে পূজো হচ্ছে রামচন্দ্র!

রামচন্দ্র ঃ আজ্ঞে কর্তা।

কৃষ্ণদেব ঃ মনোহর রায় যেন কি বলে গেল রামচন্দ্র? মায়ের চোখে জল? প্রণাম করতে গিয়ে আমি কি মায়ের হাসি দেখতে পাব না? ... আমাকে ধরে নিয়ে চল রামচন্দ্র। অন্ধকারে চলতে আমার ভয় করছে।

(অদূরে মন্দিরে বাদ্যধ্বনি। রামচন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়ে কৃষ্ণদেব পা বাড়ান। গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে প্রাঙ্গণে)

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মাসুমের বাড়ী। শেষ রাত। পর পর বন্দুকের আওয়াজে রাতের মৌনতা যেন ভেঙে যায়। মাসুম বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। পিছনে আসে সাহানা।]

সাহানা : না না, আমার মন বলছে, আজ যেতে নেই ওখানে।

মাসুম : সাহানা! নারকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লায় রয়েছেন মীর সাহেব। তাঁরও সংসার ছিল, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের পরিবার ছিল। তবুও আজ সব ছেড়ে তিনি ওখানে। আজ ওখানে জমায়েত হওয়ারই প্রয়োজন। তুমি আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও। আরও কত লোকজন সেখানে রয়েছে। আমি তাদের মনোনীত চালক।

সাহানা : তোমাকে যেতে আমি বাধা দেব না। তোমার কথা শুনলে সে-শক্তি আমি হারিয়ে ফেলি। তোমার আদর্শের ধারায় আমার শত মুহূর্তের মনের আশা কোথায় যেন ভেসে যায়। তুমি যেয়ো। কিন্তু আজ নয়, কাল।

মাসুম : আজকের রাতও শেষ হয়ে এসেছে। এখনই শুনব ভোরের আযান। কাল তো এসেই গেল।

সাহানা : আরও একটা দিন তুমি ঘরে থেকে যাও।

মাসুম : প্রিয়ার আবেদন প্রয়োজনের বধির কানে এতটুকুও পৌঁছায় না সাহানা। কর্তব্য বড় নির্মম।

সাহানা : তবু তোমাকে আমি আজ যেতে দেব না। রাতে দেখেছি দুঃস্বপ্ন। হয়তো ...

মাসুম : হয়তো দিয়ে আমাকে আটকে রেখো না সাহানা। তোমার মনের শঙ্কা দুঃস্বপ্নে রূপ নিয়েছে। ওটা নিছক কল্পনা। আমাকে যেতে দাও।

সাহানা : না। দেখছ না, আজকের চাঁদ মেঘে ঢাকা। সমস্ত পৃথিবী কেমন আঁধারে মলিন।

মাসুম : কিন্তু একটু পরেই সূর্য উঠবে হেসে। আঁধার যাবে কেটে। তুমি কোমলপ্রাণা নারী। চাঁদনী রাতের মেঘ দেখে তাই তোমার বুক কেঁপে ওঠে।

সাহানা : তুমি চিরদিন আমার কথা মনের খেয়াল বলে এমনি উড়িয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছ। আমি তোমার স্ত্রী। দেশই তোমার সব? আমি কেউ নই?

মাসুম : ভুল বুঝো না সাহানা। তোমার আমার পূর্ণ মিলনের জন্য, রাহেলিল্লায় হাতে হাত রেখে চলার জন্যই আজ এই সংগ্রামের প্রয়োজন। একটু আগেই জালেম শক্তির আস্ফালন শোনা গেল। সময়ে সাবধান না হলে আমাদের ছোট্ট আয়োজন হয়তো ভেঙে যাবে। তাই আজ পিছনে না টেনে তুমি আমাকে সুমুখ পানে এগিয়ে দাও।

সাহানা : এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর?

মাসুম : হ্যাঁ, নির্মম হলেও এই-ই আমার উত্তর সাহানা। নারী জীবনের সবটুকু পাওয়া দিয়ে তোমাকে সুখী করতে পারি নি, এ আমি জানি। আজ যা হয় নি, তা-ই যাতে কাল হতে পারে, তারই জন্য আমাদের এ আপাত কষ্টের প্রয়োজন সাহানা।

সাহানা : কিন্তু যেদিন সে শান্তি আসবে, সেদিন যদি তুমি আমি না থাকি?

মাসুম : আমরা যদি না-ও থাকি, তবু কোটি কোটি মানুষ চলবে সেই আনন্দোজ্জ্বল পথে। সেদিন তুমি আমি কথা কইব তাদের মন থেকে!

(সাহানা কেঁদে ওঠে)

অবুঝ হয়ো না সাহানা। কোম্পানীর ফৌজ হয়তো আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। মীর সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কত কাজ আমাদের বাকী। আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও।

সাহানা : আদর্শের প্রেরণা যে মনের কান্নায় করুণ হয়ে ওঠে! তোমার কথা বুদ্ধি দিয়ে বরাবরই আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু মন আমার কিছুতেই তা মানতে চায় নি।

মাসুম : সাহানা! ভুলে যেয়ো না, মদিনায় নবীজির সংগ্রামে সেই অগ্নিঝরা দিনগুলিতে তোমরা মেয়েরাও যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির থেকেছ। আমার হাতে, তোমার ভা'য়ের হাতে, ছেলের হাতে তুলে দিয়েছ শানিত তলোয়ার। ভুলে যেয়ো না সাহানা, তোমরাও একদিন যুদ্ধ করেছ জালেমের বিরুদ্ধে। ঘরের সুখ বিসর্জন দিয়ে শিবিরে শিবিরে করে বেড়িয়েছ আহতের সেবা।

সাহানা : অমন করে আর বলো না। তোমারই জয় হোক। তোমাকে আটকে রাখব না। আমার সুখের জন্যে তোমাকে অসুখী করতে

www.pathagar.com

আমি চাই না। তুমি কর্তব্য করে ফিরে এস। আমি আর কাঁদব না।

মাসুম : আমি জানি, চোখের পানি মুছে তুমি আমাকে এগিয়ে দেবে। দুঃখ আমারও কম নয় সাহানা। কিন্তু কর্তব্যের ডাকে সাড়া দেওয়াও তো আমার উচিত।

সাহানা : যদি বিপদ আসে ভয় পেয়ো না। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো। আর ...

(দূরে বন্দুকের আওয়াজ হয়)

মাসুম : সাহানা। কোম্পানীর ফৌজ হয়তো এসে পড়েছে। আমি যাই।

(সাহানার যেন সম্বিত ফিরে আসে)

সাহানা : এ্যাঁ!

মাসুম : আমি যাই। মীর সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার সৈন্যেরা ভয় পাবে।

সাহানা : কোম্পানীর ফৌজ এসেছে?

(দূরে বিউগিল বাজে)

মাসুম : সাহানা!

সাহানা : ফিরে এস।

মাসুম : সাহানা! ভয় নেই, আল্লাহ্ আছেন। আমি ফিরে আসব। তুমি পথ চেয়ে থাকো। আল্লাহ্‌র কাছে বল, আমাদের আশা যেন পূর্ণ হয়। দেশের সকলের মত আমাদের ঘরেও যেন শান্তি-সুখ ফিরে আসে।

(সাহানা শুধু চেয়ে থাকে)

আমি জয় করে ফিরে আসব। জয়ের মালা তুমি গেঁথে রাখ সাহানা। আমি এসে গলায় পরব।

(মাসুম চলে যায়। সাহানা কেঁদে ওঠে)

সাহানা : নসিবন।নসিবন!

(নসিবন আসে)

নসিবন : বিবি সাহেবা!

সাহানা : দেখ নসিবন, উনি চলে যাচ্ছেন!

নসিবন : বিবি সাহেবা! তিনি পুরুষ, তিনি বীর। চিরকাল ওঁরা এমনি করেই চলে যান। এই ওঁদের কর্তব্য।

সাহানা : কর্তব্য! কর্তব্যের প্রবাহে মানুষের আশা ভেসে যায়, আবেদন

www.pathagar.com

তলিয়ে যায়, সুখ-নীড়ের কোন চিহ্ন থাকে না।

(নির্মলা আসে)

নির্মলা : কি গো মা মণি। দুর্যোগে খুব ভয় করে – না?

সাহানা : যে কথা সহজে বুঝতে পারি, তাকে অন্তরে উপলব্ধি করতে বড় কষ্ট হয়।

নির্মলা : তা-ই তো স্বাভাবিক মা। ভগবান নারীর মনকে এত কোমল উপাদানে গড়ে দিয়েছেন, যা কঠোর কর্তব্যের এতটুকু ছোঁয়াতেই শিওরে ওঠে।

সাহানা : কিন্তু আপনি এসময়ে?

নির্মলা : অসময়ের বালাই আমার মুছে গেছে মা। রাত আজও তেমনি ঘুম নিয়ে আসে সত্য, কিন্তু যখনি ঘুমুতে চাই, কান পেতে শুনি চারদিকে মানুষের আর্তনাদ আর দানবের অট্টহাসি। ঘুম কোথায় পালিয়ে যায়।

সাহানা : আপনি একা এসেছেন?

নির্মলা : না মা, একা নয়। আজ আকাশে ঝড়ো মেঘ। প্রকৃতি জেগেছে। মানুষও সবাই ঘুমিয়ে নেই। কেউ পথ চলছে ধ্বংসের নেশায়, কেউ চলছে বাঁচার আশায়। সংগে এসেছে ভৈরব রায়। আমরা যাচ্ছি মনোহর রায়ের কাছে।

সাহানা : মনোহর রায়ের কাছে কেন?

নির্মলা : অনেক আগেই হয়তো লগ্ন এসে গেছে মা। আজ ঘুমুবার সময় নেই। এর সংগে আমার মনের প্রশ্নও জড়িত মা। শুনেছি, মনোহর রায় মনস্থির করেছেন। হয়তো বাড়ী পর্যন্ত যেতে হবে না। পথেই তাঁর সাক্ষাৎ পাব।

সাহানা : এমনি ঘর আর জনহারাদের জীবনে কি আর সুখ-শান্তি ফিরে আসবে না?

নির্মলা : হয়তো আসবে। আর সীমাবদ্ধ ঘর আর জন হারিয়েই তো মানুষ অসীম ঘরে অসংখ্য আপনের সন্ধান পায় মা। আমি আসি। ভৈরব রায় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আত্মসুখের কথা মন থেকে সরিয়ে স্বামীর কথা ভেবে দেখ মা, মনে শান্তি পাবে। গৌরবে বুক ভরে উঠবে। আসি মা।

(চলে যায়)

নসিবন : বিবি সাহেবা! ঘরে চলুন।

www.pathagar.com

সাহানা ঃ না নসিবন, শূন্য ঘরে মন আমার আরও হাহাকার করে উঠবে।

নসিবন ঃ বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়াই তো সকলের উচিত।

সাহানা ঃ তাই করব নসিবন, বাস্তবকে অস্বীকার করে অপমান আর করব না। কিন্তু আমার সকল আশা, সকল কামনা–

(কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে)

না না, আমি কাঁদব না। ফুল তুলে আন্ নসিবন। মালা গেঁথে রাখি, জয়ের মালা।

(ঘরে যেতে চায়। হাসতে হাসতে মদোন্মত্ত কলিন্স আসে)

কলিন্স ঃ Ha Ha Ha — লেকিন মালা কৌন্ গলায় পরিবে? You lady !

(সাহানা ঘরের দরজায় ফিরে দাঁড়ায়)

আমি আর্থার কলিন্স আছি।

নসিবন ঃ সাহেব, ঘরে কেউ নেই। তুমি চলে যাও।

কলিন্স ঃ No. আমি চলিয়া যাইব না। (চঞ্চল হয়ে ওঠে) নির্মালা কোথায় আছে?

নসিবন ঃ নির্মলা এখানে নেই। তুমি চলে যাও।

কলিন্স ঃ (রুক্ষ কণ্ঠে) No.

(এগিয়ে যায়)

আমি জানি, নির্মলা এখানে আছে। আমি আজ একাজের শেষ করিতে চাই।

সাহানা ঃ নসিবন! সাহেবকে বল, মাতলামি করার জায়গা এটা নয়। নির্মলা এখানে নেই।

কলিন্স ঃ নির্মলা না থাকিবে, লেকিন তুমি আছ।

নসিবন ঃ সাহেব।

কলিন্স ঃ আমি তোমাকে নিয়া যাইব। আমি প্রতিশোধ চাই!

সাহানা ঃ নসিবন! আমদের রামদাঁটা ...

নসিবন ঃ কোন ভয় নেই বিবি সাহেবা। আল্লাহ্ আছেন। অস্ত্রহাতে আমিও আসছি।

(দ্রুত পায় চলে যায় নসিবন। হাসতে হাসতে সাহেব আরও এগিয়ে আসে। এমন সময় ভৈরব রায় আসে পিস্তল হাতে। নসিবন একহাতে রামদা, অন্যহাতে বল্লম নিয়ে এগিয়ে আসে। সাহানা রামদা হাতে নিয়ে দাঁড়ায়)

www.pathagar.com

ভৈরব : পিছনে চেয়ে দেখ সাহেব, এবার আমার হাতেও পিস্তল আছে।

কলিন্স : What ? Oh, you are here also ?

ভৈরব : আপনারা ঘরে যান মা।

(সাহানা ও নসিবন ঘরে যেতে পা বাড়ায়)

হ্যাঁ সাহেব, পথে দেখলাম মত্ত পশুর মতই তুমি এগিয়ে আসছ। উদ্দেশ্য বুঝতে দেরী হল না। তাই ফিরে এলাম। যাবে, না কিছু একটা করবে এখানে?

(হাসতে হাসতে মিসকিন শাহ্ আসেন)

মিসকিন : হাঃ হাঃ হাঃ – কিছু করবে না ভৈরব, সাহেব এখানে কিছু করবে না। ও মদের ঝোঁকে এসে গেছে। কিন্তু দেখ, সে নেশা কেটে গেছে তার। সব বুঝতে পেরেছে, সব বুঝেছে। স্বাধীন দেশের মানুষ। সব হারালেও কিছুটা মনুষ্যত্ব বজায় থাকে। সাহেব এর উত্তর দেবে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাই না সাহেব?

কলিন্স : হাঁ — I shall meet you there. Good-bye my friends, good-bye.

(কলিন্স চলে যায়)

সাহানা : শাহ্ সাহেবকে বসতে দে' নসিবন।

মিসকিন : লাগবে না বেটি, লাগবে না। একা ঘরে রয়েছ। তাই এলাম। আল্লাহ্ হক। কোন ভয় নেই মা। আমরা একটু ঘুরে আসি। চল ভৈরব রায়। আসি মা। আমি আবার আসব। আল্লাহ্‌কে ডাক। আল্লাহ্ হক।

(ভৈরব রায়ের সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে যান। সাহানা ও নসিবন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে)

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক
দ্বিতীয় দৃশ্য

[জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। তখনো রাতের আঁধার সম্পূর্ণ কেটে যায় নি। হাঁপাতে হাঁপাতে আসে রামচন্দ্র]

রামচন্দ্র : আর পারি না বাবা! Gout-এর কোমর আমার হাঁটতে হাঁটতে gone. সারারাত কেটেছে চোরের মত। এবার আবার কোন্ কাজ পড়ে, কে জানে!

(দূরে বন্দুকের আওয়াজ। রামচন্দ্র বুক চেপে ধরে)

ওরে মন, ভয় পাস্‌নে। কোন ভয় নেই। ও কিছু না, আওয়াজ, মাত্র বন্দুকের আওয়াজ। কিন্তু মন, কে যেন আবার আসছে!

(ভয়ে গাছের আড়াল হয়। মাসুম ও ভৈরব আসে)

ভৈরব : ওরা এমন বন্দুকের আওয়াজ করছে কেন?

মাসুম : গ্রামবাসী ও আমাদের লোকজনকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেও হতে পারে। আমাদের গ্রাম ঘুরে লোকজন নিয়ে যেতে হবে। আসুন।

(চলে যায়। রামচন্দ্র আবার পথে এসে দাঁড়ায়)

রামচন্দ্র : যাক, গেছে তাহলে। কি কাজে লেগেছি, ভয় পেয়ে পেয়েই life-টা গেল।

(বন্দুকের আওয়াজ হয় আরও কাছে। চমকে ওঠে রামচন্দ্র)

Mother কালী! এবার কারা এল মা?

(ভয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছে না। বাইরে থেকে ডাকে কৃষ্ণদেব রায়)

কৃষ্ণদেব : (নেপথ্যে) তুমি কোথায় রামচন্দ্র?

রামচন্দ্র : আজ্ঞে কর্তা, এই তো আমি এখানে। আসছি sir, আসছি। সব খবর জেনে এসেছি।

(দ্রুত চলে যেতে চায়। তখনই ষ্টুয়ার্ট ও কৃষ্ণদেব আসে)

এই যে sir, সব কিছু ঠিকঠাক। আমাদের শুধু গেলেই হল।

ষ্টুয়ার্ট : Yes, then march on. বাঁশের কেল্লায় নিয়া চল।

রামচন্দ্র : Come sir, this way- হাঃ হাঃ ... তিতুমীর! প্রস্তুত হও।

কৃষ্ণদেব : কিন্তু সাহেব, একটা কথা।

ষ্টুয়ার্ট : কথা?

www.pathagar.com

কৃষ্ণদেব : তিতুর বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করতে তোমরা যাচ্ছ। কিন্তু ওখানকার সকলেই বিদ্রোহী নয়। আমার লোকও আছে। তারা কোম্পানীর পরম ভক্ত। তাদের বাঁচাতে হবে।

রামচন্দ্র : Sir, he says যে তার men আছে ওখানে। তারা আপনাদের enemy নয়। তিনি চান –

ষ্টুয়ার্ট : ঠিক আছে। তাহাদের চিনাইয়া দিবে। I'll let them go.

রামচন্দ্র : সব ঠিক আছে কর্তা। আপনি শুধু তাদের চিনাইয়া দিবেন। আর সংগে সংগে থাকবেন।

কৃষ্ণদেব : বেশ, আমি সংগে সংগে থাকব।

(ওরা চলে যায়)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সম্মুখ ভাগ। দরজায় তিতুমীর ধ্যানমগ্ন। সূর্য তখনো মেঘে ঢাকা। ষ্টুয়ার্ট, কৃষ্ণদেব ও রামচন্দ্র আসে।]

রামচন্দ্র : ওই যে sir সেই বাঁশের কেল্লা, the বাম্বু-stockade.

ষ্টুয়ার্ট : Is it? দরজায় কে বসিয়া আছে?

রামচন্দ্র : He is তিতুমীর sir.

ষ্টুয়ার্ট : Titu Mir! লেকিন তাহাকে তো বিদ্রোহী মনে হয় না।

রামচন্দ্র : But এই সেই বিদ্রোহী তিতুমীর sir. সে নিজেকে বলে king of the country. Today you come with কামান, বন্দুক। তাই দেখাচ্ছে যে সে সাধু। ওটা কিছু নয়, সামান্য অভিনয়– এ্যাক্‌টিং, এ্যাক্‌টিং।

ষ্টুয়ার্ট : I see, a clever man indeed! রামচন্দ্র, তুমি বলিয়া দাও – আমি কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট। লর্ড বেন্টিঙ্ক আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি জানতে চাই, তাহারা সারেন্ডার করিবে কি না।

(আদেশনামা তরবারিতে বিদ্ধ করে এগিয়ে ধরে)

কৃষ্ণদেব : (চুপি চুপি) রামচন্দ্র। সব কিছু উল্টো বোঝাবে। এই সুযোগ।

রামচন্দ্র : (চুপ চুপি) আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

www.pathagar.com

(তিতুমীরের কাছে গিয়ে বলে)

বলি, ও মীর সাহেব! ধ্যানটা ভাঙুন না একটু। এসেছে, আপনার ধ্যানের ধন সামনে এসেছে। নিমীলিত আঁখি দু'টো খুলে একবার দেখুন। মীর সাহেব, ও মীর সাহেব!

(তিতুমীর আস্তে আস্তে চোখ খোলেন)

তিতুমীর : কে? ও– আপনারা? কেন?

রামচন্দ্র : এলাম দেখে শুনে যেতে। আপনারা বাঁশের কেল্লা মানে বাম্বু-stockade বানিয়েছেন, অবাক কান্ড কিনা। তাই দেখতে এসেছি। খুব মজবুত করে তোয়ের করেছেন তো?

তিতুমীর : মুসলমানের ঈমানের ঘর মজবুতই থাকে। হ্যাঁ, আপনাদের আর কোন প্রয়োজন আছে?

রামচন্দ্র : সামান্য একটু। এই সাহেব, মানে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট, তিনি বলছেন যে আপনি কোম্পানীর সংগে যুদ্ধ করেছেন। তাই এখন আবার যুদ্ধে অগ্রসর হোন। জপমালা রেখে, মালকোঁচা মেরে, তলোয়ার ধরুন। তলোয়ার দেখিয়ে সাহেব তাই বলছেন। আরে ও মীর সাহেব, ভয় কি? হাজার হোক, আপনারা রাজার জাত তো।

তিতুমীর : কর্ণেল সাহেব যদি একথাই বলে থাকেন, তাহলে তিনি ভুল বলেছেন। আমি কোম্পানীর সংগে যুদ্ধ করি নি। তবে হ্যাঁ, পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের জন্য কোম্পানীর সাথে যুদ্ধ করবার সংকল্প আমার ছিল না, একথা বলতে চাই না। আমি চেয়েছিলাম আমার দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ করতে। তাতে আমাদের উপর যে অহেতুক জুলুম করা হয়েছে, আমার দল তা সহ্য করতে না পেরে একটু উত্তর দিয়েছে মাত্র। কিন্তু আজ –

রামচন্দ্র : আজ ভয় কি? আজও উত্তর দিন, কিঞ্চিৎ – সামান্য উত্তর।

তিতুমীর : (মৃদু হেসে) রামবাবু! আপনাদের আমরা চিনি। পলাশী প্রান্তরেই পেয়েছি খাঁটি পরিচয়]

রামচন্দ্র : (ষ্টুয়ার্টকে) Sir, he says Palashi ! (তিতুমীরকে) আমাদের উপর মিছিমিছি ক্ষেপে যাচ্ছেন মীর সাহেব। আমরা আপনাদের হিতৈষী।

ষ্টুয়ার্ট : সে কি বলিতেছে?

রামচন্দ্র : বলিতেছে যে he will fight. আরও বলিতেছে, he is

www.pathagar.com

king আর কোম্পানী none.

ষ্টুয়ার্ট : Ha Ha Ha ... O. K. Come on Ramchunder.

(মাসুম ও ভৈরব আসে কেল্লার সামনে)

মাসুম : জনাব!

তিতুমীর : মাসুম ! ভৈরব রায়! এসেছ বাবা! প্রস্তুত হও। সময় এসেছে।

রামচন্দ্র : হ্যাঁ হ্যাঁ মাসুম সাহেব, কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিন।

ভৈরব : চুপ কর বর্বর গোলাম।

তিতুমীর : ভৈরব রায়!

মাসুম : এর উত্তর পাবে, এখনই।

(ষ্টুয়ার্ট, কৃষ্ণদেব ও রামচন্দ্র চলে যায়, অন্যান্য লোকজন আসে)

তিতুমীর : ভাইসব! আমরা আজ কামানের মুখে দাঁড়িয়ে। তবু আমরা ভয় করি না। ভুলে যেয়ো না, মুষ্টিমেয় ফৌজ-এ-এলাহি একদিন যুদ্ধ করেছেন বিপুল রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। পরাস্ত করেছেন তারা পারস্যের অজেয় বাহিনীকে। আজ প্রাণের ভয়ে আমরা কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করবো এই বিদেশী বেনিয়ার হাতে?

সকলে : না না, কিছুতেই না।

তিতুমীর : আমাদের কামান নেই; কিন্তু আছে ঈমান। চল, সবাই আমরা হাসিমুখে আল্লা'র নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি এই এই সমরাঙ্গনে।

(বাইরে ইংরেজের কামান গর্জে ওঠে)

মাসুম : নারায়ে তকবীর।

সকলে : আল্লাহ আকবর।

(অন্ধকার। কামান গর্জন, বন্দুকের আওয়াজ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কেল্লার সম্মুখ ভাগ। মাসুম ও কলিন্স আসে দু'দিক থেকে)

কলিন্স : This is the time Masoom.

মাসুম : আমিও প্রস্তুত কলিন্স।

(দু'জনের তরবারি ঝলসে ওঠে)

কলিন্স : You challenged me. I want the revenge.

মাসুম : মা-বোনের অপমান তোমার রক্তে আজ ধুয়ে দেব সাহেব।

(ওরা যুদ্ধের নেশায় মেতে উঠে বেরিয়ে যায়। অন্ধকারে শোনা যায় তিতুর গলা)

তিতুমীর : মাসুম! ভৈরব রায়! ভয় পেয়ো না। সামনে, সামনে চল। ওই,

www.pathagar.com

ওখানে রয়েছে বিধর্মী ইংরেজ। পাশে তার গোলাম কৃষ্ণদেব আর রামচন্দ্র।

(শেখজী দৌড়ে আসে)

শেখজী : জনাব! মাসুম বিপন্ন।

তিতুমীর : এ্যাঁ! না না, ওই দেখ মাসুমের তলোয়ার আমূল বিদ্ধ হয়েছে কলিঙ্গের বুকে। চল – আ–

(তিতুমীরের বুকে গুলী লাগে। পড়ে যান তিনি)

শেখজী : জনাব!

(মাসুম দৌড়ে আসে)

মাসুম : জনাব!

শেখজী : গুলী লেগেছে বুকে।

তিতুমীর : না না মাসুম, আমার পাশে নয়, ওখানে আমার ভা'য়েরা যুদ্ধ করছে ... ও! মাসুম, শেখজী!

(অদূরে রামচন্দ্রের হাসি)

ভৈরব রায় কোথায়?

মাসুম : ভৈরব রায় আহত।

ষ্টুয়ার্ট : (নেপথ্যে) Stop firing. The leader is wounded.

(ক্রমে কোলাহল কমে আসে। আলো ফুটে ওঠে। দেখা যায় বাঁশের কেল্লা ভেঙে গেছে। মনোহর রায় আসে)

মনোহর : মীর সাহেব! আমার আসতে বড় দেরী হয়ে গেল।

তিতুমীর : এসেছেন, এও তো কম কথা নয়। সময় পড়ে আছে, অনন্ত সময়।

মনোহর : আমাকে এখ্খুনি ফিরে যেতে হবে। আমি সেভাবেই তোয়ের হব। আপনি দোয়া করুন।

তিতুমীর : আমার দোয়া রইল ভাই। দেশ রইল, আমাদের মা-বোনেরা রইল।

(মনোহর রায় নীরবে চলে যায়)

দুঃখ করো না মাসুম। শেখজী, আমার যাবার সময় এসেছে। আমিযাচ্ছি।

(মিসকিন শাহ্ আসেন)

মিসকিন : তিতুমীর!

তিতুমীর : কে? ও– মিস্‌কিন শাহ্! এসেছেন দরবেশ? আমি যাচ্ছি।

www.pathagar.com

(মিস্‌কিন শাহ্‌ তিতুমীরের মাথা কোলে নিয়ে বসেন)

দোয়া করুন – যেন আল্লাহ্‌র রহমত আর রসূলের শাফায়াত পাই। আমার ভাইদের জন্যে দোয়া করুন। দরবেশ! আমার আশা? স্বপ্ন কি আমার কোনদিন বাস্তবে রূপ নেবে না?

মিসকিন : নেবে তিতুমীর, নেবে। যে জন্মভূমির জন্যে সিরাজ, মীর কাসিম, টিপু সুলতান প্রাণ দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন মজনু শাহ্‌ আর হাজার হাজার মানুষ, প্রাণ দিলে তুমি, সেই জন্মভূমি আবার আমাদের হবে।

তিতুমীর : হবে, হবে! আহ্‌ ... আল্লাহ্‌, নূরের রোশনীতে আমাকে পথ দেখাও।

মিসকিন : (আপন মনে) আল্লাহ্‌ হক।

(রামচন্দ্র ও ষ্টুয়ার্ট আসে)

মাসুম : জনাব!

রামচন্দ্র : আর দুঃখ করে কি হবে! ভগবানের লীলা বোঝে কার সাধ্য! আপনাদের arrest করার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

মাসুম : চুপ শয়তান! গোলামের কণ্ঠস্বর যেন শহীদের কানে না পৌঁছায়।

তিতুমীর : দরবেশ! শোনাও আমাকে তৌহিদের বাণী। পথ চলতে যেন ভুল না করি। শোনাও – শোনাও ... আল্লাহ!

মাসুম
শেখজী : ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।
মিসকিন

ষ্টুয়ার্ট : Honour him, honour the dead leader my men. Play the band in sad tune. A man, a patriot dies.

(শোকবাদ্য বেজে ওঠে। ষ্টুয়ার্ট নিজের টুপি খুলে অভিবাদন জানায়। মিসকিন শাহ্‌ স্মিতমুখে আত্মমগ্ন। মুখে তাঁর যিকির – আল্লাহ্‌ হক, আল্লাহ্‌ হক)

যবনিকা

www.pathagar.com

১৯৭০-এ প্রতিষ্ঠিত 'নাট্য একাডেমী'তে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনারত আসকার ইবনে শাইখ

www.pathagar.com

একটি পুরনো বাক্স

শরীফ সাহেব বুড়োই হয়েছেন বলতে হবে; এই উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালে বয়স তাঁর ষাটের কিছু বেশি। সরকারী চাকরি করতেন, হেল্‌থ্ এ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি। ছেড়ে দিয়েছেন প্রায় বার বছর আগে, রিটায়ার করার সময় বেশ কিছু বাকি থাকতেই – তেমন কোন কারণ ছাড়াই। শরীফ সাহেবকে খেয়ালী লোক বলেই জানে সবাই।

শরীফ সাহেবরা ঠিক ঢাকাইয়া নন, তবে পিতার সময় থেকেই তাঁরা ঢাকা শহরেরই বাসিন্দা। লালবাগের পৈত্রিক ভিটায় হাফ দালান, টিনের ঘর ইত্যাদি নিয়ে দশ কাঠার মত জায়গা। খালি জায়গাও রয়েছে খানিকটা; তা ঠিক বাগান নয়, বলা যায়– একটা বড় পুরনো বকুল গাছকে ঘিরে সবুজের একটা চত্বর। চত্বরের কিনারা দিয়ে এখানে-ওখানে মৌসুমী ফুলের অস্তিত্ব সারা বছরই থাকে। প্রায় তিরিশ বছর আগেও শরীফ সাহেবদের বাড়ী থেকে দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত বুড়ীগঙ্গার শাখা নদীটাকে দেখা যেত। এখন চর পড়ে ভরাট স্থানটার সবটাতেই নানা ধরনের সাধারণ বাড়ীঘর উঠেছে, শাখা নদীটাকে আর দেখা যায় না। এ বাড়ীতেই শরীফ সাহেব সপরিবার বসবাস করেন; বাড়ীর একটা অংশে থাকে ভাড়াটেরা।

শরীফ সাহেব চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন বড় মেয়ে হাসিনার মৃত্যুর পর-পরই। বলতে গেলে হাসিনা ছিল শরীফ সাহেবের প্রাণ। তিন ছেলে তিন মেয়ের মধ্যে হাসিনাকেই তিনি একান্ত আপন মনে করতেন। এই হাসিনার মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা বিশেষ ধরনের 'রোজগার' করতে আরম্ভ করলেন শরীফ সাহেব যা তাঁর পরিবারের কারুরই পছন্দ ছিল না। কিন্তু শরীফ সাহেব কারুর কথাই কানে তুললেন না, মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে নতুন 'রোজগার' করে যেতে লাগলেন। নতুন 'রোজগার'টা আর কিছুই নয় – শরীফ সাহেব নিজের হাতে নাশ্‌তা তৈরী করে তা হাসপাতালের রোগীদের জন্য নিয়মিত সময়ে নিয়মিতভাবেই বিক্রি করতে লাগলেন হাসপাতালেরই গেটে বসে। ওই ঢাকা হাসপাতালেই মারা গিয়েছিল তাঁর প্রিয় কন্যা হাসিনা।

শরীফ সাহেব নাশ্‌তার বাক্সটা তৈরী করিয়েছিলেন খুব যত্ন আর পরিকল্পনা করেই। চৌকোণা নাশ্‌তার বাক্স; ভাল কাঠের ফ্রেমে কাঁচ বসানো। ভেতরকার থরে থরে সাজানো নাশ্‌তা সবই স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু ঢাকনা উঠিয়ে নাশ্‌তা বের করবার সময় বাইরের ধূলাবালি মশামাছি কিছুই ঢুকতে পারে না; এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

তিনি খুবই সতর্ক থাকেন। এই ক'বছরের মধ্যে খদ্দেররা জেনে গেছে – শরীফ ফেরীওয়ালার নাশ্‌তা যেমন সুস্বাদু, তেমনি ভেজালমুক্ত। খাঁটিত্বই তাঁর নাশ্‌তার বিশেষত্ব। শরীফ সাহেবকে এখন ফেরীওয়ালা বলেই জানে সবাই।

বিকালে আপনজনেরা তাদের রোগীদের দেখতে আসে যখন, তখনই শরীফ সাহেব তাঁর নাশ্‌তার বাক্স নিয়ে বসেন হাসপাতাল-গেটের নির্দিষ্ট জায়গাটায়। খদ্দেররা এসে ভীড় করে, যথাসময়ে প্রায় সব নাশ্‌তাই তাঁর বিক্রি হয়ে যায়। তারপর খালি বাক্সটাকে খুব সাবধানে ধরে কোলের কাছটায় নিয়ে বাড়ীতে ফেরার জন্য রিক্‌শায় ওঠেন শরীফ সাহেব। বাড়ী গিয়ে বাক্সটাকে সযত্নে পরিষ্কার করে যথাস্থানে রাখেন; পরের দিনের নাশ্‌তার আয়োজনে লেগে যান। একাজে তাঁর সহকারিণী তাঁর স্ত্রী ফাতেমা, যাকে তিনি 'মিনুর আম্মা' বলেই ডাকেন। ছোট মেয়ে তাহ্‌মিনার ডাকনাম মিনু। অনেক দিনের এই বাক্সটা যে স্বামীর কতটুকু আপন তা জানেন শুধু ওই মিনুর আম্মাই! বাক্সটা পুরনো, কিন্তু চিরনতুন – অন্তত এই খেয়ালী ফেরীওয়ালার সহকারিণীর কাছে!

এলাকার পরিচিত জনেরা উপার্জনক্ষম ছেলেরা থাকতেও শরীফ সাহেবের এহেন কাজের জন্য অবাক হয়! শরীফ সাহেবের মত ভদ্রলোকের পক্ষে এই ফেরীওয়ালার কাজ করা কি উচিত? গ্লানিভরা মনে এই প্রশ্নটা ছেলেমেয়েদের মনকে সর্বদাই খোঁচা দিয়ে যায়। কিন্তু শরীফ সাহেবের তাতে কোন ভাবান্তরই হয় না। নীরবেই তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যান। মিনুর আম্মা হয়তো এমনটি করার কারণ কিছুটা আঁচ করতেও পারেন; তবে তারও মনে যে এর জন্য কোন ক্ষোভই নেই – এমনটি বলা যায় না। যাক, শরীফ সাহেবের এই পুরনো বাক্সটির এ নাট্য-কাহিনীর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ঃ শরীফ সাহেব, মিনুর আম্মা, এক বুড়ো ভদ্রলোক, হাসপাতালের খদ্দের ও ওয়ার্ডবয়েরা, রিকশাওয়ালা, শরীফ সাহেবের বড় ছেলে ফজল, ছোট ছেলে শাকের, ছোট মেয়ে তাহ্‌মিনা, এক তরুণ আনযুম, মসজিদের মুয়ায্‌যিন, এবং শরীফ সাহেবের বড় মেয়ে (মৃত) হাসিনার কিশোর ছেলে মন্টু।

www.pathagar.com

※

(সেদিনও শরীফ সাহেব যথারীতি হাসপাতালের গেটে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসে নাশ্‌তা বিক্রি করছিলেন। তাঁকে প্রায় ঘিরে দাঁড়িয়ে নাশ্‌তা নেয়ার অপেক্ষায় বিভিন্ন খরিদ্দার ও হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়েরা। একজনের পর একজনকে নাশ্‌তা দিয়ে যাচ্ছেন শরীফ ফেরীওয়ালা)

১ম খদ্দের ঃ আমার নাশ্‌তাটা একটু তাড়াতাড়ি দেন। একটু পরেই হাসপাতালের রোগী দেখার টাইম শেষ অইবো, বন্ধ করব গেইট।

শরীফ ঃ (নাশ্‌তা দিয়ে) এই নেন। রোগী দেখার টাইম ছ'টা পর্যন্ত। দেরী আছে।

(১ম খদ্দের নাশ্‌তা নিয়ে চলে যায়)

২য় খদ্দের ঃ এইবার আমারে দেন, তাড়া আছে।

শরীফ ঃ দিতে একটু সময় তো লাগেই। বাক্স থেকে সাবধানে নাশ্‌তা বের করতে হয়, খেয়াল রাখতে হয় ধূলাবালি মাছিটাছি না ঢোকে। এই নেন।

(নাশ্‌তা নিয়ে ২য় খদ্দের চলে যায়)

১ম ওয়ার্ডবয় ঃ শরীফ চাচা, ছয় রোগীর নাশ্‌তা – আলাদা আলাদা। একটু জলদি, ডিউটি রাইখ্যা আইছি।

শরীফ ঃ (নাশ্‌তা দিতে দিতে) ডিউটি রেখে তো রোজই আসছ। তাছাড়া রোগীদের নাশ্‌তা নেবে, এটাও তো ওয়ার্ডবয়দের একটা ডিউটি।

১ম ওয়ার্ডবয় ঃ কইছেন ঠিকই। রোগীরা আমার হাত দিয়া ভাল নাশ্‌তা খাইবার চায়। তাইতো আপনের কাছেই আসতে হয়।

শরীফ ঃ ছ'টাতেই পরিমাণ এক? বরাবরের মত?

১ম ওয়ার্ডবয় ঃ কমবেশি নিতে চাইলে আগেই আওয়াজ দিমু।

২য় ওয়ার্ডবয় ঃ চাচার লগে কি খাতিরজমা আলাপ আরম্ভ করলা? অখন কাইটা পড়।

(১ম ওয়ার্ডবয় চলে যায়)

চাচা, আপনের এই ওয়ার্ডবয়রে দেন তিনজনের নাশ্‌তা।

শরীফ ঃ গতকাল নিলে চারজনের। আজ একজনের কম যে?

২য় ওয়ার্ডবয় ঃ এক রোগী আইজ সকালে রিলিয অইয়া গেছে।

www.pathagar.com

শরীফ : আল্লা'র রহমত। এই নাও।

(২য় ওয়ার্ডবয় নাশ্‌তা হাতে নিয়ে তাকায় হাসপাতালের দিকে। তাদের চোখে ভাসে ... হাসপাতালের চত্বরে, প্রবেশপথে অনেক লোকের আনাগোনা। ... ওয়ার্ডের অভ্যন্তরে প্রতিটি কোঠায় অনেক রোগীর বিছানা। বিছানায় অর্ধশায়িত বা উপবিষ্ট রোগীদের কাছে আত্মীয় স্বজন। রোগীরা নাশ্‌তা খাচ্ছে বা খেয়ে শেষ করেছে। ... আবার শরীফ সাহেবের নির্দিষ্ট স্থান। ৩য় খদ্দের কথা বলছে শরীফ সাহেবের সঙ্গে)

৩য়খদ্দের : আমারে দেন দুই টেকার নাশ্‌তা। কিন্তু ভাল অইবো তো?

৩য় ওয়ার্ডবয় : মিয়া সায়েব বুঝি শরীফ চাচার নাশ্‌তা এই পয়লাবার কিনতাছেন?

৩য়খদ্দের : মানে? কি কইতে চান আপনে?

(শরীফ সাহেব ৩য় খদ্দেরকে নাশ্‌তা দিয়ে ৩য় ওয়ার্ডবয়ের নাশ্‌তার বন্দোবস্ত করে)

৩য় ওয়ার্ডবয় : না, কইবার কিছু নাই। মগর মালুম অইতাছে, কার নাশ্‌তা কিনবার আইছেন জানা নাই। জানা থাকলে শরীফ চাচার নাশ্‌তা ভাল অইবো কিনা তা পুছ করতেন না।

শরীফ (১ম ওয়ার্ডবয়কে) নাশ্‌তা দিলাম, এবার কেটে পড়।

(নাশ্‌তা নিয়ে ৩য় খদ্দের ও ১ম ওয়ার্ডবয় চলে যায়)

৪র্থ ওয়ার্ডবয় : এইবার আমারটা। চাচা, অত খরিদ্দার, একজন এ্যাসিস্‌টেন নেন।

৫ম ওয়ার্ডবয় : (আসতে আসতে) এ্যাসিস্‌টেন রাখব শরীফ চাচা? তুমি লোক চিনবার পার নাই মিয়া।

৪র্থ ওয়ার্ডবয় : ৫ নম্বর ওয়ার্ডবয়ের কথা শোনেন চাচা!

শরীফ : তোমরাই শোন। আমি নাশ্‌তা দেওয়া শেষ করি।

৫ম ওয়ার্ডবয় : শরীফ চাচার নাশ্‌তায় ভেজাল থাকে না, সব করেন নিজের হাতে – সব জিনিস পরখ কইরা কইরা। কিন্তু এ্যাসিস্‌টেন রাখলে সে যে ভেজাল মিশাইব না, তার গ্যারান্টি কি? কাজেই যা করবার, চাচা একলাই করবেন।

৪র্থ ওয়ার্ডবয় : বার বচ্ছর ধইরা চাচার এই নাশ্‌তার যে বেবস্থা, তার কোন হেরফের নাই। এর লাই অনেকেই কয়– চাচা এক ক্কামেল ফকির।

শরীফ : তোমরা এবার এস মিয়ারা। আমার নাশ্‌তা বিক্রি শেষ, তাই তোমাদের প্রশংসারও শেষ হোক।

www.pathagar.com

৫ম ওয়ার্ডবয় : না চাচা, বেহুদা প্রশংসা আমরা করি না। কথায় কথায় কথাড়া উইঠ্যা গেল, এইবার আসি।

(সালাম জানিয়ে ওরা চলে যায়। শরীফ সাহেব অবশিষ্ট কিছু নাশ্‌তা শালপাতায় করে অদূরে রেখে আসেন। অনেক কাক এসে জড়ো হয়। শরীফ সাহেব তা-ই তাকিয়ে দেখেন। একজনের কথা শুনে ফিরে তাকান, তাঁর সামনে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে)

বৃদ্ধ : এই যে ... ইয়ে, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমার নাম ... মানে আপনার নামই বুঝি শরীফ মিয়া?

শরীফ : জ্বি। আপনি এ সময়টায় বেড়াতে বেরোন বুঝি? অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি।

বৃদ্ধ : হ্যাঁ ভাই, রিটায়ার করেছি আজ তিন বছর। এ সময়টায় বেড়াতে বেরোই এ পথেই। আজ দাঁড়ালাম আলাপ করব বলে, কিছুটা কৌতূহল নিয়েই।

শরীফ : সরকারী চাকরি করতাম, হেল্‌থ্‌ এ্যাসিস্‌ট্যান্টের চাকরি। ছেড়ে দিয়েছি প্রায় বার বছর আগে। এরপর থেকে এই বাক্সতে করে নাশ্‌তা নিয়েই আছি।

বৃদ্ধ : দিনের অন্য সময়টায় অন্য কোথাও ...

শরীফ : জ্বি না। এ সময়টায় এখানে ছাড়া অন্য কোথাও আমি নাশ্‌তা বিক্রি করি না।

বৃদ্ধ : খুবই আশ্চর্য তো!

শরীফ : নির্দিষ্ট পরিমাণ নাশ্‌তা নিয়ে আমি বসি এখানে। আল্লা'র রহমতে তার সবটুকু বিক্রিও হয়ে যায়। চলে যাই বাসায়। পরের দিনের নাশ্‌তার আয়োজন করতে হয়। সব কিছুর কেনাকাটা নিজেই দেখেশুনে করি, নাশ্‌তাও তৈরী করি নিজেই।

বৃদ্ধ : এই আপনার একমাত্র রোজগার?

শরীফ : জ্বি। লালবাগে পৈত্রিক ভিটায় থাকি। পুরনো বাড়ী, একটা অংশ ভাড়া দিই। সেই ভাড়া আর নাশ্‌তা বিক্রি থেকে সামান্য যা পাই, আল্লা'র রহমতে দিন আমাদের ভালই চলে যায়।

বৃদ্ধ : ছেলেমেয়েক'জন?

শরীফ : তিন ছেলে তিন মেয়ে। বড় মেয়েটি আর বেঁচে নেই। অন্যরা ... মানে ... ইয়ে ...

বৃদ্ধ : যাক। তা কদ্দিন ধরে এই কাজ করছেন?

www.pathagar.com

শরীফ : হবে প্রায় বার বছর।

বৃদ্ধ : আপনি যে স্ট্যাণ্ডার্ডের মানুষ ... এদ্দিন ধরে একাজ করে যাচ্ছেন – ঠিক একই ভাবে ... আমার কাছে হিসাবটা ঠিক মিলছে না। এমনটি করার পেছনে ...

শরীফ : সব হিসাব কি সহজে মিলতে চায় স্যার? দোয়া করবেন – যে ক'দিন বেঁচে থাকি, এই হাসপাতালের গেটেই যেন নাশ্‌তা বিক্রি করে যেতে পারি। ঘরে বসে সাধ্যমত যত্ন করে আমি আর আমার স্ত্রী নিজেদের হাতেই নাশ্‌তা তৈরী করি। এর পেছনে উদ্দেশ্য আর কি থাকবে। রোগীদের নির্ভেজাল নাশ্‌তা খাইয়ে একটুখানি তৃপ্তি দেওয়া। শুধু এরই জন্য এতটি বছর ধরে নাশ্‌তা নিয়ে এই কাঠ-কাঁচের বাক্সটি বয়ে বেড়াচ্ছি।

(শরীফ সাহেবের কথাগুলি নিবিষ্ট মনে শোনেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক; কিন্তু পেছনকার উদ্দেশ্যের কোন হদিস পান না)

বৃদ্ধ : আপনার কথা শুনে সত্যিই খুশী হলাম। আচ্ছা, তখন ছেলেমেয়েদের কথা বলতে যেয়ে কেমন যেন ... মানে বলতে গিয়েও ঠিক বললেন না। ছেলেমেয়েরা আপনাকে অশান্তি দিচ্ছে না তো? এই বুড়োর কথায় কোন বেয়াদবী নেবেন না।

শরীফ : না না ... নাহ্‌। অশান্তির কি আছে। যুগ অনুযায়ী সব কিছুই ঠিক আছে। তাহলে স্যার, এখন আমি বিদায় নিই?

বৃদ্ধ : জ্বি। বড় ভাল লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করে, চলি।

(সালাম বিনিময় করে বৃদ্ধ চলে যান। শরীফ সাহেব অদূরে তাকিয়ে দেখেন– কাকগুলি আর নেই, পড়ে আছে খালি শালপাতাটা। হাসপাতালটা শেষবার দেখে নিয়ে রিকশা ডাকেন)

শরীফ : এই যে মিয়া!

(একটা রিকশা এসে থামে)

লালবাগ যাব। কত নেবে?

রিকশাওয়ালা : আমি আপনেরে আরও নিছি সা'ব। যা দেন, তা-ইদিয়েন।

শরীফ : ধর বাবা, এই বাক্সটা আমার সঙ্গে একটু ধর। খুব সাবধানে। আরে, পা'দানীতে রেখোনা।

রিকশাওয়ালা : ধরবার কায়দা করার লাই পাদানীতে একটু রাখলাম আর কি।

শরীফ : আমি আগে বসে নিই। ওটা আমি কোলের ওপর ধরে বসব।

(শরীফ সাহেব রিক্‌শায় ওঠেন)

ব্যস, এবার দাও।

www.pathagar.com

(রিকশাওয়ালার সাহায্যে শরীফ সাহেব বাক্সটা দু'পায়ের ওপর কোলের কাছে রাখেন)

রিকশাওয়ালা : এমুন কইরা বইলেন – মায়ে যেমুন ছোট বাচ্চা কোলে নিয়া বয়!

শরীফ : আমার কাছে এটা কোলের বাচ্চার মতই। সাবধানে যেয়ো বাবা, বেশি জোরে চালিয়ো না।

※

(রিকশা করে শরীফ সাহেব যখন বাসায় ফিরছেন, ঠিক ওই সময়টাতেই তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা তাহ্‌মিনা (ডাক নাম মিনু) রেসকোর্স উদ্যানের একটা নির্জন স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে; আর তখনই তাকে অনুসরণ করে তার কাছে এসে দাঁড়ায় তার ভাই শরীফ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র শাকের। শাকেরের মুখ-চোখ-চেহারা ও বেশভূষা কিছুটা বখাটে ধরনের)

শাকের : এই যে মিনু মানে তাহ্‌মিনা বেগম, এখানে তুই এসময়ে?!

তাহ্‌মিনা : হ্যাঁ ... ইয়ে – ক্লাস শেষ হয়ে গেল, বাড়ী যাবার আগে এখানটায় একটু ঘুরে যেতে এলাম। তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

শাকের : আমি যে খুব সিরিয়াস্‌লি অবাক হয়েছি তা নয়। তবুও তুই ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী, তোর কলেজটাও এখান থেকে বেশ দূরে। ভার্সিটিতে পড়লেও না হয় বুঝতাম – ক্লাসের চাপে মাথা ধরেছিল, তাই খানিকটা হাওয়া ...

তাহ্‌মিনা : ভাইয়া, তোর মুখে কিন্তু কোন কথাই আজকাল আটকাচ্ছে না!

শাকের : দ্যাখ্‌ মিনু, তোর এই শাকের ভাইয়াটিকে এসব বলে কোন লাভ নেই। সময়ের ডাকে আমি ঠিক পথেই চলতে আরম্ভ করেছি। যাক, একটা ছোটখাটো বিপদ ঘটে গেল আমার ... উদ্বিগ্ন মনেই পথ হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম তোরই কথা। হঠাৎ এদিকটায় তাকিয়ে দেখি – সত্যিই তুই। কাছে এলাম কিন্তু একটা প্রয়োজনে।

(তাহ্‌মিনা তাচ্ছিল্য ভরেই মুখ ফিরায়)

জানি, ভার্সিটির ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র আনযুম কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে তশরীফ আনবেন। তার আগে তুই চট করে আমাকে গোটা দশেক টাকা দে তো।

www.pathagar.com

তাহ্‌মিনা : এত টাকা আমার কাছে নেই।

শাকের : আছে। মিথ্যা বলে লাভ নেই মিস তাহ্‌মিনা। ওনলি টেন টাকা।

তাহ্‌মিনা : থাকলেও দেব কেন?

শাকের : দেবে এজন্য যে টাকাটা আমার না পেলেই নয়।

তাহ্‌মিনা : নানা ছুতায় রেগুলারটি তুই টাকা নিস্ ভাইয়াদের কাছ থেকে। তোর টাকার এত প্রয়োজন পড়ে কেন?

শাকের : সামান্য ক'টি টাকা দিতেই যখন তুই আমার কাছে এত কৈফিয়ৎ চাইছিস, তখন আমাকেও বড় ভাই হিসাবে তোর ভবিষ্যৎ ভালমন্দ সম্পর্কে ভাবতে হবে বৈ কি।

তাহ্‌মিনা : এসব কথার মানে?

শাকের : তুমি জান বহিন, আমাদের ফাদার শরীফ সাহেব একজন ফেরীওয়ালা।

তাহ্‌মিনা : ভাইয়া।

শাকের : আমাদের আব্বাকে এখন সবাই ফেরীওয়ালা বলেই জানে।

তাহ্‌মিনা : তাই বলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুই তা বলবি কেন?

শাকের : প্রসঙ্গে আসতে ওই কথা দিয়েই আরম্ভ করা দরকার। তদুপরি, তিনি একজন সিরিয়াস টাইপ অব ম্যান। আমরা তিন ভাই তো তাঁর কাছে থেকেও নেই। বড় আপা মারা গেছেন, মেজো আপা নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। আমাদের সেই ফাদারের একমাত্র আশা এখন তুই।

তাহ্‌মিনা : প্রসঙ্গে আসতে আরও কিছু বলে নিতে হবে?

শাকের : না, এসে গেছি। ফাদারের একমাত্র আশা তুমি আনযুম নামের তরুণটির সঙ্গে দেখা করার জন্য এসময়ে এই উদ্যানে এসে অপেক্ষা করছ, আব্বা তার খানিকটা আভাসও পেলে তোমার খুবই অসুবিধা হবে – এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

তাহ্‌মিনা : তাই তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে টাকা দিতে হবে?

শাকের : ওনলি টেন টাকা।

তাহ্‌মিনা : (ব্যাগ থেকে টাকা দিয়ে) ভয় দেখিয়ে ছোট বোনের কাছ থেকে টাকা নিতে তোর লজ্জাও করে না?

শাকের : করলেও বাধ্য হয়ে নিতে হয়। আর অপ্রাসঙ্গিক পিতৃ গৌরবের কথাটা বলছিলাম এজন্য যে ...

www.pathagar.com

তাহ্‌মিনা : থাক, আর বলতে হবে না। এম. এ. পরীক্ষা তো আর দেবে বলে মনে হচ্ছে না। শুনেছিলাম চাকরির চেষ্টা করছিস – তার কদ্দূর?

শাকের : অনেকটা দূর, আবার ব্যাকিং থাকলে খুবই কাছে। বাট ইউ নো বহিন, আমাদের রয়েছেন এক অসহনীয় ফাদার। ব্যাকিং তো দূরের কথা, তাঁর ছেলে বলে চিনতে পারলেও ওসব চাকরি-ফাকরির সম্ভাবনা কর্পূরের মত উবে যাবে।

তাহ্‌মিনা : খুব নীচে নেমে যাচ্ছিস ভাইয়া।

শাকের : নীচের তলটা কত নীচে – সে সম্পর্কেও একটা অভিজ্ঞতা লাভ করা মন্দ কি!

তাহ্‌মিনা : এতটা ফ্রাস্‌টেটেড্‌ হয়ে পড়েছিস তুই? যাক গে' (হঠাৎ নরম সুরে) ভাইয়া, একটা এ্যাড্‌ভাইস্‌ দেবে আমাকে?

শাকের : ওই সুবেশ তরুণটি সম্পর্কে?

তাহ্‌মিনা : তোর মুখে কিছুই আটকায় না।

শাকের : শরীফ ফেরীওয়ালার ছেলে বাবা ... ভেজালহীন খাঁটি জিনিস। বল্‌, কি এ্যাড্‌ভাইস?

তাহ্‌মিনা : (কিছুটা লজ্জা মেশানো কণ্ঠে) আনযুম আমাদের বাসায় যেতে চায়।

শাকের : হোয়াট? আমাদের ওই ভাঙা হাফ-বিল্‌ডিং আর টিনের প্যালেসে যাবে বড়লোকের ছেলে ওই আনযুম?

তাহ্‌মিনা : আমাদের সব খবরই সে জানে, কিছুই লুকোইনি আমি।

শাকের : কিন্তু আন-ভিযিটেড্‌ ইয়ারো ভিযিট করার পর আনযুমের এ্যাড্‌ভেঞ্চারটা বজায় থাকবে মনে করিস? গিয়ে তো দেখবে – তিনি মানে আমাদের ফেরীওয়ালা ফাদার পরের দিনের নাশ্‌তা তৈরীতে ব্যস্ত।

তাহ্‌মিনা : আব্বা সম্পর্কে তোর কথাগুলো শুনতে সত্যি খারাপ লাগে।

শাকের : এবং আমাদের আব্বার চাক্ষুস পরিচয় পেয়ে আনযুম সাহেবেরও খুব ভালো লাগার কথা নয়। (হঠাৎ দৃঢ় কণ্ঠে) শোন্‌, আব্বা যদ্দিন ওই ফেরীগিরি না ছাড়বেন, তদ্দিন আমাদের – এমন কি তোরও – সবগুলো আশা আর কল্পনা চোখের সামনে রঙীন ফানুস হয়েই ঝুলবে।

তাহ্‌মিনা : তুই থাম্‌ ভাইয়া।

শাকের : কেন থামব? বড়ভাই মেজোভাই কতদিন বলেছে ওসব

www.pathagar.com

ছাড়তে। কতদিন বলেছে – সম্মান বজায় রেখে কোন কিছু করতে। তিনি শুনবেন না। ওই সাধারণ মানুষের কাজকর্ম নিয়ে গর্ব অনুভব করবেন। বিরক্ত হয়ে ভাইয়ারা বাসা ছেড়েছে, মেজো আপা স্বয়ম্বরা হয়ে নিজের দিন দেখেছে। হেল্‌প্‌লেস্‌ হয়ে পড়ে আছি আমি আর তুই ... এণ্ড দ্যাট্‌ ওল্ড লেডি – আমাদের আম্মা। বুঝতে পারছি না, কতদিন আর ফেরীওয়ালার ছেলে হয়ে থাকতে হবে আমাদের। এ অবস্থায়ও তুই আনযুমকে আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে চাইছিস?

তাহ্‌মিনা : হ্যাঁ, চাইছি। কিন্তু তুই এত নির্মম ভাবে বলছিস ...

শাকের : কথার গায়ে মিথ্যার মলম লাগিয়ে আমি বলতে পারি না মিনু, চললাম।

তাহ্‌মিনা : কোথায় জানতে পারি?

শাকের : আড্ডায়। কিন্তু তুই বাড়ী ফিরতে রাত করিসনে।

(শাকের চলে যায়। ভাবতে থাকে তাহ্‌মিনা, আসে আনযুম– সুদর্শন সুবেশ এক তরুণ)

তাহ্‌মিনা : আনযুম! এত দেরী?

আনযুম : আসছিলাম ঠিক সময়েই। কিন্তু পথে চোখের সামনে হয়ে গেল একটা এ্যাক্‌সিডেন্ট। তাতেই ...

তাহ্‌মিনা : কিসের এ্যাক্‌সিডেন্ট? মানুষ মারা গেছে?

আনযুম : রিকশার এ্যাক্‌সিডেন্ট। আরোহী আহত। মিনা, তোমাকে এখ্‌খুনি বাসায় ফিরতে হবে।

তাহ্‌মিনা : হঠাৎ একথা বলছ কেন?

আনযুম : ওই রিকশার আরোহী ছিলেন তোমার আব্বা।

তাহ্‌মিনা : এ্যাঁ! আব্বা এ্যাক্‌সিডেন্ট করেছেন?

আনযুম : ভয়ের কিছু নেই। ওঁকে চেনেন – এমন লোক পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই। জানতে পারলাম, ইনিই তোমার আব্বা শরীফ সাহেব। ওই ভদ্রলোকই তাঁকে বাসায় নিয়ে গেলেন। মাথায় চোট পেয়েছেন।

তাহ্‌মিনা : কিন্তু বাসায় তো ভাইয়ারা কেউ নেই!

আনযুম : এক ফার্মেসীতে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে যা করবার করা হয়েছে। অর্ধজ্ঞানেও তিনি হসপিটালের বদলে বাসায় যেতে চাইলেন। তাই ...

www.pathagar.com

তাহ্‌মিনা ঃ নাশ্‌তা বিক্রি করে নিশ্চয়ই বাসায় ফিরছিলেন?

আনযুম ঃ হ্যাঁ, তাঁর বাক্সটা সঙ্গেই ছিল। চল, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিই।

তাহ্‌মিনা ঃ তুমি যাবে?

আনযুম ঃ সঙ্কোচের কোন কারণ আমি দেখছি না। তাই অমত না করে সঙ্গে চল।

তাহ্‌মিনা ঃ (যেতেযেতে) আল্লাহ্‌, গিয়ে যেন আব্বাকে ভাল দেখি।

(ওরা চলে যায় ত্রস্ত পায়েই)

※

(টিনের ঘরের একটা বিছানায় শুয়ে আছেন শরীফ সাহেব। কোঠাটির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে বড় ছেলে ফজল আহমেদ ও মিনুর আম্মা)

ফজল ঃ জানতাম, এমনি কিছু একটা হবে একদিন। এত বয়সেও আব্বার সেই আগের মত একগুঁয়েমী। নাশ্‌তা বিক্রি করতে হসপিটাল গেটে যাবেনই। এবার হল তো।

আম্মা ঃ তুই আমাদের বড় ছেলে ফজল। অন্যদের মত তুইও যদি এমন করে বলিস ...

ফজল ঃ অপ্রিয় হলেও কথাটা তো সত্য। আমরা বড় হয়েছি, যেভাবে পারছি, নিজেদের মত রোজগার করছি। কিন্তু তিনি আমাদের রোজগারের টাকা নেবেন না।

আম্মা ঃ কেন যে নিতে চান না, তা তো তোরা জানিসই বাবা।

ফজল ঃ আব্বার বিশ্বাস, আমরা রোজগার করি অসৎ উপায়ে। তাই অন্ধ বিশ্বাসকে বজায় রেখে তিনি আমাদের দুই ভাইকে পর করে দিলেন।

আম্মা ঃ এতদিন ধরে যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে তিনি বেঁচে আছেন ...

ফজল ঃ আজকের দিনে সে-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। আব্বার কল্পনার জগত তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে দিনগুলো তোমরা পার হয়ে এসেছ, তা আজ সত্যি-সত্যিই গত হয়ে গেছে। সে পৃথিবী নেই, সে পৃথিবীর রীতি-নীতি নেই। টাকা ছাড়া আজ কোথাও এক পা' বাড়াবার যো নেই। পৃথিবীতে আজ বায়বীয় বিশ্বাস

www.pathagar.com

বড় নয় আম্মা, বড় হচ্ছে বাস্তব বস্তু। ওজন আর পরিমাণ দিয়ে মূল্য নির্ধারিত হয় যে বস্তুর তারই গুরুত্ব আজ বেশি।

আম্মা : তোর এসব কথা আমি বুঝি না। তোর আব্বা তো টাকা রোজগারে কোন দিনই বাধা দেন নি। তিনি শুধু সৎভাবে টাকা রোজগার করতে বলেছেন।

ফজল : তোমাদের ধারণায় যা সৎভাব – তাতে টাকা আসে না, আসে লাঞ্ছনা আর অশান্তি।

আম্মা : কম টাকায়ও কি আমরা চলতে পারতাম না?

ফজল : না, পারতে না। তোমরা আছ পুরনো নীতি–কথার ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে। তাতে কন্‌কনে শীত মানে না।

আম্মা : বাবা ফজল, এসব কথা এখন থাক্।

ফজল : ডাক্তার সাহেব ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেছেন– ভয়ের কিছু নেই।

আম্মা : তুই তো শুনেই ছুটে এলি, চিকিৎসারও ব্যবস্থা করলি। কিন্তু মেজোটা যে দেশের বাইরে।

ফজল : সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে দেখবে। যাক, চিকিৎসার ব্যবস্থা যে আমিই করছি, তা ওঁকে বলতে যেয়ো না।

(এমন সময় ব্যগ্রভাবে আসে তাহ্‌মিনা)

কলেজ থেকে ফিরতে এত দেরী হল মিনু?

তাহ্‌মিনা : এখন কেমন আছেন আব্বা?

আম্মা : ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

ফজল : কাল সকালে আবার আসব আম্মা। (ফজল চলে যায়)

আম্মা : কাপড় চোপড় তুই ছেড়ে আয় মিনু, আমি ততক্ষণ কাছে বসি।

তাহ্‌মিনা : আনযুমের কথা তোমাকে বলেছিলাম না? তার কাছেই এ্যাক্‌সিডেন্টের কথা শুনেছি। তিনিই ফার্মেসীতে আব্বার প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছেন। তারপর আমাকে পেয়ে এখানে পৌঁছিয়ে দিতে এসেছেন।

আম্মা : তাকে বসতে দিয়েছিস? (তাহ্‌মিনা মাথা নেড়ে সায় দেয়) তার কাছেতুই-ই যা এখন, আমি একটু পরে আসছি।

(তাহমিনা আনযুমের উদ্দেশ্যে চলে যায়। দেয়াল ঘড়িতে আধা ঘন্টা বাজার শব্দ হয়। শরীফ সাহেব চোখ মেলে তাকান)

শরীফ : (তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে) কে?

www.pathagar.com

আম্মা : আমি, মিনুর আম্মা। তোমার ঘুম ভেঙে গেল?

শরীফ : হ্যাঁ। আমার নাশ্‌তার বাক্সটা? একেবারেই ভেঙে গেছে?

আম্মা : না, সাইডের কাঁচগুলো ফেটে গেছে একটু।

শরীফ : একবার দেখি না!

আম্মা : পরে বরং দেখো। তুমি বেশ অসুস্থ। মাথায় চোট পেয়েছ।

শরীফ : মিনুর মা, সত্যি করে বল – বাক্সের কাঁচগুলো বেশি ফেটে যায় নি তো? একেবারে ভেঙে যায় নি তো?

আম্মা : না গো, না। আশ্চর্য মানুষ তুমি! নিজের এত বড় একটা ফাঁড়া গেল – তা কিছু না, বাক্সটার চিন্তায় অস্থির!

শরীফ : সব জেনেও তুমি একথা বলছ মিনুর মা?

আম্মা : আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না।

(মিনুর আম্মার চোখে পানি এসে যায়। আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধরেন তিনি)

শরীফ : মিনুর মা, আমি ভাল হয়ে যাব তো? বাক্সে করে নাশ্‌তা নিয়ে হাসপাতালের গেটে আবার গিয়ে বসতে পারব তো?

আম্মা : ইনশা'ল্লাহ্‌ পারবে।

শরীফ : মন্টু কোথায়? আমার হাসিনা মা'র ছেলে মন্টু?

আম্মা : সকালে তো মন্টু তার দাদার বাড়ীতে বেড়াতে গেছে – ওই জয়দেবপুরে। কেন, তোমার মনে পড়ছে না?

(মিনুর আম্মার চোখে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা– স্মৃতিশক্তিতে কোন কিছু –)

শরীফ : খবর পাঠিয়ে আনিয়ে নাও। ও কাছে থাকলে তবুও আমি হাসিনা মা'র পরশ পাই। আর শোন, নাশ্‌তার বাক্সটা এখানে আমার কাছেই এনে রাখ।

আম্মা : বাইরের ঘরে একজন মেহ্‌মান বসে আছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলে তোমার বাক্সটা নিয়ে আসব। ঘরের আলোটা কমিয়ে দিয়ে যাই, তুমি চুপ করে শোও।

(ঘরের আলোটা কমিয়ে দিয়ে চলে যান মিনুর আম্মা)

*

(পরের দিনের ভোর। বেশ কিছুটা বেলাই হয়েছে। শরীফ সাহেবের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে বড় ছেলে ফজল ও ছোট ছেলে শাকের। তখনই সেখানে আসেন হাসপাতালের

www.pathagar.com

(গেটে শরীফ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সেই বুড়ো ভদ্রলোক ও মহল্লার মসজিদের মুয়াযযিন)

মুয়াযযিন : এই যে বাবা ফজল মিয়া, এই সাহেব আপনাদের আব্বাকে দেখতেএসেছেন।

ফজল : খুবই সৌভাগ্যের কথা। আপনার পরিচয়টা পেলে ...

বৃদ্ধ : আমি একজন রিটায়ার্ড অফিসার। আপনাদের আব্বার সঙ্গে সেদিনই হাসপাতালের গেটে প্রথম পরিচয়। খুবই ভাল লাগল। কাল বিকেলে ওখানে গিয়ে শুনলাম – তিনি এ্যাক্‌সিডেন্ট করেছেন। হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়দের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁকে দেখতে এলাম। মসজিদের এই মুয়াযযিন সাহেব আমাকে পথ দেখিয়ে আনলেন। এখন তিনি কেমন আছেন বাবা?

ফজল : একটা কম্পলিকেসি দেখা দিয়েছে। কথা বলছেন এলোমেলো। এখান থেকে অল্প দূরে আমার বন্ধুর এক বাসা খালি পড়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে আব্বাকে ওখানেই নিয়ে রেখেছি। আমাদের এই বাসাটা একটু স্যাঁৎসেতে। তাই দেখতে চান যদি, ওই বাসায় ...

বৃদ্ধ : না,থাক। আমি খবর রাখব, একটু সুস্থ হলে দেখা করতে আসব।

ফজল : এখানে খানিকটা বিশ্রাম করে যান। আমরা ওখানেই যাচ্ছিলাম, বেশ কিছুটা চিন্তায় আছি তো।

বৃদ্ধ : না না, আপনারা আসুন। আমিও আজ বসব না।

(ফজল ও শাকের যথাসম্ভব বিনয় দেখিয়ে চলে যায়। বৃদ্ধ ও মুয়াযযিন তাদের চলে যাওয়ার পর পরস্পরের দিকে তাকান)

মুয়াযযিন সাহেব, কেন জানি না – আমার একটা ফিলিং হচ্ছে, মানে একটা ধারণা ...

মুয়াযযিন : আমি মসজিদের এক সামান্য মুয়াযযিন, খুবই সামান্য মানুষ। তবে অনেকদিন ধরেই আছি এ মহল্লায়। তাই বলব– শরীফ সাহেবের পরিবার সম্পর্কে কিছু একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। উনি ভাল হলে আসুন একদিন, আপনার ধারণা সম্পর্কেজানতে পারবেন।

বৃদ্ধ : আচ্ছা, শরীফ সাহেবের ছেলেরা কি করেন?

মুয়াযযিন : শুনি তো বিজনেস করে। কিসের বিজনেস তা জানিও না,

www.pathagar.com

বুঝিও না। কিন্তু শরীফ সাহেব ওইসব বিজনেস একেবারেই পছন্দ করেন না। বিয়ের পর বড় দুই ছেলে এখান থেকে চলেই গেছে।

বৃদ্ধ : বড় মেয়েটি তো মারা গেছে শুনলাম।

মুয়ায্যিন : জ্বি। ওই মেয়েটির মৃত্যু নিয়েই কি যেন আছে শরীফ সাহেবের জীবনে। এর বেশি আমি আর ... ইয়ে, আপনি যদি এঁদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা করার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে আমি বলব – শরীফ সাহেব সত্যিই একজন শরীফ মানুষ। নিশ্চিন্তে আত্মীয়তা করতে পারেন।

বৃদ্ধ : না না ভাই, ওসব কিছু না। আমার শুধু একটা ঔৎসুক্য। আচ্ছা চলুন, যাওয়া যাক।

(ওঁরা চলে যান। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসে ফজল ও শাকের)

ফজল : আমি স্থির করেছি শাকের, একটা ডিসিশ্যন এখনই নিতে হবে। পুরনো আর নতুন ধারার টানাপোড়েনে আমরা আর অনিশ্চয়তায় ভাসতে চাই না। তিন চার দিনের মধ্যেই বাকের সিঙ্গাপুর থেকে চলে আসবে। এ্যাণ্ড দেন ওই উইল গো ফরওয়ার্ড উইথ দ্যা প্ল্যান।

শাকের : তোমরা যা বলবে আমি তাই-ই করব।

ফজল : তুই বাসা থেকে একবার ঘুরে আয়। আমি বাদবাকী আয়োজন করছি। আব্বার কাছে থাকবেন শুধু আম্মা, আর সেখানে-এখানে যাওয়া–আসা করব শুধু তুই আর আমি। তাহ্‌মিনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার বাসায়।

শাকের : কিন্তু প্ল্যানটা কি?

ফজল : আমাদের এই বাসাটা, জায়গা কম নয়। ধর্, এর অর্ধেকটায় মাল্‌টি-স্টোরিড বিল্ডিং যদি করা যায়, তাহলে আমাদের তিন ভাইয়ের দিন ফিরে যাবে। কিন্তু আব্বা তা জীবন থাকতেও করতে দেবেন না।

শাকের : দিলেও মালটি-স্টোরিড বিল্ডিং করতে অনেক টাকার দরকার।

ফজল : আমি একটা পার্টি যোগাড় করেছি। অর্ধেক রাইটের বিনিময়ে পুরো টাকাটা পার্টিই দেবে।

শাকের : কিন্তু আব্বার সম্মতি?

www.pathagar.com

ফজল : দেবেন না। তাই অনেকটা ক্রুয়েল হলেও আব্বার এই অসুস্থতার সুযোগে একটা কাজ আমাদের করে ফেলতে হবে।

(শাকের অনুসন্ধিৎসু)

তুই হয়তো জানিস, দাদাজান এই সম্পত্তিটা উইল করে দিয়ে যান শুধু আব্বার নামে। তাঁর অন্য ছেলে চাচাজানের স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। এখন তিনি আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে আছেন।

শাকের : তারপর?

ফজল : আব্বার নামের ওই উইলটা যদি আমরা হস্তগত করতে পারি, তাহলে এ বাড়ীর অর্ধেকটার বেশি আব্বা ক্লেইম করতে পারবেন না।

শাকের : কেন, উইলের অফিসিয়্যাল রেকর্ড আছে!

ফজল : খোঁজ নিয়েছি – বৃটিশ পিরিয়ডের সেসব রেকর্ডপত্র আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আব্বার কাছের দলিলটাই এ বাড়ীর উপর আব্বার স্বত্বের একমাত্র প্রমাণ।

শাকের : খোঁজাখুঁজি করে সে-দলিল না হয় হস্তগত করা গেল। কিন্তু তাতে সুবিধে হবে চাচাজানেরই।

ফজল : আলাপ হয়েছে, কিছু টাকা পেলেই চাচাজান তার স্বত্ব আমাদের নামে হস্তান্তর করে দেবেন।

শাকের : খুবই ঘোরপ্যাঁচের ব্যাপার। তবু পার যদি, এগোও। কিন্তু আব্বাকে ঠকানো –

ফজল : আব্বার তো অর্ধেকটা রইলই। আমরা ওতে আর হাত দেব না।

শাকের : ঠিক আছে, তোমার কথায় আমি রাজী।

ফজল : দেখবি ওসব ফ্ল্যাট থেকে আমরা তখন নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা পেতে থাকব।

*

(রেসকোর্স উদ্যানে এক নির্জন স্থান। সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আনযুম ও তাহ্‌মিনা)

তাহ্‌মিনা : আমার মনে হয় আনযুম– আমাদের পরিবারে একটা বিপর্যয় যেন আসন্ন!

www.pathagar.com

আনযুম ঃ হঠাৎ এমনটি মনে হওয়ার কারণ?

তাহ্‌মিনা ঃ বড় ভাইয়ার কথাবার্তার ধরণটা যেন কেমন। অসুস্থ আব্বাকে নিজের বাসায় আনল না, নিয়ে তুলল এক বন্ধুর বাসায়।

আনযুম ঃ তোমার আব্বা ছেলেদের বাসায় থাকাটা একেবারেই পছন্দ করবেন না– হতে পারে এজন্যই তাঁকে বন্ধুর বাসায় তোলা হয়েছে। আর তা তো ডাক্তারেরই উপদেশে।

তাহ্‌মিনা ঃ হতে পারে। আমার ওপর হুকুম– রোজ সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরতে হবে। বাসায় মানে তাঁর নিজের বাসায়।

আনযুম ঃ বয়স্থা বোন। সন্ধ্যার পরেও বাইরে থাকবে কেন?

তাহ্‌মিনা ঃ তুমিও বলছ একথা?

আনযুম ঃ আমারই তো বিশেষ করে বলার কথা।

তাহ্‌মিনা ঃ অভিভাবকের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি যেন?

আনযুম ঃ বরাবর যা শুনবে, রিহার্স্যালে তা শোনা মন্দ কি।

তাহ্‌মিনা ঃ কিন্তু আমার আব্বার যা পুরনো দিনের স্বভাব, তাতে বরাবরের ব্যবস্থা হবে কি না –

আনযুম ঃ হবে। তোমাদের আব্বাকে তোমরা ঠিক বুঝতে পার না।

তাহ্‌মিনা ঃ আজকের দিনের মডার্ন ছেলে হয়েও তুমি –

আনযুম ঃ হ্যাঁ, পুরোপুরি মডার্ন হয়েও আমি একথাই বলছি। চল, দিয়ে আসি তোমাকে।

তাহ্‌মিনা ঃ আবার দিয়ে আসার দরকার কি?

আনযুম ঃ দরকার আছে বলেই তো দিয়ে আসতে চাইছি। শোন, তোমাদের পরিবারের একটা বিপর্যয়ের কথা বলছিলে না? আমারওতা-ই মনে হচ্ছে। কাজেই থাকবে খুব সাবধানে।

(ওরা চলে যায়)

⁕

(একটা পাকা কোঠায় সুন্দর বিছানায় শুয়ে আছেন শরীফ সাহেব। ঘরে রয়েছে মিনুর আম্মা। শাকের আসে, এটা ওটা দেখে। চোখে পড়ে দেয়ালে টাঙানো হাসিনার একটা বাঁধানো ছবি। হাসিনার চোখে যেন রাজ্যের মমতা, মুখে মৃদু হাসি)

শাকের ঃ এখানে আবার কয়েকদিনের জন্য হাসিনা বু'র ছবিটা টাঙালে

www.pathagar.com

কেন?

আম্মা : হাসিনার ওই ছবিটা বিছানার পাশের দেয়ালে না থাকলে তোর আব্বা মনে বড় কষ্ট পান। ফজলের কথায় আসতেই যখন হল এখানে, ছবিটাও নিয়ে এলাম।

(এর মধ্যে শরীফ সাহেব জেগে ওঠেন, বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে বালিশে হেলান দেন। হাসিনার ছবিটা তাঁর চোখে একবার ঝাঁপসা মনে হয়, পরক্ষণেই তা স্পষ্ট হয়ে আবার ঝাঁপসা হয়ে যায়)

শাকের : (নিম্নকণ্ঠে আম্মাকে) মনে হয় হাসিনা বু'র ছবিটা আব্বা চিনতে পারছেন না। ঘর-দরজাও নয়।

আম্মা : (শরীফ সাহেবকে) কি হল তোমার? এমন করছ যেন কিছুই চিনতে পারছ না?

শরীফ : না, স্পষ্ট চিনতে পারছি না। এটা তো আমার ঘর নয়! আমার ঘরে যাওয়ার দরজাটাও খুঁজে পাচ্ছি না!

আম্মা : এটাই এখন তোমার শোবার ঘর।

শরীফ : না না, এটা আমার শোবার ঘর হবে কেন?

শাকের : (নিম্ন কণ্ঠে আম্মাকে) প্রসঙ্গটা বদলাও আম্মা। নইলে ঘরের এটা ওটা নিয়ে কত কথার জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে।

আম্মা : এই শাকের তখন বলছিল ...

শরীফ : শাকের! শাকের কোথায়?

আম্মা : এই তো আমাদের শাকের! ওকে চিনতে পারছ না?

শরীফ : কই, চিনতে পারছি না তো। আমাদের সেই শাকের কোথায়? সেদিনের সেই শাকের আব্বু?

আম্মা : শোন, মন্টুকে আনার জন্য জয়দেবপুরে লোক গেছে। আমাদের হাসিনার ছেলে, মন্টু!

শরীফ : ও, মন্টু? মন্টু কোথায়?

আম্মা : বললাম না – মন্টু তার দাদার ওখানে বেড়াতে গেছে! আনতে লোক পাঠিয়েছি।

শরীফ : হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

আম্মা : কিন্তু তুমি শাকেরকেও চিনতে পারলে না? আমাকে চিনতে পারছ তো?

শরীফ : হ্যাঁ– এ, তোমাকে চিনতে পারছি। তুমি তো ফাতেমা, আমার হাসিনার আম্মা। আচ্ছা, তোমার মনে আছে – মন্টুর আম্মা

www.pathagar.com

যখন খুব ছোট, তখন খাট থেকে সে পড়ে গিয়েছিল?

আম্মা : খুব মনে আছে। এই নিয়ে তোমার আমার কত উদ্বেগ!

শরীফ : সব দেখি মনে আছে তোমার! দেয়ালের ওই ছবিটা ...

আম্মা : আমাদের সেই হাসিনার ছবি। বিয়ের পর মন্টু তার কোলে এল। তখনকার ওই ছবিটা। চিনতে পারছ তো?

শরীফ : পারছি, কিন্তু কেমন যেন অস্পষ্ট। যে দেয়ালে টাঙানো, সেটাও যেন নতুন দেয়াল।

আম্মা : তোমার শরীরটা এখন কেমন লাগছে?

শরীফ : ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছ?

আম্মা : না, তবে ওষুধে হয়তো ঘুম আসছে।

শরীফ : এখন আমার মনে পড়ছে শুধু হাসিনার কথা।

আম্মা : যে আর বেঁচে নেই, তার কথা এত ভেবে কি হবে বল।

শরীফ : মরে গেছে আমার হাসিনা– তাই না? (ঘুম জড়ানো কণ্ঠে) অসুখ হল তার, হাসপাতালে পাঠালাম। রোজ দেখতে যেতাম – তুমি আর আমি ... ওখান থেকেই নাশ্‌তা কিনে খাওয়াতাম ... তারপর ... কি যে হল ... কয়েকদিনের মধ্যেই মরে গেল আমার হাসিনা।

আম্মা : (কান্নাজড়িত কণ্ঠে) এমন করে সব কথা কেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ!

শরীফ : কবে যে আমি ভাল হয়ে উঠব। আচ্ছা মিনুর মা, হাসপাতালের গেটে ওয়ার্ডবয়দের কাছে খবর পাঠানো যায় না – একটু ভাল হয়েই আমি আবার বাক্সভর্তি নাশ্‌তা নিয়ে হাজির হব?

(বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে শরীফ সাহেবের। মিনুর মা শরীফ সাহেবের বুকে হাত বুলিয়ে দেয়)

※

(শরীফ সাহেবের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ফজল ও শাকের। ফজলকে বেশ বিপর্যস্ত বলে মনে হয়)

ফজল : তখন থেকে সারাটা বাসা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। কিন্তু কোথাও নেই সে-দলিল।

শাকের : তাহলে দলিলটার হল কি? কোথাও তো থাকতে হবে।

ফজল : সে-প্রশ্ন তো আমারও। ঘরের সর্বত্র, আসবাবপত্র খুঁজে দেখলাম – কোথাও পেলাম না।

www.pathagar.com

শাকের ঃ তাহলে উপায়? অন্য কারও কাছে রাখবেন – তাও তো মনে হয় না। বাড়ীতেই কোথাও আছে।

ফজল ঃ একমাত্র উপায় – আব্বার এলোমেলো কথা থেকে কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া। আর তা পেতেই হবে। আজকের দুনিয়ায় সুখে সসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য ওই দলিল আমাদের পেতেই হবে। এ আমাদের স্বার্থ নিয়ে এক জীবন-মরণের যুদ্ধ। গোটা পৃথিবী আজ এ যুদ্ধে সামিল। চল্ আব্বার কাছে।

(ওরা বেরিয়ে যায়)

※

(নতুন বাসার কোঠায় ভাল বিছানায় শুয়ে আছেন শরীফ সাহেব। বিপর্যস্ত ফজল আসে সেখানে, গলাখাকারী দেয়)

শরীফ ঃ (ঘুম জড়ানো কণ্ঠে) কে?

ফজল ঃ আমি আব্বা। আপনার বড় ছেলে ফজল আহমেদ।

শরীফ ঃ (ঘুম জড়ানো কণ্ঠেই) কি চাও ফজল?

ফজল ঃ না ... দেখতে এলাম, এখন কেমন আছেন?

শরীফ ঃ ভাল। শুধু ঘুম-ঘুম অবস্থায়ও দেখছি – মা হাসিনা এসে আমার গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

(চকিতে ফজলের চোখে সন্ধানী দৃষ্টি)

ফজল ঃ মন্টুর আম্মাকে আমিও কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম। একবার মন্টুর আম্মা বলল– আপনার নামে সম্পাদন করা দাদাজানের উইলটা নাকি হারিয়ে গেছে। সত্যি না কি আব্বা?

(শরীফ সাহেবের ঘুম জড়ানো ভাবটা ততক্ষণে কেটে গেছে)

শরীফ ঃ না, হারাবে কেন? উইলটা আছে। স্বপ্নে এসে আমার হাসিনা ... বুঝলি রে ফজল, সেদিন হাসপাতালে আমার কিনে আনা নাশতা খেয়ে দিব্যি কথা বলল আমাদের সঙ্গে। তাকে শুইয়ে দিয়ে আমরা চলে এলাম।

ফজল ঃ হ্যাঁ, তারপরই হঠাৎ করেই অসুখটা বেড়ে গেল। ওসব আজেবাজে নাশ্‌তা ...

শরীফ ঃ হ্যাঁ, মৃত্যুমাখা নাশ্‌তা ... ওই নাশ্‌তা খেয়েই মরে গেল আমার হাসিনা। ... কই, আমার নাশ্‌তার সেই পুরনো বাক্সটা কই?

www.pathagar.com

ফজল : একটা পুরনো সামান্য বাক্সের জন্য আপনি ...

শরীফ : না না, সামান্য বাক্স ওটা নয়! (বিড়বিড় করে) ওই পুরনো বাক্সটাই এখন আমার একমাত্র মহামূল্য সম্পদ ...' আমার জীবনের অবলম্বন! কই, সে-বাক্সটা কই?

(ফজলের চোখে মুখে জ্বলে ওঠে আশার আলো। নিজের কণ্ঠই সে শুনতে পায় নিজে-)

ফজলের কণ্ঠ : উইলটা তাহলে সেই বাক্সের কোথাও আছে! ...

ফজল : আব্বা, আপনি বিড়বিড় করে কি বলছেন? সেই পুরনো বাক্সটা চান? আপনি শুয়ে আরাম করুন, বাক্সটা আমি নিয়ে আসছি। (শাকেরের উদ্দেশ্যে) শাকের, আমার সঙ্গে আয়।

(আম্মা ও শাকের আসে পাশের কোঠা থেকে। শাকেরের প্রতি ইঙ্গিত করে ফজল বলে-)

আয় শাকের, দেরী করিস নে।

(বলেই বেরিয়ে যায়, শাকেরও যায় পেছনে পেছনে। মিনুর আম্মা কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু চোখেমুখে সন্দেহের ছায়া নামে। তখনই ডাকতে ডাকতে আসে কিশোর মন্টু)

মন্টু : নানা ভাই, ও নানা ভাই!

শরীফ : (খুশী হয়ে) কে রে? মন্টু?

আম্মা : এ বাসায় কি করে এলি রে মন্টু?

মন্টু : বাসায় গিয়ে দেখি সেখানে কেউ নেই। তারপর মসজিদের মুয়াযযিন সাহেব এলেন, চিনিয়ে দিলেন এ বাসাটা। তোমার কি হয়েছে নানা ভাই?

শরীফ : এ্যাক্সিডেন্ট্। মাথায় চোট পেয়েছি। তুই এসেছিস, আমার হাসিনার ছেলে। এবার আমি ভাল হয়ে যাব রে মন্টু।

মন্টু : আমার আম্মার ছবিটাও এখানে নিয়ে এসেছ?

শরীফ : হ্যাঁ, এখন সব পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তোর বড় মামা, ফজল মিয়া, পুরনো বাসা থেকে আমাকে এখানে এনে তুলেছে। এক অসুস্থ ফেরীওয়ালাকে কোনরকমে আড়াল করে নিজের স্টেটাস রক্ষা করে চিকিৎসা করাচ্ছে।

আম্মা : না, মানে ... ওই বাসাটা স্যাঁৎসেতে হয়ে আছে তো, তাই ...

শরীফ : তোর নানীরই হয়েছে বিপদ। একদিকে আমার পছন্দ-অপছন্দ, অন্যদিকে ছেলেদের মান-সম্মান ... আমাকে শান্ত রাখতে এখানে নিয়ে এসেছে মা হাসিনার ছবি। মিনুর আম্মা, ছবিটা দেয়াল থেকে নামিয়ে আমার হাতে দাও।

(আম্মা ছবিটা নামিয়ে আনে)

www.pathagar.com

আম্মা : এই নাও তোমার মেয়ের ছবি। একি, একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলে যে?

মন্টু : ধরবে না? নানা ভাইর আদরের মেয়ে, আমার আম্মার ছবি না?

শরীফ : মিনুর আম্মা, শরীরটা আমার বেশ ভাল লাগছে। এবার আমাকে নিয়ে চল নিজের বাসায়। আর এখন থেকে হাসিনার এই ছবি আমার হাতের কাছেই থাকবে। ওখানে গেলে আমার সব অসুস্থতা কেটে যাবে। নাও, তৈরী হয়ে আমাকে নিয়ে চল। .... আমার এসব কথাকে তুমি পাগলের উক্তি মনে করো না হাসিনার মা!

আম্মা : নিয়ে যাব তোমাকে, নিজের বাড়ীতেই নিয়ে যাব। কিন্তু একটা কথা ...

শরীফ : কি কথা হাসিনার মা?

আম্মা : এতদিন তোমার সঙ্গে ঘর-সংসার করলাম – কিন্তু আজও তোমার মনের কোন কূল-কিনারা পেলাম না।

শরীফ : মনের সবটুকু একাগ্রতা দিয়ে আমার মনটাকে খুঁজেছ কোনদিন? হয়তো খোঁজ নি, তাই ...

আম্মা : এতগুলো আপনজনের মাঝে বসবাস করেও তুমি যেন সম্পূর্ণ একা!

(শরীফ সাহেব হাসিনার ছবিটাকে বুকে চেপে ধরেন)

ভালবাস তুমি সবাইকে, কিন্তু একজনের স্মৃতি ছাড়া সবাই যেন তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে!

শরীফ : বাকীটাও বল। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সম্বল করেছি ...

আম্মা : সেই স্মৃতির এক ছবি, আর ...

শরীফ : আর?

আম্মা : নাশ্‌তার একটি পুরনো বাক্সকে।

শরীফ : আমাকে নিজের বাসায় নিয়ে চল হাসিনার মা!

(আম্মা অগত্যা জিনিসপত্র গুছাতে আরম্ভ করে। মন্টু নানার কাছে দাঁড়িয়ে নানার মুখের দিকে তাকিয়ে)

⁂

(শরীফ সাহেবের বাসার সামনেটা। বিপর্যস্ত ফজল বাইরে আসে, পেছনে আসে শাকের)

ফজল : এবারও ব্যর্থ হলাম শাকের। নাশ্‌তার পুরনো বাক্সের তলাটা

www.pathagar.com

দু'টো পাতলা তক্তায় তৈরী, একটির ওপর আর একটি। ভেবেছিলাম- তক্তা দু'টোর মধ্যেই রয়েছে সেই দলিল। কিন্তু তা-ও খুলে দেখলাম – নেই। (হতাশ কণ্ঠে) আমাদের সব প্ল্যান তাহলে ভেস্তে গেল শাকের!

শাকের : আমার মনে হচ্ছে, উন্মাদের মত হাস্যাস্পদ সব কাজ করে যাচ্ছি আমরা।

ফজল : কি বলতে চাস্ শাকের?

শাকের : মজাদার সিনেমার কাহিনী রচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি আর মনে করি না। ঘরে চল ভাইয়া, বাক্সটার তলা আমরা ঠিক করে নিই। এখ্খুনি আব্বার কাছে বাক্সটা নিয়ে যেতে হবে ভাইয়া!

ফজল : শাকের! তুই আমাকে উন্মাদ মনে করছিস্?

শাকের : আব্বা এ্যাক্সিডেন্ট্ করে পড়ে আছেন বিছানায়। মাথায় চোট পেয়ে কথা বলছেন এলোমেলো – আর আমরা তারই সুযোগে যা করছি, উন্মাদের কাজ ছাড়া তাকে আর কি বলা যায়?

ফজল : উন্মাদের এ কাজটিকে প্রথমে সমর্থন জানিয়েছিলে কেন? তখন কেন এ শুভ বুদ্ধির উদয় হয় নি?

শাকের : পথভ্রান্তের কাছে মরীচিকার পথও সঠিক বলে মনে হয়। চল ভাইয়া, আমরা আব্বার কাছে ফিরে যাই। সঙ্গে নিয়ে যাই ওই বাক্সটা। আব্বাকে ফিরিয়ে আনি আমাদের এ পুরনো বাড়ীতে।

(ফজল নীরব। তখনই শরীফ সাহেবকে রিকশা থেকে নামিয়ে ধরে নিয়ে আসে আম্মা ও মন্টু। ফজল অবাক। শাকের এসে আব্বাকে ধরে)

আব্বাকে এসে ধর ভাইয়া।

(ফজলও এগিয়ে গিয়ে শরীফ সাহেবকে ধরে। সবাই বাসার ভেতরে যায়)

*

(শরীফ সাহেবের টিনের ঘরের সেই কোঠা। সে-কোঠায় আসে সবাই। শরীফ সাহেবকে বিছানার উপর বসিয়ে দেয়া হয়। তাঁর হাতে তখনও হাসিনার ছবিটা। শরীফ সাহেবের দৃষ্টি পড়ে ঘরের মেঝেতে রাখা ভাঙা সেই পুরনো বাক্সটার ওপর)

শরীফ : আমার বাক্সটা যে একেবারেই ভেঙে গেছে!

www.pathagar.com

আম্মা : তুমি শান্ত হয়ে বস, আমি দেখছি।

(আম্মা বাক্সটার কাছে যায়। ফজল–শাকের নতমুখে নীরব)

একি, বাক্সটার তলাটা খোলা কেন?

শরীফ : কি বলছ মিনুর মা! এ্যাকসিডেন্টে যতটুকু ভেঙ্গেছিল, তার চেয়েও ভাঙ্গা আমার বাক্সটা? তার তলাটা খোলা?

(শরীফ সাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখন ছেলেদের ওপর)

কে ভেঙ্গেছে আমার এ বাক্স?

(ফজল মুখ তুলে তাকায়। শাকেরের দৃষ্টি ফজলের উপর)

ফজল : আমি ভেঙ্গেছি আব্বা।

শরীফ : কেন, কিসের জন্য?

ফজল : দাদাজানের সম্পাদন করা উইলটার জন্য।

(ঘরে সম্পূর্ণ নীরবতা)

ইচ্ছা ছিল – উইলটা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করে এই বাসার অর্ধেকটা আমরা নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়ে তাতে আধুনিক কালের উপযোগী একটা মাল্‌টি–স্টোরিড বিল্ডিং তুলব। বাসার বাকী অর্ধেকটা থাকবে একান্ত আপনারই।

শরীফ : উইলটা পেয়েছিস?

ফজল : না।

শরীফ : ধারণা করছি– আমাকে ও-বাড়ীতে রেখে এ বাসার সব কিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে? কিন্তু উইলটা পাও নি। পাবে না জানি, কারণ তা যেখানে আছে তার সন্ধান জানা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ... এই ছবিটা দেখছ?

ফজল : মন্টুর আম্মার ছবি।

শরীফ : হ্যাঁ, আমার হাসিনার ছবি। তোমাদের বোন, আমার সারা জীবনের বিশ্বাস দিয়ে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল যার মন, তার ছবি। আজ শুধুই ছবি, এক স্মৃতি শুধু! এক স্মৃতিতে পরিণত করেছে তাকে হাসপাতালের ভেজাল বিষাক্ত নাশ্‌তা। তোদের চোখ–ধাঁধানো ভেজাল সভ্যতা আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার হাসিনাকে।

(শরীফ সাহেবের কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে। আম্মা গিয়ে দাঁড়ায় স্বামীর কাছে। নিজেকে সংযত করেন শরীফ সাহেব)

তোমরা একজনও তার মত হতে পার নি। জীবিত থেকেও

www.pathagar.com

আমার কাছে থেকে ধীরে ধীরে সরে গেছ অনেক দূরে। আর আমার হাসিনা মরে গিয়েও এসেছে আমার আরও কাছে। ওরে মন্টু, নানুভাই, একটা চাকু নিয়ে আয় তো!

(মন্টু চলে গিয়ে একটা চাকু নিয়ে আসে)

ফজল-শাকের, আয় – কাছে এসে দ্যাখ্।

(চাকু দিয়ে শরীফ সাহেব ছবিটার কাঁচের ফ্রেম খোলেন, তার নীচে থেকে বের করে আনেন একটা দলিল)

এই সেই উইল। (ফজলকে)নাও, নিয়ে যাও। সবই নিয়ে যাও। আমার কাছে থাকবে হাসিনার এই ছবিটা! যতদিন বেঁচে থাকব, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব আমার মায়ের দু'টি চোখ, তার মমতাভরা মুখ। যে চোখে যে মুখে লেগে আছে মনুষ্যত্বের অক্ষয় ছোঁয়া! দেখছ কি, উইল নাও। মরীচিকার পথে আধুনিক অমানবিক জীবন–ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়।

(এতক্ষণ পর যেন জেগে ওঠে ফজল আহমেদ)

ফজল : উইল আর চাই না আব্বা। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছিঃ জীবন-ধারাকে আমরা পরিবর্তনের পথে ফিরিয়ে আনব। আমাদের বোনের কাছাকাছি পৌছতে চেষ্টা করব আমরা।

(শরীফ সাহেব ও আমার চোখে পানি, মুখে হাসির আভা)

শরীফ : ভেজাল-মেশানো নাশ্তা খেয়ে মরে গেল আমার হাসিনা! সেই দুঃখে চাকরি ছেড়েছি। সেই যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে খাঁটি নাশ্তার ফেরীওয়ালা সেজেছি। হাসিনা যেন রোজ নীরবে স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ আব্বা, ভেজাল-বিষ খেয়ে আর যেন কেউ না মরে।

ফজল : বুঝতে পারছি আব্বা, আমরাও হয়েছি হাসপাতালের রোগী। ভেজাল জীবনে ডুবে যাচ্ছি দিনের পর দিন। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া অমনুষ্যত্বের জীবাণুতে আমরাও আজ আক্রান্ত।

শাকের : অন্ধকার নিশির ডাকে গহীন অরণ্যে মায়ামৃগের পেছনে আমরা শুধু ছুটছি আর ছুটছি! শেয়ার, প্রফিট, ইনভেস্টমেন্ট, ইন্টারেস্ট – টাকা আসছে, বাড়ছে। কিন্তু শান্তি নেই, স্বস্তি নেই!

ফজল : অতীতের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করেছি, বর্তমানের তীব্র চোখ ধাঁধানো আলোয় বিভ্রান্ত করেছি দৃষ্টিকে। সামনের আকাশে নেই কোন স্থির ধ্রুব তারা। বর্তমানের রুক্ষ মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমরা এক অসুস্থ পৃথিবীর অক্ষম সন্তান।

www.pathagar.com

শরীফ : তাহলে বুঝতে পেরেছিস?

শাকের : বুঝতে পেরেছি আব্বা।

শরীফ : তাই তো এই পুরনো বাক্সে তরতাজা খাঁটি নাশ্‌তা নিয়ে এতগুলো বছর ধরে আমি হাসপাতালের গেটে গিয়ে বসি বাপ! চোখের সামনে স্পষ্ট দেখি– সারা পৃথিবী আজ একটি রুগ্ন মানুষের হাসপাতাল। রুগ্ন মানুষগুলো সুস্থ হতে চায়। কিন্তু ভেজালওয়ালাদের জন্য তা পারে না। তোরা আমার এই পুরনো বাক্সটাকে আর অপমান করিস না বাপ, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিস না তোদের এই নিষ্পাপ বোনের ছবিটা থেকে।

মন্টু : আম্মার ছবিটা আমাকে দাও নানুভাই, আমি এটাকে আবার বাঁধিয়ে নেই।

ফজল : আব্বা, ভাঙ্গা বাক্সটাকে আবার আমরা মেরামত করে দেব।

শাকের : এই বাক্সটার অমর্যাদা আমরা আর কোনদিন করব না আব্বা। হাসিনা বু'র ছবিটাতেও আর এতটুকু ময়লা পড়তে দেব না।

(তাহ্‌মিনা আসে। সবাই অবাক)

আম্মা : তুই কার সঙ্গে এলি মিনু?

তাহ্‌মিনা : (লজ্জাজড়িত কণ্ঠে) ওই যে যার কথা তুমি জান, তার সঙ্গে। বাইরের ঘরে বসে আছেন।

আম্মা : (শরীফ সাহেবকে) ওগো, ওই যে একটা কথা তোমাকে বলেছিলাম ... সেই আনযুম ... তাকে এখানে আসতে বলব?

শরীফ : বেশ তো, আনযুম যদি আমার এই টিনের ঘরে আসতে চায়, নিয়ে এস তাকে!

মন্টু : আমি গিয়ে নিয়ে আসি নানুভাই?

শরীফ : তা-ই যাও রে মন্টু। ওদের হয়তো সঙ্কোচ হবে, তুমিই তাকে নিয়ে আসতে পার নিঃসঙ্কোচে। যাও।

(মন্টু চলে যায়)

আনযুম এলে এখান থেকে সবাই গিয়ে বসব আমাদের সেই সবুজ চত্বরে, পুরনো বকুল গাছটার নীচে। গাছে নিশ্চয়ই ফুল ফুটেছে অনেক। চারদিকে ঝরে পড়েছে অনেক ফুল। মৃদু সুবাস ছড়াচ্ছে বাতাসে।

শেষ

www.pathagar.com

সমান্তরাল

চরিত্র-লিপি ঃ

লিলি	ঃ	এক সেলাই–শিক্ষিকা
আরিফ	ঃ	ধনাঢ্য পরিবারের এক যুবক
বাচ্চু	ঃ	লিলির বালকপুত্র
ডাক্তার	ঃ	একজন ডাক্তার
আম্মা	ঃ	আরিফের আম্মা
রুবি	ঃ	” বোন
বড়ভাই	ঃ	” বড়ভাই
আয়েশার মা	ঃ	সেলাই–প্রতিষ্ঠানের সহকারিণী
এবং		
লোক	ঃ	লিলির ছন্নছাড়া স্বামী
ও		
দোকানদার		
লোকজন		

www.pathagar.com

সমান্তরাল

(বস্তিতে একটা বাসার সামনে লোকজনের গুঞ্জরণ)

আলী : এই, এইখানে জটলা করার কোন দরকার নাই। সমস্যা তো মিইটা গেছে।

১ম লোক : হ', সমস্যা শেষ। গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে বাঁইচা গেল মহিলার একমাত্র ছেলে।

আলী : মহিলাও সুন্দরী আর গাড়ীর মালিকও বড়লোকের ছেলে। সুন্দরে সুন্দরে সমঝোতা। আমাগো আর জটলা করার কি আছে?

২য় লোক : আসল সমস্যা কি অখন আরম্ভ হইতে চলল আলী·মিয়া?

আলী : অসম্ভব কিছু না। বড়লোকের খরচায় ডাক্তারও হাজির। কাজেই আমাগো এইখানে থাকার আর কোন মানে নাই। চল।

(লোকজন গুঞ্জরণ করতে করতে চলে যায়)

※

(ঘরের অভ্যন্তর। ঘড়ির টিক টিক শব্দ। বাচ্চু বিছানায় শুয়ে আছে। তার পাশে ডাক্তার, বাচ্চুর মা লিলি; তার অদূরে গাড়ীর মালিক আরিফ)

বাচ্চু : আম্মা —

লিলি : এই তো বাচ্চু, আমি তোমার পাশে। তুমি তো আমাদের বাসায় শুয়ে আছ। ডাক্তার সাহেব, জ্ঞান ফিরেছে।

ডাক্তার : এখন আর ভয়ের কোন কারণ নেই। শক্ পেয়ে সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল – আপনি –

আরিফ : আমার নাম আরিফ।

ডাক্তার : আপনি ঠিক সময়েই আমাকে ডেকে আনলেন। তা নইলে অসুবিধা কিছুটা হতে পারতো। যাক্, এখন আর চিন্তার কিছু নেই।

আরিফ : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আপনার ভিযিটটা—

লিলি : ভিযিট আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

আরিফ : আমাকে আর লজ্জা দেবেন না ম্যাডাম।

www.pathagar.com

ডাক্তার : যদিও দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই, তবু বলি আরিফ সাহেব – গাড়ী চালাবার সময় অন্যমনস্ক হবেন না।

আরিফ : জ্বি – আমি – মানে –

ডাক্তার : এতে শুধু যার এ্যাকসিডেন্ট হল তারই নয়, গাড়ী যিনি চালান তারও জীবন সংশয় হতে পারে।

আরিফ : জ্বি, তা তো বটেই।

ডাক্তার : আচ্ছা তাহলে চলি। কোন চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। ওষুধগুলো আনিয়ে নেবেন। আপনার ছেলে অল্পেতেই ভাল হয়ে যাবে। আচ্ছা আসি।

(ডাক্তারের সঙ্গে আরিফও পা বাড়ায়)

আপনি আর কেন আসবেন আরিফ সাহেব?

আরিফ : না না, এই বাইলেনটা পেরিয়ে আপনাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

(ডাক্তার ও আরিফ বাইরে আসে)

ডাক্তার : আচ্ছা, আপনি এখানে এই বস্তিতে — মানে —

আরিফ : এই এ্যাকসিডেন্টের জন্যই জড়িয়ে গেলাম। কোন পরিচয় ছিল না — গুলশানে আমাদের বাসা। বিজ্‌নেস্ ফার্ম রয়েছে মোতিঝিলে। সেখান থেকে ফেরার পথে —

ডাক্তার : আবারও বলছি – গাড়ী কিন্তু সাবধানে চালাবেন। আজকালকার দিন — এ্যাকসিডেন্টে জড়িয়ে গেলেন এই বস্তির মত জায়গায় — গাড়ীসহ এখনও আপনি অক্ষত রয়েছেন — You are fortunate!

আরিফ : কি করে যে কি হয়ে গেল! মনে হয় – বেশ কিছুটা আপ্‌সেট হয়েগেছি।

ডাক্তার : আচ্ছা, এবার আসি।

(ডাক্তার চলে যায়। আরিফ ফিরে চলে)

※

(ঘরের অভ্যন্তরে)

লিলি : বাচ্চু।

বাচ্চু : আমি গাড়ী চাপা পড়েছিলাম?

www.pathagar.com

লিলি : না না, একটু ধাক্কা লেগেছিল মাত্র। তুমি তো ভালো হয়ে গেছ বাবা। এখন চুপ করে একটু শোও।

বাচ্চু : তুমি আমাকে রাস্তার ওপাশে ফেলে চলে এলে কেন?

লিলি : না বাচ্চু, আমি কি যেন ভাবছিলাম ...... ভুলেই গেলাম তোমাকে হাত ধরে নিয়ে আসতে। তারপর গাড়ীর শব্দ শুনেই আমি ....

বাচ্চু : তোমার কাছে আসার জন্য দৌড় দিতেই ......

লিলি : কথা বলে না বাচ্চু!

বাচ্চু : কি ভাবছিলে আম্মু?

লিলি : হ্যাঁ ..... না না .... মানে ......

বাচ্চু : এত ভাব কেন?

(আরিফ আসে। একটু দূর থেকে বলে–)

আরিফ : বাচ্চু কথা বলছে?

লিলি : বলছিল ..... এখন চুপ করে শুয়ে থাকবে– তাই না বাচ্চু?

আরিফ : ও ঘুমুবার চেষ্টা করুক। আপনি ......

(লিলি আরিফের কাছে আসে)

লিলি : কিছু বলবেন?

আরিফ : আমার অপরাধের যদিও ক্ষমা নেই, তবুও .....

লিলি : না না, এ আপনি কি বলছেন!

আরিফ : আমি কখনো ঠিক এতটা অন্যমনস্ক হই না। আমার জীবনে......

লিলি : এ নিয়ে আপনি এতটা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এমন তো কতই হয়! কত জনই তো কত গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে।

আরিফ : তা হয়তো পড়ে। কিন্তু আমার গাড়ীর সঙ্গে এ্যাকসিডেন্ট এই প্রথম।

লিলি : তাই হয়তো এতটা বিব্রত হচ্ছেন। ও কিছু নয়।

আরিফ : জানি, গাড়ী চাপা দিয়ে অনেকে চলেও যায়। এড়িয়ে যায় রিস্ক্। কিন্তু অন্যের ক্ষতি করে নিশ্চিত হয়ে থাকা আমার ঠিক .... মানে এমনটি আমি ভাবতেও পারি না।

লিলি : এ দুর্ঘটনা আপনি ভুলে যান। তাছাড়া ছেলে তো আমার সেরেই যাবে।

আরিফ : আপনি যতটা সহজভাবে নিচ্ছেন, আমি কিন্তু তা পারছিনে। আপনার যদি কোন আপত্তি না থকে, তাহলে আপনার ছেলে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওর খোঁজ-খবর নেবার অনুমতি আমাকে দিতে হবে। আমার অপরাধ মোচনের এ সুযোগটুকু আপনি নিশ্চয়ই দেবেন আমাকে।

লিলি : আপনি মিছেমিছি এটাকে অপরাধ ভাবছেন। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই।— খোঁজ-খবর নিতে চান নেবেন, কিন্তু অপরাধ মোচনের জন্য নয়।

আরিফ : আজ তাহলে আসি। — জানেন, একটা কথা বারবার আমার মনে পড়ছে। ক্লিনিক থেকে ডাক্তারসহ ওকে বাড়ীতে আনার পর এ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে পড়াপড়শীরা সব আমাকে ঘিরেই ফেলল। আপনার ছেলের এই অবস্থা- তবু আপনি কত সহজভাবে তাদেরকে সরে যেতে বললেন।

লিলি : হ্যাঁ, বললাম। এছাড়া আর কিছু বলতে পারতাম নাকি?

আরিফ : ব্যাপারটা যতই ভাবি, ততই মনে হয় —

লিলি : সাধারণ ঘরে বসবাস করে যেসব সাধারণ মানুষ- তারা আর সব মানুষের মতই ব্যবহার করতে পারে কি করে- তাই না?

আরিফ : বেশ কিছুটা জোরের সঙ্গেই বলতে চাই- মোটেই না। থাক, এবারচলি।

লিলি : শুনুন।

আরিফ : বলুন।

লিলি : বলছিলাম কি, আপনি মিছেমিছি ওর জন্যে কষ্ট করে আর কেন আসবেন।

আরিফ : অন্ততঃ আমার মনে সান্ত্বনার জন্যে। আসি।

(আরিফ বেরিয়ে যায়)

※

(আরিফদের ঘর। রেডিওতে বিদেশী মিউযিক বাজছিল, রুবি তা কমিয়ে দেয়। আম্মা আসে)

আম্মা : রুবি!

রুবি : জ্বি আম্মা!

আম্মা : এত রাতেও আরিফ আসছে না যখন- হয়তো কোথাও আটকে গেছে। ঝিকে বল্ বাবুর্চিকে দিয়ে খাবারগুলো আবার গরম করিয়ে নিক্। পুডিং, ফ্রুট্স্- এসব ফ্রিজে তুলে রাখুক।

www.pathagar.com

রুবি : আপনি আসুন, আমি এখানে রয়েছি আম্মা। — দিন দিন ভাইয়াটার যে কি হচ্ছে! কোথাও কাজে আটকে গেলে ফোনে বলে দিলেই হয়!

(আম্মা চলে যায়। ... সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। আরিফ আসে)

কি ব্যাপার ভাইয়া, তোমার আজ এত রাত হল?

আরিফ : হ্যাঁ রে, রাত কিছুটা হয়েই গেল।

রুবি : এত দেরী করলে কোথায়? বড় ভাইয়া তোমার খোঁজ করছিলেন।

আরিফ : একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

রুবি : তাই নাকি?

আরিফ : ভয়ের কিছু নেই। একটা বাচ্চা ছেলে আমার গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল।

রুবি : তারপর?

আরিফ : ডাক্তারখানা, তাদের বাসা। এখন ভালোই আছে। ওকে ওর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে তারপর এলাম। কিন্তু আমি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিনে।

রুবি : কেন? তুমিই না বললে যে ভালোই আছে এখন।

আরিফ : হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু এ দুর্ঘটনাটা —

রুবি : তোমার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। ভাবনা-চিন্তাতেও । এ্যাকসিডেন্ট তো কতই হচ্ছে। কতজন তো ফেলে রেখেই চলে যায়।

আরিফ : তা যায়। কিন্তু ছেলেটি তার মায়ের একমাত্র সন্তান! আরও সিরিয়াস কিছু হলে — উহ্ ভাবলেও শিউরে উঠতে হয় রে! ধাক্কা লাগিয়ে আমি চলে যেতে পারতাম — কিন্তু —

রুবি : এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে! ডাক্তার দেখিয়েছ, চিকিৎসা করিয়েছ —

আরিফ : তা করিয়েছি, তবে —

রুবি : তবে আবার কি? এতটা যে করেছ, তাই তো অনেক।

আরিফ : সত্যি সত্যি অনেক কিনা তাই তো ভাবছি রে!

রুবি : কিছু টাকাও নগদ দিয়ে এলে পারতে।

আরিফ : ঠাট্টা করছিস! তুই জানিস না রুবি, ছেলেটাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে গিয়ে আমি এক নতুন জীবনের সন্ধান পেলাম। শুধু

www.pathagar.com

সন্ধানই পাই নি, সে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে বড্ড ছোট মনে হল।

রুবি : সে জীবনটা আবার কার?

আরিফ : ওই ছেলেটার মায়ের। রুবি, ভদ্রমহিলার কাছে আমি ক্ষমা চাইলাম।

রুবি : এত কিছু করার পর আবার ক্ষমাও চাইলে? আশ্চর্য।

আরিফ : আমার ক্ষমা চাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আমি অবাক হলাম, ভদ্রমহিলা আমার ওপর একটু রাগও করলেন না। জানিস, পাড়াপড়শীরা আমাকে ঘিরে ধরলো যখন– ছেলের ওই অবস্থা– তবুও ভদ্রমহিলা কত সহজভাবে সবাইকে সরে যেতে বললেন।

রুবি : মনে হয় ভাইয়া, তুমি তিলকে তাল করে ভাবছ।

আম্মা : (একটু দূর থেকে) আরিফ ফিরেছিস বাবা?

আরিফ : জ্বি আম্মা।

আম্মা : (কাছে এসে) তোর এত রাত হল?

রুবি : ভাইয়া একটা এ্যাকসিডেন্ট করেছে আম্মা।

আম্মা : সে কি!

আরিফ : চিন্তার কিছু নেই আম্মা। সব ঠিক হয়ে গেছে।

আম্মা : তুই ব্যথাট্যথা পেয়েছিস?

আরিফ : না। ব্যথা পেয়েছে একটা ছোট্ট ছেলে।

আম্মা : সেজন্যই তো বলি বাবা, গাড়ী চালানোর দায়িত্ব ড্রাইভারের হাতেই ছেড়ে দে। তা আমার কথা তো তুই কানে তুলবি না।

আরিফ : তুমি যা ভাবছ আম্মা – তেমন মারাত্মক কিছুই হয় নি।

আম্মা : আসতে দেরী করছিস বলে আশেক তো খুব চিন্তা করছিল তখন। তোকে নাকি আজ কোথায় যেতে বলেছিল?

আরিফ : জ্বি আম্মা, ওখানে যাওয়ার পথেই তো এই কান্ডটা হল।

আম্মা : কি জানি বাপু, কবে যে তোরা কি করে বসবি কে জানে। হ্যাঁ, কাল সকালেই ডাক্তারের কাছে যা। এ্যাকিসিডেন্ট হলে নাকি হার্টে শক্ টক্ লাগে। এবার তুই খেয়ে নে।

(আম্মা চলে যায়)

আরিফ : কি রে রুবি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, বাবুর্চিকে বল্ খাবারদিতে।

রুবি : বলছি, কিন্তু তুমি এখনো সেই নতুন জীবনের কথাটাই ভাবছ

www.pathagar.com

নাকি?

আরিফ : হুঁম্, অনেকটা তা-ই।

রুবি : কিন্তু তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই ভাইয়া- বয়স তোমার তিরিশ পেরিয়ে গেছে। বহুদিন বিদেশে থেকে এসেছ। কিন্তু এ দেশটা ইউরোপ এমেরিকা নয়। আমি বাবুর্চিকে বলে আসি।

(চলে যায়)

※

(লিলির ঘর। বস্তির নানারকম শব্দ। আয়েশার মা আসে)

আয়েশার মা : লিলি আপা।

লিলি : কি ব্যাপার আয়েষার মা? তুমি হঠাৎ কি মনে করে?

আয়েশার মা : বড় আপা পাঠালেন। আপনি দু'দিন স্কুলে যান নাই। কোন খবরও দিলেন না। বড় আপা বললেন - খোঁজ নিয়ে এস। তাই এলাম।

লিলি : এই ক'দিন আমার একটা বিপদ গেল আয়েষার মা।

আয়েশার মা : ও মা, সে কি কথা! কিসের বিপদ লিলি আপা?

লিলি : বাচ্চুর অসুখ করেছিল। ধাক্কা লেগেছিল গাড়ীর সঙ্গে।

আয়েশার মা : আমরা জানতেই পারলাম না। এখন ছেলে ভালো আছে তো?

লিলি : হ্যাঁ ভালো। আমি কাল থেকেই স্কুলে যাবো।

আয়েশার মা : তা এত বড় একটা ফাঁড়া গেল, আমাদের একটা খবর দিলেও তোপারতেন!

লিলি : খবর কাকে দিয়ে দিই বল!

আয়েশার মা : তাও তো কথা। তাহলে আমি এখন যাই। গিয়ে বলি- আপনি কাল থেকে স্কুলে আসছেন। যাই ক'ন লিলি আপা, ওই বড়লোক গাড়ীওয়ালাদের জ্বালায় আমাদের মত মানুষের পথ চলাদায়।

লিলি : তুমি বড় আপাকে একটু বুঝিয়ে বলো আয়েশার মা।

আয়েশার মা : সে আমি ঠিকই বলবো। আপনার তো বাচাঁমরার কথা গেল। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

(বাচ্চু আসে)

এই তো আপনার বাচ্চু। আসি আপা। (চলেযায়)

বাচ্চু : আম্মু, আমি খেলতে যাবো?

www.pathagar.com

লিলি : আজ না বাবা। বললাম তো, দু'টো দিন যাক। তারপর যত ইচ্ছা খেলবে।

আরিফ : (দূরথেকে) বাচ্চু!

(আরিফ আসে)

লিলি : ও, আপনি! আসুন। খোঁজ নিতে এলেন?

আরিফ : জ্বি। কেমন আছ বাচ্চু?

বাচ্চু : আমি তো সেই কবে ভালো হয়ে গেছি। তবু আম্মু আমাকে বাইরে যেতে দেন না।

আরিফ : তাই নাকি? বাইরে বুঝি তোমার খেলার সাথীরা সব অপেক্ষা করছে? কি ব্যাপার, বাচ্চুকে এমনি করে আটকে রাখছেন কেন?

লিলি : জানেন তো, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

আরিফ : কিসের ভয়? ও, আবার যদি কেউ গাড়ী চাপা দেয়?

লিলি : অসম্ভব কিছুই নয় — আপনি আবার আমার এ-কথায় কিছু মনে করবেন না। যাও বাচ্চু, খেলতে যাও। বেশীক্ষণ বাইরে থেকো না কিন্তু।

বাচ্চু : আচ্ছা। (চলেযায়)

লিলি : সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা। একটা মিনিট যদি ঘরে থাকতে চায়।

আরিফ : স্বাভাবিক। ছেলেমানুষ, খেলতে চাইবে না?

লিলি : কিন্তু একা ঘরে বসে থাকা আমার যে কেমন লাগে, সেটা .....

আরিফ : ভালো কথা, এ-বাড়ীতে আর তো কাউকে দেখি না।

লিলি : আর কেউ থাকলে তো দেখবেন।

আরিফ : আর কেউ থাকেন না? শুধু ......

লিলি : শুধু আমরা দু'জন– আমি আর বাচ্চু।

আরিফ : কিন্তু–

লিলি : বাচ্চুর আব্বা নেই। ওসব কথা থাক্। একটি হতভাগ্য জীবনের কথা না ভাবাই ভালো।

আরিফ : নিজেকে হতভাগ্য বললেন?

লিলি : এ ছাড়া অন্য কোন বিশেষণ আমাকে —

আরিফ : আমার ধারণা কিন্তু অন্য রকম।

লিলি : কি রকম?

www.pathagar.com

আরিফ : আপনি হয়তো শুনে বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু যে জীবনকে আপনি হতভাগ্য বিশেষণে ভূষিত করলেন, তার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ খুবই সম্প্রতি আমি অনুভব করছি।

লিলি : এবারবুঝলাম।

আরিফ : কি বুঝলেন?

লিলি : আপনি কেন এখানে আসছেন।

আরিফ : কেন বলুন তো?

লিলি : ওপর মহলের হাওয়া বহুদিন গায়ে লাগিয়ে এখন হাওয়া বদলের ইচ্ছে হয়েছে।

আরিফ : (হেসে) আপনি আমাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছেন।

লিলি : আমাদের এ-জীবনের সব কিছুকেই বড় করে, কল্পনার রঙ মিশিয়ে দেখছেন আপনি। আসলে ভালো করেই জানেন, এ জীবনটা মোটেই সুন্দর নয়।

আরিফ : তা জানি না। তবে এটা জানি যে এ-জীবন আমাদের জীবনের মত নয়। আমদের জীবনের উন্মুক্ত জৌলুষ এখানে নেই, আছে এক প্রচ্ছন্ন শ্রী। এ-জীবনের ভোরেই একটা মানুষ দ্যাখে না– সব আছে– সব কিছু আছে। এ-জীবনের সন্ধ্যায় দ্যাখে না, সবই আছে– সব কিছুই আছে। কিন্তু আমরা তো দেখি– সকাল সন্ধ্যা অষ্টপ্রহর দেখি। আর দেখি বলেই তথাকথিত আমাদের জীবনকে প্রাণহীন এক কৃত্রিমতারই নামান্তর বলে ভাবি। ভেবে আনন্দ পাই।

(লিলি হেসে ওঠে)

আপনি হাসছেন?

লিলি : হাসির কথাই তো বললেন। কষ্টে তো কোনদিন থাকেন নি। বুঝবেন না – আমাদের এ কষ্টে থাকার জীবনে জ্বালা কত!

আরিফ : কিছু মনে করবেন না– প্রাচুর্যে বোধ হয় কোনদিন থাকেন নি?

লিলি : না– কোনদিনই নয়।

আরিফ : তাই আপনিও বুঝবেন না– প্রাচুর্য মানুষকে কত মারাত্মকভাবে বন্দী করে রাখে। প্রাচুর্যকে আমি পেয়েছি, ইচ্ছেমত ভোগ করেছি, নিঙড়ে পান করেছি তার সমস্ত রসটুকু। এখন আমার চারদিকে ছড়ানো আছে শুধু প্রাচুর্যের ছোবড়া।

লিলি : হবেও বা। আমার পক্ষে তো তা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আরিফ ঃ আপনার কথা থেকে আমি কিন্তু একটা কথা বুঝতে পেরেছি।

লিলি ঃ কি?

আরিফ ঃ প্রাচুর্যে থাকা লোকজনদের আপনি বিশ্বাস করেন না।

লিলি ঃ আমার বিশ্বাস–অবিশ্বাসে কি আসে যায় বলুন। আপনি কল্পনা দিয়ে কোনদিনই ধারণা করতে পারবেন না যে আপনাদের ব্যালকনি থেকে যে-আকাশ আপনারা দ্যাখেন, আর আমার এই জীর্ণ জানালা দিয়ে আমি যে-আকাশ দেখি, তার তফাৎ কতখানি। ...... কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটা কথা আজই বলা দরকার মনে করছি। আপনি যদি আমার এ অসহায় অবস্থা দেখে নিজ উদারতায় করুণা করতে এসে থাকেন, তাহলে আমি অনুরোধ করব – আপনি আর আসবেন না।

(পাশের বাসায় পিয়ানোতে ক্রাশ হয়)

পাশের বাসার আধা-পাগল ছেলেটা কোত্থেকে কিভাবে একটা পিয়ানো যোগাড় করেছে। মাঝে মাঝে বাজাতে চায়।

আরিফ ঃ দেখুন, পৃথিবীর বহু জায়গা আমি ঘুরেছি। দেখেছি, পুরনো সমাজকে বদলে তাকে নতুন করে গড়বার কি প্রচণ্ড আয়োজন! নীচের তলা বলুন আর ওপর মহলই বলুন – সর্বত্রই নতুন জীবনকে পাওয়ার কি আকুল প্রয়াস! আপনি আকাশের কথা বলছিলেন – নতুন জীবনের স্বপ্ন যারা দ্যাখে, তাদের কাছে ব্যালকনির আকাশ আর জীর্ণ জানালার আকাশে কোন তফাৎ নেই।

লিলি ঃ আপনি রুচিবান, স্বপ্নও সুন্দর। তবু আমার মনে হয় এ শুধুই স্বপ্ন!

আরিফ ঃ স্বপ্নের পথেই তো মানুষের অগ্রযাত্রা!

লিলি ঃ সে-স্বপ্নের পথেই কি– যার মোড়কে কথা হয় কথাকলি? যা মানুষকে মিছেই মুগ্ধ করে?

আরিফ ঃ শুধু আমাকে নয়, আপনি আমার স্বপ্নটাকেও বিশ্বাস করতে পারেননা?

লিলি ঃ আপনি কি আহত হলেন?

আরিফ ঃ না। কারণ, আমি বিশ্বাস করিঃ আঘাত জিনিসটা মানুষকে শুধু আহতই করে না, অন্য কিছুও দেয়।

(দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়)

www.pathagar.com

※

(আরিফদের ঘর। পিয়ানোর টুং টাং শব্দ ক্রমে মিশে যায় চায়ের কাপে চিনি মিশানোর চামচের শব্দে)

বড়ভাই ঃ আরিফের কি হয়েছে বল তো আম্মা?

আম্মা ঃ কেন রে?

বড়ভাই ঃ ও তো আজকাল ফার্মের দিকে একেবারেই যায় না।

আম্মা ঃ একেবারেই যায় না?

বড়ভাই ঃ না তো! এভাবে কাজে গাফলতি করলে তো মুশকিল। ফার্মেও যায় না, বাড়ীতেও থাকে না – তাহলে করেটা কি?

রুবি ঃ একটা কিছু তো নিশ্চয়ই করে।

বড়ভাই ঃ ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই ভাল ঠেকছে না।

আম্মা ঃ তাই তো! বাড়ীতে কখন ফেরে তার ঠিক নেই। কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কোথা থেকে যে এত রাতে ফেরে কিছুই বুঝি না।

রুবি ঃ আমি জানি ভাইয়া কোথায় যায়।

বড়ভাই ঃ কোথায়?

রুবি ঃ সেই যে যার ছেলেকে এ্যাকসিডেন্ট করেছিল – তার কাছে।

বড়ভাই ঃ হোয়াট! কি বললি তুই?

আম্মা ঃ রুবি! আয় তো মা – আমার মাথাটা একটু টিপে দিবি।

(দু'জনেই চলে যায়)

বড়ভাই ঃ কিন্তু এটা কি করে হয়! আরিফের রুচি কখনো এত – এটা তো একটা বস্তির মত জায়গা। (আরিফ আসে)

বড়ভাই ঃ এই যে আরিফ, কোথা থেকে এত রাতে ফেরা হচ্ছে শুনি?

আরিফ ঃ তুমি উত্তেজিত হয়ে আছ ভাইয়া। পরে কথা বলবো।

বড়ভাই ঃ ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।

আরিফ ঃ আমি এখন বড্ড টায়ার্ড ভাইয়া। সকালে কথা বলব।

বড়ভাই ঃ শুনছি, আজকাল নাকি কি সব আজেবাজে জায়গায় যাতায়াত শুরু করেছিস?

আরিফ ঃ ভাইয়া, আমি যেখানেই যাই না কেন, নিজের দায়িত্বেই যাই। তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

বড়ভাই ঃ এক আধবার ফার্মে যাবার সময়টুকুও কি মেলে না?

www.pathagar.com

আরিফ : এ ক'দিন যেতে পারি নি। কাল থেকে রেগুলার যাব।

বড়ভাই : ছেলেমানুষিটা ছাড়ো। আমার ঘুম পাচ্ছে, আসি।

(চলে যায়। রুবি আসে)

রুবি : বড়ভাইয়া গেছেন তাহলে? বাব্বা, কি যে ভয় করে!

আরিফ : রুবি, ভাইয়ার কানে এসব কথা গেল কি করে?

রুবি : কথাটা যে গোপন তা তো আমার কাছে বল নি ভাইয়া।

আরিফ : তাহলে তুই-ই বলেছিস?

রুবি : তুমি কোথায় কোন্ বস্তিতে কার না কার কাছে যাবে, আর আমরা বুঝি চুপচাপ বসে থাকবো?

আরিফ : যা বুঝিস না তা নিয়ে মাথা ঘামাসনে। আমার পৃথিবীকে আমারই চোখে দেখতে দে।

রুবি : কিন্তু তুমি তো এখনো সেখানে যাও। আজও নিশ্চয় সেখান থেকেই এলে?

আরিফ : হ্যাঁ, আমি সেই বস্তিতে যাই, আর সেখান থেকে এলামও বটে।

রুবি : কি পাও সেখানে?

আরিফ : যা এতদিন পাই নি এখানে – এই প্রাচুর্যের পাষাণ কারায়।

রুবি : সেটা কি?

আরিফ : এই মাটির পৃথিবীর ছোঁয়া। অনেক রাত হয়েছে। ঘুমুতে যা রুবি।

*

(বস্তিতে সিনেমার গান বাজছে রেডিওতে। বাচ্চু তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছে)

বাচ্চু : কি সুন্দর লাগছে আমাদের ঘর! আম্মু, আজ কে আসবে?

লিলি : না, আসবে মানে – মেহমান আসতে পারে – কতজনই তো আসতে পারে। তাছাড়া ঘরদোর সাজাতে হয় না মাঝে মধ্যে?

বাচ্চু : তোমাকেও খুব সুন্দর লাগছে আম্মা!

লিলি : তুমি অনেক কথা বল বাচ্চু।

বাচ্চু : তোমার হাতে অনেক ফুল – আম্মু, সেই যে গাড়ী আছে যার – সেই লোকটা আমার জন্য লজেন্স নিয়ে আসবে না?

লিলি : (থতমত খেয়ে) বাচ্চু, লজেন্স খেতে খুব মজা – না?

বাচ্চু : হ্যাঁ, আব্বু তো লজেন্স নিয়ে আর আসেই না।

লিলি : (স্বপ্নময় অবস্থায়) বাচ্চু, আমরা যদি এ বাসা ছেড়ে অনেক সুন্দর

www.pathagar.com

একটা বাসায় চলে যাই?

বাচ্চু : খুব ভালো হয়। আব্বু এসে সেখানে যাবে না?

লিলি : (সচেতন হয়ে) হ্যাঁ – যাও তো বাচ্চু, তুমি বাইরে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা কর গে'।

বাচ্চু : এখনই?

লিলি : হ্যাঁ – যাও।

বাচ্চু : আচ্ছা।

(চলে যায়। টেবিলটা ঠিকঠাক করে টেনেটুনে দেয়, টেবিলে ফুলদানী রাখে)

আরিফ : (দূর থেকে) বাচ্চু! ... (কাছে এসে) কি ব্যাপার, আপনি কি বেরুচ্ছিলেননাকি?

লিলি : হ্যাঁ – এই এক জায়গায় একটু ...

আরিফ : বেড়াতেযাচ্ছিলেন?

লিলি : হ্যাঁ ... মানে ... না ... এই ...

আরিফ : চলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

লিলি : না না, থাক। আপনি কেন কষ্ট করবেন? তাছাড়া ...

আরিফ : কি?

লিলি : আপনি আমাকে পৌছে দেবেনই বা কেন?

আরিফ : দিলে কোন ক্ষতি আছে?

লিলি : আপনার ক্ষতি না থাকলেও আমার আছে বৈকি। লোকে ভাববে কি বলুন তো?

আরিফ : আমি ঠিক অতটা ভেবে দেখি নি। ঠিক আছে – থাক। আপনি যান, আমি বরং অন্যদিন আসবো।

লিলি : কিছু মনে করলেন?

আরিফ : কেন বলুন তো?

লিলি : সত্যি কথা বলবো?

আরিফ : আমি তো আপনার কাছে তা-ই আশা করি।

লিলি : তা জানি। কিন্তু সত্যি কথা সবসময়ই কি বলা যায়?

আরিফ : সেটা নির্ভর করে সৎ সাহসের ওপর।

লিলি : দেখুন– কুড়িয়েই পাওয়া যাক, আর দৈবচক্রেই লাভ করা যাক – গরীবের ঘরে মহামূল্য মুক্তার সঞ্চয় অনেক সময় কাম্য হলেও শোভন হয় না। এতে করে মুক্তার দামও কমে, গরীব

www.pathagar.com

আরও গরীব হয়।

আরিফ : দৃশ্যমান মুক্তোর বেলায় কথাটা হয়তো সত্য। কিন্তু যখন তা অদৃশ্য? – বাহ্, ঘরখানা তো সুন্দর সাজিয়েছেন?

লিলি : এ আপনার কাছে সুন্দর লাগলো?

আরিফ : লাগলো। বুঝলাম, দারিদ্রেও মাধুর্য থাকতে পারে।

লিলি : আমি এক মহিলা-প্রতিষ্ঠানে সেলাই শেখাই। সেখানেই যাবো।

আরিফ : ও।

লিলি : আমার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাটা আমি ঠিক দেখাতে চাই নি!

আরিফ : পাছে করুণা করে বসি এই ভয়ে, তাই না?

লিলি : দেবেন পৌছে?

আরিফ : অবশ্যই।

(হঠাৎই দু'জন হেসে ওঠে)

*

(চায়ের দোকানে কাপ-পিরিচ ধোওয়া চলছে)

১ম খদ্দের : ওহে, তোমার দোকানে ভালো সিগারেট আছে? দামী সিগারেট?

দোকানদার : ভাল সিগারেট আছে, কিন্তু কত দাম অইলে দামী অয়, তা ...

১ম খদ্দের : আরে বাপু, গলির মোড়ের পানের দোকান থেকে ওসব নাটুকে কথা মানায় না। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা দামী গাড়ীটার মতই বেমানান লাগে। কিন্তু তোমার কাপ-পিরিচের শব্দ একটু কমাও।

(শব্দ কমানো হয়)

দোকানদার : সা'ব, অনেকগুলি উত্তর আপনের পাওনা অইছে। একে একে কই। দোকানটা গলির মুখে ঠিকই। কিন্তু শুধু পানের না– দোকানটা মুদীর। পান-সিগারেট রাখি আপনাগো মত কুড়ুম পক্ষীরলাইগ্যা।

১ম খদ্দের : কুড়ুম পক্ষী?

দোকানদার : জ্বে। এই যে এক মিনিটের লাইগ্যা কুড়ুম আহেন, তারপর আবার চইল্যা যান – তাগো লাইগ্যা। আশেপাশের বান্ধা গ্রাহকের কাছে দোকানটা মুদীর দোকান। আর আমার জিলাপী

www.pathagar.com

কথাডারে নাটুকে কইলেন। কত দাম অইলে দামী অয় তা কেমনে কমু ক'ন – আপনাগো মত কুড়ুমেরাই তো প্যান্টের পাউছা পকেট থনে টাকা দিয়া সিগারেট কিনে এক প্যাকেট – আগের দিনের একটা বড় খাসীর দাম। সেই খাসী ছোটও অয়, বড়ও অয়।

১ম খদ্দের : তুমি বড্ড বেশি বাজে বকো। ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ আছে?

দোকানদার : হাঁটতে থাকেন, অন্যখানে পাইতে পারেন। বগা খাইবার চাইলে দিতেপারি।

১ম খদ্দের : যতোসবআজেবাজে।

(চলে যায় একটি লোক আসে)

দোকানদার : দিল– আইজকার মতন ব্যাবসার চৌদ্দডা বাজাইয়া দিয়া গেল। এই যে মিয়া সা'ব, আপনেরে দেখতেছি একটু আগের থনেই এইখানে পায়চারি করতেছেন। খালি মনডাই অস্থির – না কিছু চান?

লোক : এ্যাঁ? না– এই এমনি একটু বসে বিশ্রাম করতে চাই।

দোকানদার : তয় এই বেঞ্চিটায় বসেন। ... চা দিমু?

লোক : না ... অ্যাঁ ... হ্যাঁ ... দিন এক কাপ।

(দোকানদার চা বানাতে বানাতে নিজের মনেই বলে –)

দোকানদার : কি ধরনের মানুষ! চিন্তার মধ্যেই ডুইব্যা আছে মনে অয়। কোন ফেরারী আসামী টাসামী কিনা ... আবার দেখি পকেট থনে বিড়ি বাইর করে!

লোক : আপনের দেশলাইটা একটু দেবেন?

দোকানদার : দড়িতে আগুন আছে। এই নেন, চায়ে চুমুক দিয়াই বিড়িডা ধরান।

লোক : এ্যাঁ? ও ... আচ্ছা।

(অদূরে আরিফ ও লিলির কথাবার্তা)

আরিফ : গাড়ীটা তো এ পর্যন্ত আসে না – তাই খানিকটা হাঁটতেই হচ্ছেআপনাকে।

লিলি : খানিকটা কেন, আমাকে তো রোজ সবটুকুই হাঁটতে হয়।

(লোকটার হাত কাঁপছে, তার জন্য চায়ের কাপে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হচ্ছে)

লোক : কে!!

দোকানদার : আরে, আরে! মিয়া সা'ব কি চায়ের কাপটা ভাঙ্গতে চান?

www.pathagar.com

আপনের হাত কাঁপতাছে ক্যান?

আরিফ : কি হল? হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আসুন।

লিলি : আজ আর যাব না। চলুন, ফেরা যাক।

আরিফ : সে কি! কেন?

লিলি : শরীরটা ভাল লাগছে না।

আরিফ : তাহলে ঘরেই চলুন। (ওরা ফিরে যায়)

দোকানদার : এই যে, অবাক হইয়া আছেন যে মিয়া সা'ব! কি বুঝলেন?

লোক : উঁম্?

দোকানদার : আপনে দেখি এক আজব মানুষ। জিগাইলাম, আর শট্কাট্ জওয়াব দিলেন উঁম্ কইয়া? দেখলেন তো? আইলো, খাড়ইলো, আর গেল গা। কিছু বুঝবার পারলেন?

লোক : না তো!

দোকানদার : না বুঝলে বইয়া বইয়া ঝিমান আর খোয়াব দ্যাহেন। ও, ঝিমাইলে তো আবার খোয়াব দেখা যায় না! ... আরে, মর্ জ্বালা! কিছু ক'ন না ক্যান?

লোক : না ... মানে ... খোয়াব ... ইয়ে লিলি ... আচ্ছা, ওই মহিলা বুঝি এখানেই থাকেন? ওঁর বাসাটা ...

দোকানদার : জ্বে। ওই গল্লিতেই। কোন কিছুর সখ থাকলে গিয়া দেখেন – দুইজনে অখন আলাপ লাগাইছে।

(চায়ের কাপ ধোয়ার কাজ চলে)

※

(লিলির ঘর)

আরিফ : হঠাৎ আপনার কি হল বলুন তো? ভাল মানুষ এই বেরুলেন, দু' পা' যেতে না যেতেই শরীর খারাপ হয়ে গেল? – কি, কথা বলছেন না কেন? খুব খারাপ লাগছে? – ও, বুঝেছি।

লিলি : (কিছুটা চমকে ওঠে) কি, কি বুঝেছেন?

আরিফ : ঘর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ আপনার মনে হল যে আমার গাড়ীতে ওঠাটা উচিত হবে না।

লিলি : না না, তা নয়। ... আচ্ছা–

আরিফ : বলুন। থেমে গেলেন কেন?

www.pathagar.com

লিলি : কিছুদিন আগে আপনি বলেছিলেন – বাচ্চু ভাল না হওয়া পর্যন্ত আপনি এখানে আসবেন। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই – বাচ্চু বেশ কিছুদিন হল সেরে উঠেছে।

আরিফ : হ্যাঁ, তা করেছি। কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন বললেন বুঝতে পারলাম না তো। — চুপ করে আছেন, তাহলে কি – ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আসি।

(চলে যায় আরিফ। পাশের বাড়ী থেকে ইটের পুরনো দেয়াল ভাঙ্গার শব্দ ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটি আসে)

লিলি : কে? ও, তুমি?

লোক : হ্যাঁ, আমি। দোকানের বেঞ্চে বসে ছিলাম – দেখলাম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কোথাও যেতে চেয়েও চলে এলে।

লিলি : কেন এসেছ? কি চাও তুমি?

লোক : রাগ করো না লিলি। আমি কিছুই চাইতে আসি নি। আচ্ছা, ওই ভদ্রলোক কে?

লিলি : তা জেনে তোমার কি দরকার? তুমি আমার খোঁজ পেলে কি করে?

লোক : বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না যে তুমি এখানে থাক। বাচ্চু কোথায়?

লিলি : লজ্জা করে না তোমার বাচ্চুর কথা জিজ্ঞাস করতে? চলে যাও এখানথেকে।

লোক : চলে আমি যাব লিলি। আমি তোমার কাছে থাকতে আসি নি। তোমার কাছে থাকবার যোগ্যতা যে আমার নেই, তা আমি জানি।

লিলি : এতই যখন জান, তো দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও। না টাকা চাইতেএসেছ?

লোক : (ম্লান হেসে) না লিলি, টাকা চাইতে আমি আসি নি। দেবার জায়গায় চাওয়া যায় না, তা আমি বুঝি।

লিলি : তোমার এতটুকু লজ্জা করলো না এ বাড়ীতে ঢুকতে? মনে পড়লো না – একদিন আমাকে আর বাচ্চুকে ফেলে চোরের মত পালিয়েছিলে?

লোক : পড়েছিল, সব সময়ই মনে পড়ে। আর লজ্জা? সেই লজ্জায়ই তো মরমে মরে আছি। কিন্তু কেমন যেন এক স্বপ্নের ঘোরে আমি

www.pathagar.com

এখানে চলে এলাম। খুব বেশী দিন আগের কথা তো নয়। অভাবী হলেও সাধারণ এক চাকুরের সাজানো সংসার – তার স্মৃতি মনে জমায় নেশা, জ্ঞানপাপীকেও করে তোলে নেশাখোর।

লিলি : এসব কাব্য–কথা শোনার সময় আমার নেই।

লোক : অথচ বলতে আমার কত আগ্রহ। সেদিন নিজেরই দোষে চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়ে স্ত্রী–পুত্রের সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করি নি। তাই সরে পড়েছিলাম – না না, পালিয়েছিলাম চোরেরমত।

লিলি : আজ কি দেখতে ফিরে এসেছ? অসহায় স্ত্রী-পুত্রের চরম অবস্থা?

লোক : ওই লোকটা কে লিলি? তার সঙ্গে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

লিলি : কিসের দাবীতে এ প্রশ্ন করছো?

লোক : না না, কোন দাবীতে নয়। বলতে পার নেশার কারণেই। ওই ভদ্রলোক খুব বড়লোক – না?

লিলি : হ্যাঁ, খুব বড়লোক। আর কিছু জানবার আছে?

লোক : নাহ্, আর কিছু জানবার নেই। শুধু বাচ্চুকে একবার –

লিলি : এই আশা ছাড়। এবার দয়া করে বেরিয়ে গিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

লোক : তা-ই যাচ্ছি।

(চলে যেতে পা' বাড়ায়)

লিলি : শোন, যে অতীতকে আমি পেছনে ফেলে এসেছি, তাকে আমি ভুলতে চাই। অনেক কষ্টে আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। সে পথে তুমি আমার বাধা হয়ে দাঁড়িও না। অন্ততঃ এটুকু উপকার আমি তোমার কাছ থেকে আশা করি।

লোক : আসি।

(লোকটি চলে যায়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে লিলি)

⁂

(আরিফের কোঠায় দেয়াল ঘড়িতে টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে)

বড়ভাই : আরিফ।

আরিফ : ভাইয়া।

বড়ভাই : তোমার দেয়া কথা তুমি ঠিক রাখতে পার নি। বর্তমানে একা

www.pathagar.com

আমার পক্ষে এতবড় বিজনেস কনসার্ন সামলানো সম্ভব হয়ে উঠছেনা।

আরিফ : আমাকে আরও কয়েকটা দিন সময় দাও ভাইয়া।

বড়ভাই : কিন্তু কেন? লক্ষ্য করছি, দিন দিন তুমি সব ব্যাপারেই ইনডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছ। অথচ কাউকে কিছু বলতে চাও না। ইয়ে — শুনেছ বোধ হয়, আম্মা তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন।

আরিফ : কই না, আমি তো কিছুই জানি না।

(তখনই আম্মা আসে)

আম্মা : আমি তোর কোন কথা শুনবো না আরিফ। এবার তোর বিয়ের ব্যবস্থাকরবোই।

আরিফ : আম্মা!

বড়ভাই : তোমার আপত্তিটা কোথায়?

আরিফ : আমি যদি নিজের পছন্দে বিয়ে করি, তাহলে কি তোমাদের কোন আপত্তি আছে?

বড়ভাই : নো, নট এ্যাট্ অল্।

আরিফ : তাহলে আমাকে আর একটু সময় দাও।

বড়ভাই : মেয়েটি কে?

আরিফ : বলবো, সববলবো।

বড়ভাই : রুবির কাছ থেকে যার কথা শুনেছি – সে?

আরিফ : হ্যাঁ।

বড়ভাই : তোমার জীবন তুমি ইচ্ছামত গড়ে তুলবে, আমার আপত্তি করার কথা নয়। তবে –

আরিফ : সে আমি বুঝি ভাইয়া। সেজন্যেই সময় চাইছি।

বড়ভাই : দেখ আরিফ, দেশ-বিদেশ তুমি ঘুরে দেখেছ। আর মতামতের দিক থেকেও তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তুমি ভেবেচিন্তে যা করবে, তাতেই আমাদের সায় থাকবে। তবু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই – মাটি থেকে উঠিয়ে আনলেও সব গাছই টবে বাঁচে না, আর ঠিক মানানসইও হয় না।

আরিফ : গাছকে যে টবেই বাঁচতে হবে, এমনতো কোন কথা নেই ভাইয়া। মাটির গাছ তো মাটিতেও বেঁচে থাকতে পারে।

বড়ভাই : তুমি প্রপোয করেছ?

www.pathagar.com

আরিফ : না।

বড়ভাই : স্ট্রেঞ্জ! তুমি স্ট্রেট ফরোয়ার্ড হতে পারছো না কেন? অযথা তুমি সময় নিচ্ছ। এমন এক জায়গায় তুমি যাওয়া-আসা করছো যেখানে যেতে বড় রাস্তায় তোমার গাড়ী দাঁড় করিয়ে যেতে হয়। এতে আমাদের –

আরিফ : তাকে যেমনটি ভাবছো, সে তেমন মেয়ে নয় ভাইয়া! তার জীবনে রয়েছে –

বড়ভাই : আই সী! ঠিক আছে, ভাবনা-চিন্তা কর। শুধু মনে রেখো – পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত কোন মানুষই হতে পারে না। সংস্কার এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা কখন কি রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা কেউ আগে থেকে জানতে পারে না। উইশ্ ইউ গুড্ লাক্।

(বড় ভাই চলে যায়)

※

(বস্তির দোকানে রেডিও বাজছে, হঠাৎ তা থেমে যায়)

লিলি : সেদিন মানা করা সত্ত্বেও আজকেও এলে তুমি?

(লিখি দেখে – সেই লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে)

এই শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি – আর কখ্খনও আমার কাছে আসবে না! চলে যাও।

(আরিফ আসে, লোকটি চলে যায়)

এই যে, আপনি!

আরিফ : ওই লোকটা কে? মানে ... যে এইমাত্র চলে গেল? দেখে তো মনে হয় বাজে ধরনের লোক!

লিলি : না না, তা নয়। ও খুবই নিরীহ, অপদার্থ গোছের লোক আর কি! আমাদেরই গ্রামের। চেনে তো, তাই মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতে আসে। আসুন। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম – সেদিন বিদায় নেওয়ার পর আপনি আর আসবেন না।

আরিফ : আমিও ভেবেছিলাম, আর আসবো না। তবুও আসতে হল।

লিলি : কেন?

আরিফ : আমি আর না এলে আপনি খুশী হতেন?

লিলি : খুশী না হলেও অবাক হতাম না। আপনি বোধ হয় নানা ধরনের

www.pathagar.com

স্বপ্ন দখতে ভালবাসেন?

আরিফ : (হঠাৎ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে) লিলি!

লিলি : (গভীর অনুভূতির সঙ্গে) এমন কিছু স্বপ্ন আছে যা বড্ড সংক্রামক – মন থেকে মনে ছড়ায়।

আরিফ : ছড়ায়ই যদি, ক্ষতি কি লিলি?

(তখনই বাচ্চু আসে)

বাচ্চু : আম্মা!

লিলি : (অনেকটা চমকে গিয়ে) কে? ও, বাচ্চু?

বাচ্চু : আম্মা, আমি খেলতে যাচ্ছি।

লিলি : বাসায় ফিরতে দেরী করো না যেন।

বাচ্চু : আচ্ছা। (চলেযায়)

আরিফ : লিলি! আমার স্ত্রী হতে তোমার কোন আপত্তি আছে? – কি, উত্তর দিচ্ছ না?

লিলি : আমি জানতাম।

আরিফ : কি জানতে?

লিলি : একথা একদিন আপনি বলবেন।

আরিফ : এর আগে বলতে চেয়েও বলতে পারি নি। অনেক আশা নিয়েই আজ বললাম। তোমার উত্তর?

লিলি : দূর আকাশের চাঁদ আর মাটির মানুষ! দু'য়ের দূরত্বটা যে সীমাহীন!

আরিফ : কল্পনার সেই চাঁদ যদি মাটিতেই এসে ধরা দেয়, তাহলে?

লিলি : ধরা দিলে তা হবে অস্বাভাবিক। তাই আমাকে আরও ভাবতে দিন!

(আরিফের চোখে জিজ্ঞাসা)

※

(চায়ের দোকানে কাপ–পিরিচের টুং টাং শব্দ)

২য়খদ্দের : আপনের চা-সিগারেটের দোকান তো বেশ ভালাই চলছে মনে অয়।

দোকানদার : বস্তির এই দোকানে আমার এই লাগাত্ আপনে অইলেন গিয়া পাঁচ নম্বর চা খানেওয়ালা। দোকান খুব ভালাই চলছে ক্যামনে

www.pathagar.com

ক'ন?

২য়খদ্দের : আহা — সময় তো আরও আছে, আমার মত আরও কতজন আইবো-যাইবো।

দোকানদার : দোয়া করেন, আর পয়সাটা দেন।

২য়খদ্দের : অখন দিতে একটু অসুবিধা আছে, আইজ সন্ধ্যার দিকে দিয়া যামু।

দোকানদার : আমার একখান কথা শোনেন। আমার বাপজান মরণের আগে কইয়া গেছে : চুরি করা খারাপ, ডাকাতি করা হের থনে খারাপ, হেরও থনে খারাপ অইলো খুন-খারাবি করা। কিন্তু দোকানদারগো লাইগ্যা সব থাইক্যা খারাপ অইতাছে বাকীতে কারবার করা। বুঝলেন মিয়াভাই?

২য়খদ্দের : বুঝলাম তো সবই, কিন্তু –

দোকানদার : এর পরে আর কোন কিন্তু নাই। আর যাই করি, আমার মরা বাপের কথা আমি ফেলাইতে পারুম না। আমার বাপে–

(কৃত্রিম কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

২য়খদ্দের : আরে আরে, কর কি চান মিয়া! তুমি যে এক্কেরে কাইন্দাই অস্থির। ঠিক আছে, আমি না হয় এখনকার মত উঠি। তোমার বাকী আমি পরিষ্কার কইরা যামু। (চলে যায়)

দোকানদার : বাকীর গাহক তো আইজ কাইন্দা খেদাইলাম। এর পরে করুম কি?

(সেই লোকটি আসে)

আরে, অল্প দূরে সেই লোকটা আইসা অমন ছটফট করতাছে ক্যান? এই যে ভাই, এইদিকে শোনেন। আপনেরে দেইখ্যা মনে অইতাছে – কোন কিছুর জ্বালা আপনেরে অস্থির কইরা তুলছে। ব্যাপার কি?

লোক : না না, ব্যাপার কিছু না। মানে — আমাদের গ্রামের একজন এদিকে কোথায় জানি থাকে। এমন লোক – মা–বাপের কোন খোঁজ-খবর নেয় না – আমারই আত্মীয়, তাই –

দোকানদার : পুতে মা–বাপেরে পুছে না, এইডা আর তেমন কি। আরে সায়েব, ওই বস্তিতে থাকে এক মহিলা আর তার ছাওয়াল। কিন্তু স্বামীখান এক ভদ্রলোক হইয়াও পলাতক। চাকরী নাই, রোজগার নাই – তাই পলাইছে। তারে আপনে কোন্ রকমের

www.pathagar.com

মানুষ মনে করেন?

লোক : নিশ্চয়ই সে মানুষ নামের অযোগ্য।

দোকানদার : আপনে ঠিকই কইছেন– সে আবার মানুষ নাকি! আরে, চাকরী না থাকে রিকশা টান, রাস্তায় বইসা ইটা ভাঙ। কিন্তু কথা অইলো ওই যে একটা কথা – ভদ্দরলোক! ওইসব ছোট কাজ তো ভদ্দরলোক অইয়া আর করা যায় না! শুধু বউ-পুলারে অসহায় রাইখা পলাইয়া যাওয়া যায়। – ওই যে দেখেন, কইতে না কইতে ওই পুলাডা আইছে। ... কি চাও বাচ্চু?

(তখনই বাচ্চু আসে)

বাচ্চু : লজেন্স।

লোক : (অস্ফুট কণ্ঠে) বাচ্চু! – এই যে বাবা, শোন।

বাচ্চু : আপনি কে?

লোক : আমি? না না, আমি তোমাগো কেউ না! তোমার মতই আমার এক –

দোকানদার : ওই যে দেখ বাচ্চু মিয়া, তোমাগো সেই বড় লোক আত্মীয় আইসা গেছেন। সেলামালাইকুমস্যার।

আরিফ : ওয়ালাইকুম সালাম। লজেন্স নেয়া হল, এখন বাসায় চল বাচ্চু। আচ্ছা, আপনার দোকানের যে অগ্রিম টাকা দিয়েছিলাম, তা বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। আরও কিছু টাকা রাখুন। (টাকা দেয়) চল বাচ্চু! (চলেযায়)

দোকানদার : হ্যাঁহ্! বুঝলেন, আগের পঞ্চাশ টেকা শেষ না অইতেই আরও পঞ্চাশ টেকা দিয়া গেল। অখন বুইঝা দেখেন, হেই পলাতক ভদ্দরলোক কি ভালা কামখান কইরা গেছেন। বাচ্চুর মায়েরে দোষ দিমু ক্যামনে? নিজের দিন সবেই দ্যাখে। ও মিয়াভাই, আপনে দেখি অখনও তাকাইয়া রইছেন বাচ্চুগো বাসার দিকে!

লোক : আচ্ছা, তার পরিচয় ...

দোকানদার : কইতে পারুম না। (নিম্নকণ্ঠে) এই যে, মহল্লার মাতবরেরা আইতাছে। এইসবকথা থাউক।

(বস্তির মাতব্বরেরা আসে)

আসেন, আসেন আলী ভাই। আপনেরা দল বাইন্ধা যে?

আলী : আইলাম একটা বিষয় নিয়া। আমাগো মহল্লায় ফস্টি-নস্টি একটু বেশী আরম্ভ হইয়া গেছে। আমরা অনেক দিন ধইরা

www.pathagar.com

লক্ষ্য করতাছি – তোমার হাতে টেকা দিয়া যায় ওই রসিক বড়লোক।

দোকানদার : না মানে আমি জিনিস বিক্রি করি –

আলী : থাউক। আমরা কেউর উত্তর শুনতে চাই না। আমরা চাই – এই কিষ্ট-লীলার শেষ হউক। আগামী কাইল শেষ দিন। ওই বড় লোকরে আর ওই মহিলারে তুমি জানাইয়া দিতে পার – আগামী কাইলের মধ্যে ব্যাপার সাফ–সাফিনা দেখতে চাই। নইলে কি কইরা তা সাফ করতে হয়, আমরা তা জানি। চল তোমরা।

সকলে : চল। এই আমাগো শেষ কথা। আগামী কাইল শেষ দিন।

(সবাই চলে যায়)

লোক : (ব্যগ্র কণ্ঠে) ভাই দোকানী। ব্যাপার দেখি খুব গুরুতর।

দোকানদার : গুরুতর অইবো না তো আপনের লাহান উল্লুকের মত খালি চাইয়া থাকবো? সরেন, আইজের মত দোকান বন্ধের আয়োজন করি।

(দোকানের টিনের ঝাপ ফেলার বন্দোবস্ত করে দোকানী)

*

(লিলির ঘরের দরজায় খট্ খট্ শব্দ। লিলি অবাক)

লোক : লিলি। লিলি। দরজা খোল।

(দরজা খুলে দেয় লিলি। সেই লোকটি আসে ব্যস্তসমস্ত হয়ে)

লিলি : ও, তুমি? এ সময়ে কি চাও?

লোক : লিলি। তুমি কাল ভোরেই এ মহল্লা ছেড়ে চলে যাও।

লিলি : চলে যাব। কেন?

লোক : নইলে ওরা তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে।

লিলি : ওরা? ওরা কারা?

লোক : এই মহল্লার মাতব্বর লোকেরা। ওই ভদ্রলোক এখানে আসেন যান – এটা তারা পছন্দ করে না।

লিলি : বুঝেছি – এসব তোমারই কারসাজি।

লোক : না লিলি, না। এই দারুণ সময়ে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর লিলি।

(আরিফ আসে)

www.pathagar.com

লিলি	ঃ	আরিফ সাহেব! আবার এলেন কেন?
আরিফ	ঃ	হঠাৎ আমার সন্দেহ হল – এই লোকটা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার এখানে আসবেই। এসে আমার সন্দেহেরেই প্রমাণ পেলাম। কেন এসেছে এই শয়তানটা? – এই, চলে যাও এখান থেকে, যাও বলছি।
লিলি	ঃ	চেঁচাবেন না, আস্তে কথা বলুন।
লোক	ঃ	(হতাশ কণ্ঠে) ঠিক আছে, আমি চলেই যাচ্ছি।

(চলে যায়)

আরিফ	ঃ	এই লোকটা কেন এসেছিল এখানে?
লিলি	ঃ	আমি যদি জিজ্ঞেস করি – আপনি কেন এ সময়ে এখানে?
আরিফ	ঃ	এসব তুমি কি বলছো লিলি? আমি সব বন্দোবস্ত করেই এসেছি! কালই তোমাকে আর বাচ্চুকে নিয়ে –
লিলি	ঃ	গিয়ে তুলবেন আপনার কোন সাজানো প্রাসাদে? কিন্তু আমি বলছি – না।
আরিফ	ঃ	না? এতদিন পর এ তুমি কি বলছো লিলি?
লিলি	ঃ	এ হল আপনার সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার মতামতেরও তো একটা প্রয়োজনআছে?
আরিফ	ঃ	তবে কি এ বিয়েতে তোমার মত নেই?
লিলি	ঃ	আপনি এখন আসুন আরিফ সায়েব। এখন থেকে আগামী কাল – আমার জন্য একটা চরম সঙ্কট কাল। এ সঙ্কট আমাকে কাটিয়ে উঠতে হবেই। তারই উপর নির্ভর করবে আমার মতামত।
আরিফ	ঃ	চরম সঙ্কট কাল? ঠিক আছে, আমিও প্রস্তুত থাকবো। চলি।

(চলে যেতে চায়। তখনই ব্যস্ত হয়ে আবার আসে সেই লোকটা)

লোক	ঃ	(ব্যগ্র কণ্ঠে) লিলি! বাধ্য হয়েই আমাকে আবার আসতে হল। মহল্লার লোকেরা বলাবলি করছে – আজই তারা এখানে আসবে!
লিলি	ঃ	আজইআসবে?
আরিফ	ঃ	আসুক। আমি তোমার পাশে থাকছি লিলি। কিন্তু তার আগে জানতে চাই – এই লোকটা কে? এর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?
লিলি	ঃ	লোকটা আমার খুবই পরিচিত। খুবই বাজে অথচ নিরীহ

www.pathagar.com

প্রকৃতির লোক। বলা চলে – একজন অসহনীয় অপরাধী। তবুও আমার চরম বিপদের কথা জেনে তা-ই জানাতে সে এখানে বেহায়ার মত ঘুরঘুর করছে। বাকী কথাগুলো বলার আগে ওকে কিছু প্রশ্ন করি। আমার কাছে তোমার কোন দাবী আছে মনে কর?

লোক : না লিলি, দাবী করার থাকলেও তার কোন অধিকার আমার আর আছে বলে আমি মনে করি না। বলতে হবে – দৈবক্রমেই আমাদের দেখা হয়ে গেছে। এই সর্বহারার জীবনে কেন যে এমনটি হল, জানি না। অতীতের স্মৃতি ছাড়া জীবনে আমার কিছুই আর নেই। সেই স্মৃতিও গ্লানিতে ডুবে যাবে – সর্বহারা হয়েও আমি তা সইতে পারবো না। তাই তোমার বিরক্তি সত্ত্বেও আসন্ন বিপদের কথাটা তোমাকে জানাতে এলাম। আরিফ সাহেব যদি তোমার সঙ্কট মোচন করতে পারেন, তাহলে আমি তোমাকে আর বিরক্ত করতে আসবো না।

আরিফ : এবার নিশ্চয়ই তোমার উত্তরের পালা লিলি।

লিলি : এই অযোগ্য লোকটার পাশে আপনাকে অনেক যোগ্য, অনেক সবল বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর থেকেই আমি ভেবে আসছি – সমাজে আমাদের সমান্তরাল অবস্থা কখনও কোথাও এক অবস্থানে মিলিত হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া, মিলিত হোক – তা আমি চাইও না। তাই আপনার প্রতি অন্তরের সবটুকু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে অনুরোধ করবো – আপনি নিজের অবস্থানে ফিরে যান।

আরিফ : শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি – এই লোকটির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক লিলি?

লিলি : এই লোকটিই আমার স্বামী।

আরিফ : আচ্ছা?

লিলি : এই লোকটিও ছিল ভদ্র জীবনের অধিকারী। বেশভূষাও এমন ছিল না। খুব বাজে ধরনেরও ছিল না। ছিল শুধু অলস। আরও একটা অভ্যাস ছিল যা এখনও আছে। সেটা হল নিজেকে চেপে যাওয়ারঅভ্যাস।

আরিফ : আসি মিসেস লিলি। উইশ্ ইউ গুড্ লাক্।

www.pathagar.com

(চলে যায়)

লিলি ঃ এতদিনের জন্য সব ভুলে থেকেও দৈবচক্রের দেখার পর ভুলে থাকতে পারলে না কেন?

লোক ঃ তোমার আর বাচ্চুর চরম অপমান হবে বলে জানলাম যখন – তখন অতীতের সবগুলো দিন আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। জানলাম – কোনদিনই তো আমি ভুলে যাই নি তোমাকে, আমারবাচ্চুকে।

লিলি ঃ আর যখন জানলে – ওই বড়লোকটি দখল করতে চলেছেন তোমার স্থান, তখন একটু হিংসাও এলো না তোমার মনে? জাগলো না এতটুকু পৌরুষ? জাগলো না নতুন করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা?

লোক ঃ. জেগেছিলো লিলি! জেগেছিলো হিংসা, পৌরুষ, নতুন করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। কিন্তু একটা অপরাধ বোধ এসে সব কিছুর গলা চেপেধরলো।

লিলি ঃ মহল্লার লোক এলে সব বুঝিয়ে বলতে পারবে?

লোক ঃ পারবো লিলি, পারবো। তুমি বাচ্চুকে নিয়ে আমার পাশে শুধু দাঁড়িয়েথেকো।

লিলি ঃ বারান্দায় পানি রাখা আছে, হাতমুখ ধুয়ে এসে বাচ্চুর কাছে বস। আমি তোমার গোসলের ব্যবস্থা করি। তারপর নতুন জামা কাপড় পরে একসঙ্গে খেতে বসবো।

(পাশের বাসায় রেডিওতে বেজে ওঠে আনন্দের সুর)

www.pathagar.com

শিমুলতলী নাম

চরিত্র-লিপি ঃ

আরশাদ	ঃ	ঢাকাস্থ এক সরকারী কর্মকর্তা
নফিসা	ঃ	আরশাদের স্ত্রী, বড়লোকের মেয়ে
মণি	ঃ	আরশাদ-নফিসার বালকপুত্র
আহসান চৌধুরী	ঃ	নফিসাদের খালাতো ভাই
রহিমুদ্দিন	ঃ	জমির দালাল
চাচা	ঃ	আরশাদের বৃদ্ধ চাচা
মনুর মা	ঃ	আরশাদের ফুফু
আনু	ঃ	আরশাদের বাল্য বন্ধু
বউ	ঃ	আরশাদের চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী
আমিনা	ঃ	আরশাদের চাচাতো বোন

www.pathagar.com

শিমুলতলী নাম

(সাজানো ড্রইং রুম। কথা বলতে বলতে আরশাদ
ও নফিসা ড্রইং রুমে আসে)

আরশাদ : এত বেলা হল, এখনও পত্রিকা দিয়ে যায় নি নফিসা?

নফিসা : না, এখনও দেয় নি। ... ছুটির দিন বলে কোথাও বেরিয়ে যেয়ো না। মার্কেটে যাব।

আরশাদ : ওই হাতীরপুলের জমিটার ব্যাপারে আজ ফাইন্যাল কিছু বলতে হয়।

নফিসা : ওই জমি রাখবো না।

আরশাদ : সুবিধামত পাওয়া যাচ্ছিল ... তাই ভাবছিলাম ...

নফিসা : সুবিধে যতই হোক, ওই তিন কাঠা জমি কিনে পাখীর বাসা আমি বাঁধতে পারবনা।

আরশাদ : কিন্তু এই ভাড়াটে বাড়ীতে আর কদ্দিন থাকব! মাস মাস ভাড়া যা দিতে হয় ...

নফিসা : কোন বস্তিতে একটা বাসা নিলেই পার। বেশ চলে যাবে।

আরশাদ : তোমার আপাদের মত প্যালেস গড়ে তোলাও তো সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে।

(মণি আসে, হাতে বই)

নফিসা : এই যে মণি! গল্পের বই হাতে যে? কালকের পড়া তৈরী করবে না?

মণি : আজ তো ছুটির দিন আম্মা!

নফিসা : তবু তোমার টেবিলে গিয়ে পড়তে বস।

মণি : বাংলা পড়াটা মাত্র একবার দেখব কিন্তু।

নফিসা : আচ্ছা, তাই দেখ গে'।

(মণি চলে যায়)

আরশাদ : বাড়ীঘর করার জন্য মণির নানা টাকা দিতে চান। সেটা নিতেও তুমি রাজী নও নফিসা!

নফিসা : রাজী নই – কারণ তাতে তোমার গৌরব বাড়বে না।

আরশাদ : কমবেও যে কেন – তা তো বুঝতে পারছি না।

নফিসা : বুঝতে তুমি পারবেও না। তুমি 'আমি' হলে পারতে।

আরশাদ : তা হওয়ার আর উপায় কি। তবে বাপজানের মতামতের তোয়াক্কা

www.pathagar.com

না করেই যেদিন তোমার হাত ধরে নতুন জীবনে পা বাড়াই, সেদিন কিন্তু দু'জন দু'জনের কথা ঠিকই বুঝতাম।

নফিসা : এই সাত সকালে কথা কাটাকাটি করতে আমি চাই না। আমি তো জানি, আপারা আমাদের সম্পর্কে কি ভাবেন।

আরশাদ : খুলে বললে এই বেচারা আরশাদ সাহেবও বুঝতে পারত।

নফিসা : এ-ও খুলে বলতে হবে? আপাদের ধারণা : তোমাদের পরিবারের কথা না ভেবেই, অনেকের মতামত অগ্রাহ্য করেই, যখন আব্বা আমাদের বিয়ে দিলেন, তখন তোমার ধন ও মানের কমতিটা আব্বাই পুষিয়ে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও যাবেন।

আরশাদ : খুবই বিচিত্র ধারণা! আর দশজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংসার চালাবার মত রোজগার আমি করি!

নফিসা : কর, কিন্তু ... যাক। তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি না।

আরশাদ : একেবারে পারছ না – তা নয়। যে পরিবারে যেভাবে বড় হয়েছ তুমি, আমার পক্ষে সেই স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখা সম্ভব নয়। আবার আমার সাধ্যানুযায়ী কিছু করতে চাইলে ...

নফিসা : খুব হয়েছে, এবার থাম। বড় ঘরের মেয়ে হয়ে সেখানে আমি বসে থাকি নি। বড় ঘর যাদের, তাদের কাছেই তা রেখে এসেছি। ... আমার সংসার আর কেউ সাজিয়ে দিক, তা আমি চাই না। আপাদের কি! তারা প্যালেস বানাতে পারে, একটার জায়গায় দু'টো গাড়ী কেন – ঘোড়া-হাতী সব কিছুই কিনতে পারে তারা। দুই দুলা-ভাইয়ের প্রচুর রোজগার। তার উপর গাঁয়ের বাড়ীতেও –

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

দেখ কে এসেছে। (চলে যায়)

আরশাদ : (দরজা খুলে) আরে, আহসান ভাই যে! আসুন।

আহসান : কেমন আছ আরশাদ? নফিসা কোথায়?

আরশাদ : শোন গো, আহসান ভাই এসেছেন।

(নফিসা আসে)

আহসান : হ্যালো মাই সিস্টার! ভাল তো?

নফিসা : অন্য কেউ এসেছে ভেবে আমি আরও চলে গেলাম। আপনারা তো খোঁজ-খবরই নেন না!

আহসান : কাজের পর কাজ লেগেই আছে। সময় করে উঠতে পারি না।

নফিসা : খালাম্মা ভাল আছেন? ভাবী সা'ব?

www.pathagar.com

আহসান : হ্যাঁ, সবাই ভাল। আব্বার মৃত্যুবার্ষিকী। কার্ড দু'টো। একটা তো তোমাদের। আর একটা আলাদাভাবে মণির জন্যে। আমার ছেলে নীলু দিয়েছে মণিকে। ওকে দিয়ো। ফাংশান কিন্তু বাসায় হচ্ছে না। এ্যারেঞ্জ করেছি হোটেল হ্যাভেনে।

নফিসা : বাড়ীতে করলেন না কেন?

আহসান : বাড়ীতে? ওহ্, মাই গড! A horrible experience! দু'মাস আগে একটা ফাংশান হল বাসায়। সময় হতে না হতেই দেখি পঙ্গপালের মত ছুটে আসছে নোংরা সব ছেলেমেয়ে বুড়ো জোয়ান। কি করে খবর পেয়ে মহল্লা ভেঙ্গে চলে এসেছে।

নফিসা : খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ীর ফাংশান — আসবেই তো।

আহসান : সেটাকে এ্যাভোয়েড করার জন্যেই এবার হোটেলে ব্যবস্থা করলাম। তোমরা নিজের মানুষ – যেয়ো কিন্তু।

নফিসা : আগের গাড়ীটা বদলে ফেলেছেন নাকি? নতুন গাড়ী দেখছি!

আহসান : হ্যাঁ, আগের গাড়ীটা বড় ছেলে নিয়ে গেছে। তোমার ভাবীর আবার সর্বশেষ মডেলটা কেনার সখ ছিল। কিনতে হল। চলি আরশাদ।

আরশাদ : আপনি এসেছেন, খুব খুশী হলাম।

আহসান : আসবো না কেন? নফিসা আমার খালাতো বোন। যে কোন অবস্থায়ই থাকুক, আসতেই হবে। চলি। (চলে যায়)

নফিসা : আরে! আহসান ভাই চলে গেলেন, চা-এর কথাও তো একবার বললাম না!

আরশাদ : ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার!

নফিসা : তুমিও তো স্মরণ করিয়ে দিতে পারতে?

আরশাদ : বড়লোক আত্মীয় এলেন, আমি তো অবাক আনন্দে শুধু ভাবছিলাম ...

নফিসা : (গম্ভীর কণ্ঠে) কি ভাবছিলে?

আরশাদ : তোমার খালুজান খান বাহাদুর রহমতুল্লাহ্ চৌধুরীর কথা। যাক, তখন আপাদের শ্বশুর বাড়ীর কথা কি বলছিলে?

নফিসা : বলছিলাম, শ্বশুর বাড়ীতেও কোন কিছুর অভাব নেই।

আরশাদ : খুব বেশী না থাকলেও তোমার শ্বশুর বাড়ীতেও কিছু ছিল। কিন্তু তুমি যে তা চেয়েও দেখলে না!

নফিসা : থাক, থাক। ঘর-বাড়ী আর সয়-সম্পত্তির বিবরণ তো তোমার মুখেই শুনেছি!

www.pathagar.com

আরশাদ : সামান্য হলেও মনে করা উচিত — সেটাই তোমার নিজের।

নফিসা : নিশ্চয়ই সেটাকে নিজের মনে করি!

আরশাদ : কিন্তু কই, তার প্রমাণ তো একবারও দিলে না!

নফিসা : কি প্রমাণ দিতে পারতাম? অস্বীকার করতে পার, মণির দাদা আমাদের বিয়েতে রাজী হতে চান নি? বিয়ে হওয়ার পরেও তিনি একমাত্র ছেলের বউকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি।

আরশাদ : সেটা তোমাদের প্রতি অবজ্ঞায় নয়, ভয়ে। বিয়ের পরেও তা কাটিয়ে ওঠার মত মনোবল বা সামর্থ তাঁর ছিল না।

নফিসা : কিন্তু তাঁর ছেলে যখন একটি মেয়েকে দয়া করে ঘরেই নিয়ে এল, তখন? তোমার বাসাতেও তিনি একবারের বেশী আসেন নি কেন? আমি অযত্ন করেছিলাম?

আরশাদ : অযত্ন কর নি। কিন্তু যে আবদার আর অন্তরঙ্গতার বাতাসে তাঁর মনের মেঘ উড়ে যেতে পারত, তারও খুব প্রাচুর্য ছিল না নিশ্চয়ই!

নফিসা : অন্তরঙ্গতার কোন অভাব যদি অনুভব করে থাক, তবে তা নিজেদের দুর্বলতা আর সন্দেহের জন্য।

আরশাদ : হয়তো বা। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন : তুমি তাঁর কুঁড়ে ঘরে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তোমার শাশুড়ীর কবরটাও একবার দেখে আসতে চাইবে। আর বাপজানের এমনি আশায় আমার মনেরও সায় ছিল।

নফিসা : সায় ছিল যদি, তা প্রকাশ কর নি কেন?

আরশাদ : ভেবেছিলাম, আমার মনের কথা না বললেও তুমি বুঝবে।

নফিসা : ও, কেউ তোমরা বলবে না– অথচ শিক্ষা-দীক্ষার অভ্যাস আর মান-অভিমান ভুলে গিয়ে নতুন বউকেই যেচে গিয়ে শ্বশুরের মনের মেঘ সরিয়ে দিতে হবে? পরিচয় আর পরিবেশের প্রতি মানুষের পছন্দ-অপছন্দ থাকবেই!

আরশাদ : দেখ নফিসা, পরিচয় আর পরিবেশের যে সত্যকে আমি প্রথম থেকেই স্বীকার করে নিয়েছি, বারবার বলে তাকে প্রকট করে তুলো না।

নফিসা : তুমি না হয় আমার জন্য বাপের পর হয়ে গিয়েছিলে – কিন্তু মণি? মণিকে কয়দিন দেখতে এসেছিলেন তার দাদু? নাতিকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার কতটুকু আগ্রহ তিনি দেখিয়েছিলেন?

আরশাদ : মেঘ দেখেও যদি তার বুকের জমাট পানি দেখতে না পাও,

www.pathagar.com

তাহলে বলবার আর কিছু থাকে না। কিন্তু এসব কথা আর নয় নফিসা। বাপজান আজ আর বেঁচে নেই।

(দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ)

তুমি ভেতরে যাও।

(নফিসা চলে যায়। দরজা খুলে দিলে জমির দালাল রহিমুদ্দিন আসে)

আপনি?

রহিমুদ্দিন : নাম রহিমুদ্দিন মিয়া। আপনার শ্বশুর সাহেবের একান্ত অনুগত। উনার বাড়ী থেকেই এসেছি।

আরশাদ : বসুন।

রহিমুদ্দিন : আমাকে আপনার শ্বশুর সাহেবের আশ্রিত বললেও চলে। তাঁরই জামাইয়ের সামনে আমি – রহিমুদ্দিন মিয়া – সোফায় বসব, বড় শরমলাগছে।

আরশাদ : আমার শ্বশুরের সামনে তো আর বসছেন না। আমাকে এতটা শরম না দেখালেও চলবে। বসুন। আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন।

রহিমুদ্দিন : (বসতে বসতে) জ্বি, নাদানের জন্যে বেশী কিছু করতে হবে না। আপনার শ্বশুর সাহেব ডেকে বললেন — রহিমুদ্দিন, তুমি তো আমাদের জন্য অনেক কিছু করলে। এবার আমার জামাইয়ের জন্য কিছু কর। আমি বললাম - হুজুর, আপনার জন্যও আমার জীবন ধরে দিয়েছিলাম, আপনার জামাইয়ের জন্যও জীবন ধরে দিলাম। আপনার শ্বশুর সাহেব বললেন — তা হলে কাজে লেগে যাও। আমি বললাম — জ্বি, আমি লেগে গেছি।

আরশাদ : কাজটা কি?

রহিমুদ্দিন : জমি। মানে নাদান জমির দালালি করে।

আরশাদ : ও!

রহিমুদ্দিন : জ্বি। নতুন নতুন অনেক সাহেবকেই আমি জমি কিনিয়ে দিয়েছি। দালানকোঠা করেছেন তারা। এবার আপনাদের জন্য লেগে গেছি।

আরশাদ : আচ্ছা, আপনি তাহলে জমির দালাল।

রহিমুদ্দিন : নাম রহিমুদ্দিন। ঠিকানা কচুক্ষেত। সেনপাড়া পর্বতার কাছে।

আরশাদ : তা – জমিটাও কি কচুক্ষেতে?

রহিমুদ্দিন : জ্বি না, কচুক্ষেতের পাশেই – মুচীর টেক-এ।

আরশাদ : ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন তো।

রহিমুদ্দিন : জ্বি, বলছি – এই তো আমাদের কাজ। ফাইলটা খুলে নিই। ... এই দেখুন স্যার দলিল। তৌজি ৫৩, মৌজা মুচীর টেক, জমাবন্দী

www.pathagar.com

৯, খতিয়ান নং ১১, দাগ নং ৩১২। আর দলিল দাতা হল গে' শ্রী রমণীমোহন গোয়ালা। সাং মুচীর টেক, ব্যবসা দুগ্ধ বিক্রয়। তারপর দেখুন স্যার – কস্য স্থিতিবান রায়তি জোত স্বত্বের চালা জমি বিক্রয়ের সাফ কবালা দলিল। পত্রমিদং কার্যংচাগে আমি দলিল-দাতা নিম্ন তহশীলভুক্ত ভূসম্পত্তি খরিদা সূত্রে ও পূর্ববর্তীগণ ক্রমে দ্বাদশ বর্ষের বহু উর্ধকাল যাবৎ স্বত্ববান ও মালিক দখলদার নিয়ত থাকিয়া স্থিতিবান রায়তি জোত স্বত্বের ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি।

আরশাদ : খুবই ভাল করছে। তা এই দলিলের দাতা ...

রহিমুদ্দিন : শ্রীরমণীমোহন গোয়ালা নয়, দলিল দাতা হবে শেখ সাদত আলী ব্যাপারী। অর্থাৎ রমণীমোহন গোয়ালার সম্পত্তি কিনেছিল শেখ সাদতআলীব্যাপারী।

আরশাদ : ও! তা আসল কথাটায় ...

রহিমুদ্দিন : আসছি স্যার। সূচনা সম্পর্কে না বললে পরিণতি সম্পর্কে ভাববেন কি করে? এই গোয়ালাদের পিতৃ-পুরুষ ছিল নওয়াব শায়েস্তা খান...

আরশাদ : দেখুন রহিমুদ্দিন মিয়া, নওয়াব শায়েস্তা খানের কাল থেকে যদি চট করে বর্তমান কালে এসে যেতেন, বড় উপকৃত হতাম।

রহিমুদ্দিন : আসার জন্য রওয়ানা তো আমি করে দিয়েছি! কিন্তু স্যার, প্রথম থেকে বুঝিয়ে না বললে আপনি জানবেন কি করে– এই জমির উপর বর্তমান বিক্রেতার স্বত্ব খাঁটি কি না?

আরশাদ : জানব আপনার কথা বিশ্বাস করে! এবং সে বিশ্বাস আমি করেছি।

রহিমুদ্দিন : জ্বি, এই বিশ্বাসই নাদানের একমাত্র মূলধন। খুবই সাধারণ অবস্থার মানুষ ছিলাম স্যার। কিন্তু আপনার শ্বশুর সাহেবের দোয়ায় এই নাদানের তিনতলা দালান আপনাদের মত দশজনের বিশ্বাসের উপরইস্থাপিত।

আরশাদ : আপনার তিনতলা দালান!

রহিমুদ্দিন : চারতলার পারমিশন কিছুতেই দিল না স্যার। বলে, এরোপ্লেন চলার পথে নাকি চারতলার পারমিশন হয় না। যাক, আসল কথা হল : মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে চার পাখি। এবং প্রতি পাখির দাম এই নাদানের কমিশনসহ এক লক্ষ বিশ হাজার। জমিটা একটু নীচু, পানি ওঠে বর্ষায়। তাই দামে এত কম –

www.pathagar.com

একেবারে পানির দামে পাচ্ছেন স্যার।

আরশাদ : জ্বি। তবে পানিটা খুবই গরম মনে হচ্ছে। শ্বশুর সাহেব বুঝি বললেন, ওই কচুক্ষেতের জমি আমাকে কিনতে হবে?

রহিমুদ্দিন : জ্বি, তবে কচুক্ষেতের নয়, মুচীর টেকের। কচুক্ষেতের সব জমিই বিক্রি হয়ে গেছে। আপনার শ্বশুর সাহেব আরও বললেন, আপনারা তিন ভায়রা মিলেই তা কিনবেন। এবং সমান ভাগে।

আরশাদ : আমি যদি না কিনি?

রহিমুদ্দিন : হেঃ হেঃ হেঃ ... তা কি হয় স্যার? আমি যে কাজে লেগে গেছি!

আরশাদ : ভালই করেছেন। এবং আমার অন্য দুই ভায়রার পেছনে লেগে থাকলেই আপনার চলবে। এখন তাহলে আপনি ...

রহিমুদ্দিন : স্কুটার আমি দাঁড় করিয়েই রেখেছি। আমার তো স্যার এই-ই কাজ। আসা যাওয়া, যাওয়া আসা। আসি স্যার, আদাব।

(চলে যায়। মণি আসে, হাতে একটা এলবাম)

আরশাদ : এটা কিরে মণি?

মণি : এলবাম। তোমার অনেক ছবি। আমি দেখব বসে বসে।

আরশাদ : আন্ তো আমার কাছে।

মণি : এটা নাকি তোমার ছেলেবেলার ছবি?

আরশাদ : হ্যাঁ। আর এটা কার ছবি?

মণি : এটা তো আমার! তুমিও আমার মত ছোট ছিলে আব্বু?

আরশাদ : হ্যাঁ, এক সময় তোমারই মত ছোট ছিলাম আমি।

মণি : এটা তোমাদের গ্রামের ফটো?

আরশাদ : হ্যাঁ। আর এটা যে নদী পেরিয়ে আমাদের গ্রামে যেতে হয়, গাছ-গাছালিতে ভরা, তার একটা তীরের ফটো। আর গ্রামটা তোমারও মণি– আমার, তোমার – আমাদের গ্রাম।

মণি : আর এই ফটোটা? যখন তুমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিলে – তখনকার? আম্মা তাই বললেন। আর এটাতো তোমার আর আম্মার ফটো! ... টেবিলের উপর এটা কিসের কার্ড আব্বা?

আরশাদ : ও হ্যাঁ, তোমারও কার্ড আছে। তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড নীলু – তোমার আম্মার খালাতো ভাইয়ের ছেলে – তার আব্বা দিয়ে গেছেন। নীলুর দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী। তারই দাওয়াত।

মণি : (পড়ে) খান বাহাদুর রহমতুল্লাহ্ চৌধুরী ... এটা নীলুর দাদুর নাম? আর কার্ডে ছাপানো ছবিটাও?

www.pathagar.com

আরশাদ : হ্যাঁ।
মণি : আব্বু, আমার দাদুর ছবি নেই?
আরশাদ : না।
মণি : নেই কেন?
আরশাদ : নেই ... মানে ... ছবি তোলা হয় নি।
মণি : আমার দাদুও তো মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে ফাংশান কর না কেন?
আরশাদ : ওদের মত করে করি না। আমি কোরান শরীফ পড়ে এমনিই দোয়াকরি।
মণি : ওরা ফাংশান করে, তুমি কর না কেন?
আরশাদ : করি না ... মানে ... সব কিছুই কি করতে হয়?
মণি : (অন্তরঙ্গ কণ্ঠে) আমার দাদু কেমন ছিলেন দেখতে? নীলুর দাদুর মত?
আরশাদ : না ... মানুষ একজন কি আর একজনের মত হয়?
মণি : আমার দাদু এরকম পোশাক পরতেন?
আরশাদ : কই, না তো।
মণি : দাদুর কি নাম ছিল আব্বু?
আরশাদ : মোহাম্মদ আনসার আলী।
মণি : খান বাহাদুর নয়?
আরশাদ : যাও তো মণি, তুমি ওখানে বসে এলবামের ছবি দেখ গে'।
মণি : আব্বু, আমরা দাদুর বাড়ীতে যাই না কেন?
আরশাদ : মণি, হঠাৎ তোর এত কথা মনে আসছে কেন রে?
মণি : (একটু লজ্জার সঙ্গে) জানি না।
আরশাদ : মণি বাবা, বাড়ী যেতে খুব ইচ্ছে করে বুঝি?
মণি : হ্যাঁ-এ। চল না যাই আব্বু!
আরশাদ : (প্রায় আপন মনে) যাওয়া যেতে পারে একবার। এই গরমের ছুটিতেই যাওয়া যায়। তোদের স্কুলও তখন বন্ধ থাকবে।
মণি : (খুশী হয়ে) তাই চল আব্বু। খুব মজা হবে তাহলে। আচ্ছা, দাদুর বাড়ীতে পুকুর নেই?
আরশাদ : (নিজেকে হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠে) আছে রে মণি, সব আছে। পুকুর আছে, পুকুরে মাছ আছে। আম-জাম-কাঁঠালের গাছ আছে। আরও আছে কত কিছু! জানিস মণি, আমরা তো গাঁয়েই বড় হয়েছি। কত ঘুরে বেড়িয়েছি সেখানে। নানা রকম পাখী – ছোট, বড় – অনেক!
মণি : অনেক পাখী? সব সময় গান গায়?

www.pathagar.com

আরশাদ : হ্যাঁ-এ। এখনকার খবর অত জানি না। তখন তো কত শুনেছি। (কণ্ঠে কিছুটা দুঃখ এনে) এখনো নিশ্চয়ই গায়। পাখী যখন, গান তো গাইবেই।

মণি : আমি কিন্তু পুকুরে নেমে গোসল করব। অনেকবার।

নফিসা : (অল্প দূর থেকে) মণি!

(নফিসা আসে)

আরশাদ : (থতমত খেয়ে কণ্ঠ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে) এ্যাঁ! কি বললি? পুকুরে নেমে গোসল করবে? বললেই হল? ওই পানাপুকুরে ডোবাতে খুব ইচ্ছে করে? ওই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে মন চায় – না?

মণি : (অবাক হয়ে) আব্বু!

আরশাদ : যতসব বাজে চিন্তা। ওসব চিন্তা, ওসব কল্পনা ছাড়। বাড়ী! বাড়ী কি? যাব বললেই হল? নিয়ে যাচ্ছে কে তোমাকে, আর যেতে দিচ্ছেই বা কে? বুঝলে নফিসা, তোমার ছেলের গাঁয়ের সখ জেগেছে।

নফিসা : মণি! খেলা কর গে'। (মণি চলে যায়) ছেলের সখ কি আর আকাশ থেকেনামে!

আরশাদ : মানে? আমাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করছিল ... উত্তর তো দিতে হয় একটা।

নফিসা : দেবে না কেন উত্তর। কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে মণিও তো ভাবতে পারে, আমিই তোমাকে বাড়ী ছাড়া করেছি।

আরশাদ : (পরিবর্তিত কণ্ঠে) মণি এত ছোট যে – এসব কথা তার মনেই জাগবে না।

নফিসা : মণি না হয় ছোট, কিন্তু আমার মনেও কি জাগতে পারে না?

আরশাদ : নফিসা। কখনো কোন আনমনা মুহূর্তের কথা শুনে অন্য কেউ এমনটি ভাবতে পারে। কিন্তু আমাকে এত করে যে জানে, তার তো এমন প্রশ্ন মনে আসা উচিত নয়।

নফিসা : উচিত নয়, তবু শত জানা লোকটিকে আনমনা মুহূর্তে এমনি করে কৈশোরের স্মৃতিচারণ করতে দেখে এ-প্রশ্ন জাগতে পারে না কি? আমাদের জীবনে কোন কিছুতে সুখ-শান্তির অভাব ঘটবে না – এই-ই তো বোধ হয় চেয়ে এসেছি আমিও।

আরশাদ : তা আমি মনে প্রাণে অনুভব করি। পায়ে পায়ে হেঁটে যে পথ আমি পেছনে ফেলে এসেছি, তার স্মৃতি হয়তো আছে আমার। হয়তো

www.pathagar.com

সে-স্মৃতি কোন আনমনা মুহূর্তকে আবেগমুখর করেও তোলে। কিন্তু সেটা যে ফেলে-আসা পথ, এ সম্পর্কে আমি সচেতন। একটু আগে পরিচয় আর পরিবেশের কথা বলছিলে না? জান, কিছুদিন আগে বাপজানকে আমি ঠিক এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলাম।

নফিসা : এসব কথা থাক। রহিমুদ্দিন মিয়া এসেছিল কেন?

আরশাদ : এসেছিল জমির খোঁজ নিয়ে। এক লাখ বিশ হাজার টাকা করে পাখির জমি।

নফিসা : তুমি রাজী হয়েছ নাকি?

আরশাদ : অত টাকা কোথায় পাব? পরিষ্কার 'না' করে দিয়েছি। আরও বছর দুই না গেলে জমি কেনার কথাই ওঠে না। তাছাড়া একসঙ্গে কিনতে হবে দুলাভাইদের সঙ্গে। তাদের জন্য হবে বোধ হয় বাগান বাড়ী।

নফিসা : টাকা থাকলে অবিশ্যি এখনই কেনা যেতো। ঘরবাড়ী তো করতেই হবে আমাদের। দু'বছরে জমির দামও অনেক বাড়বে।

আরশাদ : বাড়লে বাড়বে। বুঝলে নফিসা, ভাবছি – কোন পোড়ো বাড়ী পাওয়া গেলে তখন কিনব। তা দু'বছর পরেই হোক, আর আগেই হোক। গাছগাছালি থাকবে অনেক। অনেক গাছের ছায়ায় ভালই লাগবে।

নফিসা : গাছ তো নতুন জমিতেও লাগিয়ে নেওয়া যায়। বরং তাতে করে সাজানো যায় নিজের ইচ্ছেমত। দুলাভাইরা আগে বাড়ী করে নিক। তারপর আমরা করব নতুন করে।

(অন্য ঘরে ফোন বাজে)

আরশাদ : দেখ, কে কথা বলতে চায়।

(নফিসা চলে যায়। অদূরে রাস্তা দিয়ে বাঁশীর হকার বাঁশী বাজিয়ে চলেছে)

কে? এ সময়ে বাঁশের বাঁশী বাজায়! ... ও, লোকটি বাঁশী বিক্রি করে। খুব বেশী বিক্রি হয় কি? হয়তো পেট চালাবার মত পয়সাই পায় না। তবু ঘুরে-ঘুরে ওই বাঁশীই সে বিক্রি করবে। পাগল ...
(নফিসা আসে) কে ফোন করেছেন নফিসা?

নফিসা : আব্বা।

আরশাদ : কেন, কি বললেন?

নফিসা : রহিমুদ্দিন মিয়াকে নাকি আব্বাই পাঠিয়েছিলেন। তিনি চান, জমিটা আপাদের সঙ্গে আমরাও কিনি।

আরশাদ : কেনার ইচ্ছে তো আমাদেরও আছে। কিন্তু ... তুমি কি বললে আব্বাকে?

www.pathagar.com

নফিসা : বলবার সুযোগই তো পেলাম না। তাঁর ইচ্ছেটা শুধু জানিয়ে দিলেন। রহিমুদ্দিনকে আবার পাঠিয়েদিয়েছেন।

আরশাদ : কিন্তু টাকা? বড়ই মুশকিলে পড়তে হল যে!

নফিসা : এসব ব্যাপারে কোন ডিসিশ্যন নেওয়ার আগে আব্বা আমাদের মতামতই নিতে চান না! আচ্ছা – তোমার অফিস আর বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে একটা বন্দোবস্ত করা যায় না?

আরশাদ : ওসব আমি ভেবে দেখেছি আগেই। কোন সম্ভাবনা নেই।

(দরজায় কড়া নাড়ে রহিমুদ্দিন)

নিশ্চয়ই রহিমুদ্দিন। তুমি ওঘরে যাও নফিসা। ... আসুন।

(নফিসা চলে যায়, রহিমুদ্দিন আসে)

রহিমুদ্দিন : আপনার শ্বশুর সাহেব আবার বললেন – রহিমুদ্দিন, তুমি আবার যাও। আমি বললাম – এক্ষুণি যাচ্ছি হুজুর। তাই স্যার আবার এলাম।

আরশাদ : খুবই খুশী হলাম রহিমুদ্দিন মিয়া। তা আমার শ্বশুর সাহেব কি করতে বললেন?

রহিমুদ্দিন : আপনার শ্বশুর সাহেব বললেন – রহিমুদ্দিন, তুমি গিয়ে জামাই মিয়ার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দু' একটা খবর শুধু জেনে এস।

আরশাদ : বলুন – প্রয়োজনীয় দু' একটা খবর কি?

রহিমুদ্দিন : স্যারের নাম তো জনাব আরশাদ হোসেন?

আরশাদ : জ্বি।

রহিমুদ্দিন : পিতার নাম?

আরশাদ : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনসার আলী

রহিমুদ্দিন : ক'ন কি স্যার! আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনসার আলী?

আরশাদ : হ্যাঁ, তাতে হলো কি?

রহিমুদ্দিন : আমার দাদারও যে ওই নাম ছিল স্যার! তিনিও হজ্ব করেছিলেন। দেখুন দেখি, কেমন মিলে গেল!

আরশাদ : (কিছুটা অপ্রতিভ কণ্ঠে) হ্যাঁ, মিলে গেছে বটে।

রহিমুদ্দিন : (অন্তরঙ্গ কণ্ঠে) বুঝলেন স্যার, আমার দাদা হজ্ব করে এসেও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। খুব ভাল মানুষ ছিলেন তো স্যার, সব সময়ই হাসিখুশী। উনি বেঁচে থাকতেই আমার বড় ছেলের জন্ম হয়। দাদা বলতেন — আমি খুব সুখী রে! ছেলের ঘরের নাতি, নাতির ঘরের পুতি আমি দেখে গেলাম। জীবনে আর চাই কি আমার?

www.pathagar.com

আরশাদ : (গম্ভীর কণ্ঠে) আমার আব্বা হজ্বে গিয়ে সেখানেই এন্তেকাল করেছেন। গতবছর।

রহিমুদ্দিন : (সমবেদনা প্রকাশ করে) আহাহা! এখানেই ঠিক মিলল না স্যার। যাক, জমিটা কি আপনার নামেই কেনা হবে না আম্মাজীর নামে?

আরশাদ : আপনার আম্মাজীর নামে।

রহিমুদ্দিন : তাহলে আর খবরাখবরের প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে এই কথাটি আমার জানবার ছিল। আম্মাজীদের সব খবরই তো আমি রাখি। তার সঙ্গে যোগ হল শুধু আপনার নামখানা। এতেই হয়ে যাবে স্যার, আদাব।

(চলে যায়। নফিসা আসে)

নফিসা : চলে গেল?

আরশাদ : সব কিছুতেই 'হ্যাঁ' বলে গেলাম নফিসা। কিন্তু এইবার?

নফিসা : এত হতাশ হয়ে পড়ছ কেন? টাকার বন্দোবস্ত একটা হবেই। আমার গয়নাগাটি বিক্রি করলেও তো খুব কম হবে না।

আরশাদ : না নফিসা, তা হয় না। দুলাভাইরা জমি দেখতে আসবেন গাড়ীতে চেপে। আমরা না হয় স্কুটারেই গেলাম। কিন্তু আপাদের গহনার ঝিলিক যে তোমার খালি হাতের ওপরই পড়বে এসে বেশী করে।

নফিসা : তাহলে কি করবে? আপারা কিনছেন ...

আরশাদ : তুমিও কিনবে।

নফিসা : কিন্তু কি করে? দেখ তো, কি সঙ্কটেই না পড়া গেল।

আরশাদ : আব্বা হয়তো ধরে রেখেছেন, আমাদের টাকাটা তিনিই দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমরা যে নিতে পারি না, তা তো আব্বা বুঝবেন না।

নফিসা : আব্বার টাকায় জমি কিনলে আপাদের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। তোমার মনে আছে তো, আমাদের বিয়েতে মেঝো দুলাভাই প্রথমে বেঁকেই বসেছিলেন।

আরশাদ : নিশ্চয়ই মনে আছে ... আচ্ছা, একটা প্ল্যান আমার মাথায় এসেছে।

নফিসা : আমারও।

আরশাদ : বল। আমার সঙ্গে মিলে যেতে পারে।

নফিসা : ইস্! তোমার হয়তো প্ল্যানই নেই। আমারটা শুনে নিজের বলে চালিয়ে দেবে।

আরশাদ : বিশ্বাস হয় না? তারচে' বরং নিজের নিজের প্ল্যান আমরা কাগজে

www.pathagar.com

লিখে ফেলি। তারপর মিলিয়ে দেখব। কাগজ নাও। ... (কাগজ নিয়ে দু'জনই লিখতে থাকে) লিখেছ?

.। ঃ হ্যাঁ।

...শাদ ঃ এবারদেখি। ... (দেখে নিয়ে) আরে, দেখেছ – কেমন মিলে গেল?

নফিসা ঃ মিলে গেল তাহলে?

আরশাদ ঃ যাওয়াই তো উচিত। সহধর্মিণীই তো শুধু নও, সহমর্মিণীও যে।

নফিসা ঃ কিন্তু তা কি উচিত হবে? মণির বাপদাদার সম্পত্তি।

আরশাদ ঃ মণির আব্বার-আম্মারও। উচিত হবে না কেন? আমাদের তো আর সেখানে গিয়ে থাকা হচ্ছে না। চাচা দেখাশুনা করছেন। ঘরদরজা খালি থাকে বলে সেখানে থাকছেন এসে আমার এক বিধবা ফুফু। বাড়ীতে যখন কখনো আর থাকাই হচ্ছে না, তখন জমিবাড়ী রেখে অন্যদের পেট ভরিয়ে লাভ কি?

নফিসা ঃ তবু সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন আছে তো।

আরশাদ ঃ ওসব সেন্টিমেন্ট বাদ দাও। যুগই শুধু বদলায় নি, মনও বদলে গেছে মানুষের। জমিবাড়ী কোন কাজেই লাগছে না আমাদের। কাজেই ...

নফিসা ঃ (খুশী হয়ে) আমাদের টাকার যোগাড় হয়ে গেছে – একথা শুনে দেখো, আপাদের মুখ একেবারে কালো হয়ে যাবে।

আরশাদ ঃ তাহলে দু'য়েক দিনের মধ্যেই আমি ঘুরে আসি সেখান থেকে?

নফিসা ঃ একটা চিঠি লিখে দাও আজই। আর মণিকেও সঙ্গে নিয়ে যাও না কেন? ওর তো যাওয়ার খুব সখ!

আরশাদ ঃ হ্যাঁ, তা পারিই তো। ... আচ্ছা, আমার একটা কথা রাখবে নফিসা? বিক্রিই যখন করে ফেলছি সব, তখন তো ওদিককার সম্পর্ক চুকেই গেল। যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে?

নফিসা ঃ না। আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আগেই যখন যাই নি ...

আরশাদ ঃ তাতে কি? বড় জোর ছয়-সাত দিন থাকব আমরা। আমার অনুরোধ, তুমি অমত করো না। আম্মার কবরটা একবার দেখে আসবে।

(নফিসা নীরব)

আমরা দু'জন যাবো – বাকী থাকবে শুধু তুমি। ব্যাপারটা সবার চোখে ধরা পড়বে। তুমিও গেলে ...

নফিসা ঃ মণি, মণি!

(মণি আসে)

www.pathagar.com

মণি : জি আম্মা।

নফিসা : তুমি গাঁয়ের বাড়ীতে যাবে?

মণি : দাদুর বাড়ীতে! (পরম খুশী হয়ে) ও আব্বু!

আরশাদ : তোমার আম্মাকে সঙ্গে নেবে না মণি?

মণি : হ্যাঁ। আমরা সবাই যাব তো!

আরশাদ : এবার তো আমাদের যাওয়া নিশ্চিত নফিসা।

মণি : কিন্তু কবে যাব?

আরশাদ : তিন চার দিন পরেই। (পরক্ষণেই নিজের খুশীকে চেপে ছেলেকে শাসনের সুরে) কিন্তু সাবধান মণি, তোমাকে আগে থেকেই বলে রাখছি – যতদিন থাকব সেখানে, ওই পুকুরে নামতে পারবে না। বনে-জঙ্গলে ঘুরতে পারবে না। গাঁয়ের ছেলেরা গাছে চড়ে আম পাড়ে। কিন্তু খবরদার, আম গাছের কাছে পর্যন্ত নয়। আর গাছে গাছে পাখীর ডাক শুনে অবাক হয়ে ওপরের দিকে চেয়ে থাকবে না। গাছ থেকে কোন কিছু যদি চোখে পড়ে, তাহলে একেবারে কানা। আর পুকুরে মাছ ধরতে যদি বড়শি নিয়ে বসতে দেখি ...

নফিসা : আজই তাহলে চিঠি লিখে দাও, আমরা সবাই যাচ্ছি। আমি রান্নার খোঁজ করি।

মণি : (পরম খুশীতে) ও আব্বু! গাঁয়ে যাব যে!

আরশাদ : (আবেগময় খুশীতে) হ্যাঁ, চারদিন পরেই আমরা গাঁয়ের বাড়ীতে!

মণি : আমাদের গাঁয়ের নাম?

আরশাদ : (সকল মমতা ঢেলে দিয়ে) শিমুলতলী।

দৃশ্যান্তর

(রেলগাড়ীর শব্দ। ... গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে গেলে অনেক পাখীর কলকাকলী শোনা যাবে! পাখীর এই শব্দ চলতে থাকবে। ... আরশাদদের বাড়ীর উঠানে কথা বলছে চাচা ও মনুর মা)

চাচা : মনুর মা, বাড়ীঘর তো সব পয়-পরিষ্কার করাইলাম। ঘর-দুয়ার লেপাপুছাও করানো অইছে। দেখতে তো ভালাই লাগে, কি কও?

মনুর মা : আমরার চউখে তো ভালাই লাগে গো ছোড ভাই। কিন্তু আরশাদ মিয়ার বউ-এর চউখে কেমুন লাগে, হেইডা অইছে আসল কথা।

www.pathagar.com

চাচা ঃ আমরার চেষ্টা আমরা করছি। আমার নিজের ছেলে-জামাইর লাইগা এত পরিশ্রম করতাম না আমি। কিন্তু আরশাদ মিয়ার বউ আইতাছে খালি বাড়ীতে। নিজের বাপ-মাও আর নাই। মায়ের পেটের ভাই-বইন তো আছিলই না। কিন্তু আমি আছি চাচা আর তুমি ফুফু। কাজেই বউ-এর মনে যাতে কষ্ট না অয়, যাতে না ভাবে যে তাগোর কেউ নাই, হের লাইগাই অত কষ্ট। অখন যদি তাগোর চউখে এইসব না ধরে, তয় আর কি করবার পারি কও?

মনুর মা ঃ শোন ছোড’ভাই, তুমি চাচা অইয়া যা করছ, তার তুলনা নাই। অদ্দিন ধইরা জমিবাড়ী দেইখা-শুইনা রাখতাছ। ফয়-ফসল করাইতাছ। আইজকাইলের দিনে এইডা কেউ করে? তোমার তো কোন চিন্তাই নাই গো ছোড ভাই। কিন্তু অপছন্দ অইলে কইবো আমারে। আমি তো তাগোরডাই পইড়া পইড়া খাইতাছি!

চাচা ঃ পইড়া পইড়া খাইতাছ? আর দিনের পর দিন এই বাড়ীঘর রাখ-রক্ষিতা করে কেডা? চাইয়া দেখ, বাড়ী-ঘর চান্দের মত হাসতাছে। যাউক, খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়ও করছি। যদ্দূর পারছি, বাদ রাখি নাই কিছুই। অখন আমরার কপাল!

মনুর মা ঃ এর পরেও পছন্দ না অইলে ভাইবা নিমু যে আমরার কপালই খারাপ। চিকনের চাউল তৈয়ার করা অইলো, পিডা-চিড়ার বন্দোবস্ত করা অইলো, মাছ-গোশতের যোগাড়ও কইরা আনলা! আর বাকী কি?

চাচা ঃ মনুর মা রে! আইজ বড় ভাই আর ভাবী সায়বের কথা জবর মনে পড়তাছে! একটা মাত্র ছাওয়াল এই আরশাদ মিয়ারে লইয়া কত যে সাধ-আহ্লাদ আছিলো, তা তো আমি জানি।

মনুর মা ঃ মেট্রিক পাশের পরে থাইক্যাই ভাবী সায়েব বড় ভাইরে শুধু কইতো – আরশাদরে বিয়া করাইয়া দেইন, বিয়া করাইয়া দেইন। কিন্তু বড় ভাইর এক কথা – আরশাদ আগে বড় অউক, লেখাপড়া শিইখা মানুষ অউখ – বিয়া আমরা করাইতে না পারি, নিজেই কইরা নিব নে।

চাচা ঃ শেষ লাগাত্ বড় ভাইর কথাই ঠিক অইলো! বিয়া তো নিজেই করলো!

মনুর মা ঃ নিজে করলেই এইভাবে করব?

চাচা ঃ চিন্তা কইরা দেখ, ভাবী সায়েব মারা গেছেন পনর বচ্ছরের কম

www.pathagar.com

না। আর গতবার মরছে বড় ভাই। এই এতগুলা বছর বড় ভাই মন খুইলা কথা কয় নাই। খাওয়া-পরায় মন দেয় নাই। তুমি যদি স্বামীর বাড়ীত্ থাইকা এইখানে না আইতা, রাইন্ধা-বাইড়া না দিতা – কিভাবে দিন চলতো তার, কও?

মনুর মা : তবু তো বড় ভাই বউয়ের মুখ দেইখা গেছে। দেইখা গেছে নাতির মুখ। কিন্তু ভাবীসা'ব তো বউ-বউ কইরাই গেল!

চাচা : আসল কথাডা কওনা ক্যান মনুর মা! সবই অইলো, তবু একটা বিরাট ফাঁক থাইকা গেল। ছেলের বিয়া করাইয়া বউ-নাতি লইয়া সাধ-আহ্লাদ করবো – এই তো চাইছিলো বড় ভাই! কিন্তু অত বড় মানুষের মাইয়ারে বিয়া করতে গেল আরশাদ মিয়া যে বড় ভাই শুধু চুপ মাইরাই থাকলো। ছেলের ঘর-সংসার তো তারই ঘর-সংসার। সেইখানে তার বড় গলা শোনা যাইবো না – বড় মাইনষের চাইল-চলতির নীচে পইড়া থাকব বাপের জমা করা আশা – আমরাও তো বুঝি, এইডা বড় ভাইর মন মানতে পারে নাই। ... পারতো, এর পরেও পারতো আরশাদ মিয়া বাপের সাধের সংসার গইড়া তুলতে। কিন্তু ক্যান যে পারলো না!

মনুর মা : এর থাইক্যা তোমার জীবনডা অনেক সুখের। তোমার ছাওয়ালরা লেখাপড়া শিখে নাই, তবু তো ছেলেমেয়ে নাতিনাতকর লইয়া সময় কাডাও।

চাচা : কথা হেইডা না মনুর মা। কথা অইছে বাড়ীত্ আওয়া লইয়া। বাপদাদার ভিটা যে ছাওয়াল ভুইলা যায়, তারে লইয়া আর কথা চলে না। গতবার বড় ভাই যখন হজ্বে যায়, তখন সমস্তডা বাড়ী একলা একলা ঘুইরা ফিইরা দেইখা গেছে।

মনুর মা : মনে তার আগুন জ্বলতাছিল না? নিজের ছাওয়াল থাইকাও নাই। নাতি আছে, অথচ এই বাড়ীঘরও দেখল না একবার।

চাচা : আল্লা'র কাছে বোধ অয় দোয়া চাইছিল বড় ভাই, আর যেন বাড়ীতে তারে ফিরাইয়া না আনে।

আনু : (নেপথ্যে) চাচা আছেন গো, চাচা?

চাচা : আনু মিয়ার গলা না? আছি গো আনু, এইখানেই আইয়া পড়।

(আনু আসে)

আনু : ও চাচা, আমি বড়ইহাটি বইনের বাড়ী থাইক্যা কথাডা শুনলাম। শুইনাই কি খুশী লাগল! বইনডারে কইলাম – আমি আর

www.pathagar.com

একদণ্ডও থাকুম না এইখানে। চইলা আইলাম।

চাচা : অখনো বাড়ীতে যাও নাই বুঝি?

আনু : না, এই তো আইলাম মাত্র। বইনডারে দেখতে গেছলাম। ভালাই আছে। চাচা, শুনলাম – আরশাদ তার পরিবার নিয়া আইতাছে। কবেআইব?

চাচা : আইজই, বিকালের গাড়ীতে।

আনু : তাইলে তো ইস্টিশানে যাওন লাগবো। পাল্কী ঠিক করছেন?

চাচা : হ্যাঁ, ঠিকঠাক আছে সব কিছুই। তুমিও যাইবা নাকি?

আনু : ক'ন কি চাচা, যামু না? তার লাইগাই বইন-ভাইগনা ফালাইয়া আইয়া পড়ছি। আর ইস্টিশানে যামু না?

মনুর মা : এই যে পান খাও আনু। তোমার মনে নাই ছোডভাই, আনু যে আরশাদের ছোডকালের বন্ধু! তখন এক সঙ্গে পড়ছে, তারপরে তো নানান আপদে বিপদে আনুর আর পড়াশুনা অইলো না।

আনু : আমার কথা বাদ দেইন ফুফু। পড়াশুনা কি সকলের কপালে থাকে! কিন্তু আরশাদের গৌরব আইজও আমি করি। বড়ইহাটিতে কথাবার্তা উঠল আরশাদরে নিয়া। আমি কইলাম : আরে – আরশাদ আমার ছোডকালের বন্ধু। চাচা, আসমানে চান তো একটাই উডে গো!

চাচা : হ' বাবা, কইছ ঠিকই। অদ্দিন পরে হেই চান্দের জোসনায় সয়লাব অইবো এই ঘরবাড়ী।

আনু : ফুফু, আরশাদের ছেলের নাম নাকি মণি?

মনুর মা : এই রকমই তো শুনতাছি। দেখি নাই তো দুই চউখে – দেখতে কেমুন জানি অইছে!

আনু : বাবাজীরে আমি নিয়া আইমু কান্ধে কইরা।

মনুর মা : আমার দাদাতো তার মায়ের লগে পাল্কীতে আইবো।

আনু : আরে থোন ফালাইয়া আপনের পাল্কী! আমি আছি কিয়ের লাইগ্যা? বাবাজীর পাল্কী আমার এই কান্ধ।

চাচা : তুমি তো আনু মিয়া নিজে আর বিয়াশাদী করলা না!

আনু : ভালাই আছি গো চাচা। একেবারে স্বাধীন। যখন যারে দেখনের সাধ জাগে, চইলা যাই। আচ্ছা চাচা, বাড়ীত্ যাই, বিকালে ঠিক সময়ই হাজির হমু। আরও মেহ্মান দেখি যে! চাচা, আপনের পুতের বউ আর মুখপোড়া মাইয়াখান।

(বউ ও আমিনা আসে, আনু হাসতে হাসতে চলে যায়)

www.pathagar.com

চাচা : কিরে আমিনা, তোর ভাবীরে লইয়া আইয়া পড়ছস্? বেশ। তোরা আলাপ কর, আমিও উডি। (চলে যায়)

বউ : ফুফুজীরে খুব খুশী লাগতাছে?

আমিনা : কি যে ক'ন ভাবী! খুশী লাগব না? আরশাদ ভাইর বউ আইতাছে, নাতি আইতাছে। ফুফুর তো আনন্দের সীমা নাই!

মনুর মা : ঠিক কথাই কইছস্ রে আমিনা। কিন্তু যার বাড়ীতে আইজ এই খুশীর হাট, হেই তো নাই!

বউ : বউ আইয়া কয়দিন থাকব গো?

মনুর মা : ছয়-সাত দিনের কথা লেখছে। ... আইতাছে যে, এইডাই তো বেশী। একটা মাত্র নাতি। তারেও দেখলাম না আইজ লাগাত্।

বউ : ফুফুজী, আমি বউয়েরে কি কইয়া ডাকবাম?

মনুর মা : ক্যান্, ভাবী ডাকবা। আরশাদ তোমার ভাসুর অয় না?

আমিনা : আমিও তো ভাবী ডাকবাম গো ফুফুজী? কিন্তু যদি রাগ করে?

মনুর মা : রাগের কি কথা? নিজের বাড়ীঘর, নিজের মানুষ। যারে যেডা ডাকনের, ডাকবা না?

বউ : শুনছি, বউ নাকি খুব বড় লোকের মাইয়া। আমরারে কি নিজের মানুষ বইলা মনে করবো?

মনুর মা : ওমা, বাপ বড় লোক আছে – আছেই। অখন তো হে আমরার বউ!

আমিনা : শুনছি, খুব সুন্দরী নাকি। আরশাদ ভাই তো নিজে দেইখা পছন্দ কইরা বিয়া করছে। বউও পছন্দ করছিল আরশাদ ভাইয়েরে। হের লাইগাই তো বড়লোক বাপ বিয়া দিয়া দিছে।

মনুর মা : অত কথা আমি জানি না। তোরা পারছও রে আমিনা, খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া কথা বাইর করতে। এই পছন্দ লইয়াই তো যতসব গণ্ডগোল। যাউক, বউ আইলে কিন্তু এইসব কথা কইতে পারবি না, রাগ করতে পারে।

আমিনা : এইসব কথা অখন শুনলে তো শরম করবো। আমরা কমুই না।

বউ : ফুফুজী, কিছু কাজকাম বাকী থাকলে ক'ন – কইরা দিয়া যাই।

মনুর মা : কামের তো কিছু বাকী দেখি না। দরকার পড়লে ডাক দিমুনে। একটু বও, পান আনি। (ঘরে যায়)

আমিনা : (ফিসফিসিয়ে) ও ভাবী, দুই জন দুই জনরে পছন্দ করলে কি কয়?

বউ : (ফিসফিসিয়ে) জাননের অত সখ ক্যান্? ... ভালবাসা কয়!

(দুইজনেরই চাপা হাসি। গাছে গাছে পাখী ডেকে ওঠে। বেশ কয়েক রকম পাখীর কিচির মিচির)

www.pathagar.com

দৃশ্যান্তর

(গাঁয়ের পথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আরশাদ ও মণি)

আরশাদ : দেখেছ মণি, এই আমাদের গাঁয়ের মাঠ।

মণি : এত বড় মাঠ! অনেক মানুষ খেলা করে বুঝি?

আরশাদ : না, এটা খেলার মাঠ নয়, ফসলের মাঠ। এই মাঠে অনেকের জমি আছে। তারা চাষ করে এতে ফসল ফলায়। এখন তো ফসল নেই। তাই ফাঁকা হয়ে আছে মাঠটা। বর্ষাকালে এলে দেখতে – সারা মাঠে শুধু ধানগাছ আর ধানগাছ! বুঝলে, ধান গাছে সবটা মাঠ তো সবুজ হয়ে যায়! তখন বাতাস বইলে কচি গাছের ঢেউ খেলে যায়, সবুজের ঢেউ! আর ওই যে সামনের গ্রামটা দেখা যায় – ওটা পেরিয়ে গেলেই আমার ফুফুর বাড়ী।

মণি : ওখানে আমরা যাব না?

আরশাদ : আজ নয়, গত সন্ধ্যায় তো মাত্র এলাম।

(আনু আসে)

মণি : আব্বু, সেই যে কালকের লোকটা – আমাকে কাঁধে করে এনেছিল – আনু চাচা – এসে গেছে।

আনু : এই যে! বাপ-বেটা দুইজনই এইখানে? অত সকালে উইঠা গেছ?

আরশাদ : সকাল আর কই! তারপর তুমি কোথায় চললে আনু?

আনু : আমি রওয়ানা করছিলাম তোমাগো বাড়ীতে– বাবাজীর কাছে?

আরশাদ : মণির কাছে! এত সকালে কি দরকার?

আনু : দরকার ... না ... এই কয়ডা আম। অখনো তো ভালা কইরা পাকে নাই ... মণি বাবাজী, এই নেও।

মণি : আমারজন্যে?

আনু : হ্যাঁ, আমার মণি বাবাজীর জন্যে।

আরশাদ : এতসব আম দিলে কেন আনু?

আনু : সব কিছুর উত্তর তুমি জানতা যদি, তবে এদ্দিনেও এই আনুর একটা খবরও লইতা না? মণি, আম খাও একটা।

মণি : খাব আব্বু?

আরশাদ : হ্যাঁ, ওখানে বসে বসে খাও গে'।

(মণি চলে যায়)

গাঁয়ের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে আনু।

www.pathagar.com

আনু : আগের দিনতো আর নাই! মাইনষের অভাব-অনটন অনেক বাড়ছে। মানুষও বাড়ছে অনেক। আরশাদ, মনে আছে তোমার - একবার ওই সামনের খালে ঝোপ্‌ড়া দিয়া মাছ মারতে গেলাম আমরা? তোমার ঝোপ্‌ড়ার নীচে মাছ পড়ছে মনে কইরা হাত দিলা। কিন্তু হাতে লাগল একটা সাপ।

আরশাদ : (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ, মনে আছে। মহা চিন্তায় পইড়া গেলাম দুইজনে। আমি কানতে কানতে কইলাম : আমারে সাপে কাটছে আনু, আমি শেষ!

আনু : (হাসতে হাসতে) আর আমি তো পাগলের মত কান্ধের গামছা বানতাছি তোমার হাতে। হাত যতই টনটন করে তোমার, ততই জোরে বান্ধি আমি।

আরশাদ : শেষে সাপে কাটল কিনা তার পরীক্ষা করার জন্য তুমি ক্ষেত থাইকা কাঁচা মরিচ আনলা কয়েকটা। কইলা : চাবাও।

আনু : হেই মরিচ চাবাইয়া কি দশা তোমার!

আরশাদ : দুই চোখ পানিতে সয়লাব - এত ঝাল।

আনু : আমি তো অবাক! ব্যাপারডা কি?

আরশাদ : কারণ, সাপে কাটল মরিচের ঝাল জিভে লাগে না।

আনু : শেষে ঝোপ্‌ড়া উডাইয়া দেখলাম - একটা মাইট্যা সাপ!

(দু'জনই হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। তারপর শান্ত কণ্ঠে)

আরশাদ : অনেকদিন পর কথাটা মনে পড়ল আনু।

আনু : তুমি তো শহরবাসী। আমরার কথা, ছোড কালের সেই সব ছোড ছোড কথা মনে তোমার পড়বো ক্যামনে।

আরশাদ : না রে আনু, মনে যে পড়ে না, তা নয়। কিন্তু ... আচ্ছা আনু, গাইন বাড়ীতে ওই জঙ্গলের ধারে একটা সিন্দুইরা আম গাছ আছিল না?

আনু : আছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে কাইটা ফেলানো অইছে। আমটাম আর অইতো না।

আরশাদ : একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইজনে আম পাড়তে গেলাম সেইখানে। তুমি কইলা : দুইজনেই বিয়া করুম এই পাকনা আমের রং মিলাইয়া। মনেআছে?

আনু : তুমি তো তাই করছ আরশাদ।

আরশাদ : তুমি ক্যান্ করলা না? শুনছিলাম, বড়ইহাটিতে একটি মেয়ে, সফুরা তার নাম - তারেই তুমি বিয়া করতে চাইছিলা।

www.pathagar.com

আনু : (হাসির আড়াল টেনে) সেই কবেকার কথা তুমি কইতাছ! ... (স্বর নীচু করে) আমার আমগাছই যে শুকাইয়া কাঠ অইয়া গেল। সেই গাছ তো আর নাই! ... জান, চাচাও কাইল এই জাতীয় একটা কথা কইছিল! ... আমি কি উত্তর দিলাম – শুনবা?

আরশাদ : কও।

আনু : কইলাম : এক চান্দেই আসমান উজালা অয় চাচা।

আরশাদ : থাক, থাক। তুমি আইজও আগের মতই রইয়া গেছ! আচ্ছা, ... (সচেতন হয়) আমাকে খাঁ বাড়ীতে যেতে হবে একটু। মণিকে বাড়ী পৌঁছেদিয়েযাব সেখানে।

আনু : ক্যান্, মণিরে আমিই দিয়ে আসি।

আরশাদ : তা-ও হয়। আচ্ছা, অন্য কোথাও দেরী না করে চলে যেয়ো। ওর মা আবার চিন্তা করতে বসবে। আমি আসি। (চলে যায়)

আনু : মণি বাবাজী, ও মণি!

(মণি আসে)

মণি : এই তো আমি।

আনু : আম মিষ্টি?

মণি : খুবমিষ্টি।

আনু : তুমি কাডল খাইছ মণি?

মণি : (অবাক হয়ে) কাডল! কাডল কি?

আনু : ও, না না ... কাডল মানে কাঁঠাল। আমরা তো গাঁয়ের মানুষ! কাডলই কই। খাইবা?

মণি : জ্বি চাচা, কাডল খাব।

আনু : চাচা! আমি তোমার চাচা! কে কইছে?

মণি : আব্বু।

আনু : আহ্! .... কে কইছে, জীবনডা আমার ফাঁকা! এইতো, তুমি আমার মণি বাবাজী, আমার বন্ধুর নয়ন-মণি, আমার চাচা! ... মণি, গাঁয়ের আর কি দেখতা চাও, কও।

মণি : নানারঙের পাখী দেখব।

আনু : পাখী! উড আমার কান্ধে। জঙ্গল ঘুরাইয়া তোমারে দেখাইয়া আনি। দেও, আমগুলি আমার হাতে দিয়া তুমি আমার কান্ধে উড।

(মণিকে কাঁধে উঠিয়ে নেয় আনু। মণি আনুর গলা জড়িয়ে ধরে)

হ্যাঁ, চল।

www.pathagar.com

মণি : কিন্তু আম্মা যে চিন্তা করবেন আমার জন্যে।

আনু : থোও ফালাইয়া চিন্তা। তোমার আম্মা গিয়া দেখ – ঘর সংসারের হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত। চললাম কিন্তু।

(মণিকে নিয়ে আনু চলে যায়)

দৃশ্যান্তর

(ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নফিসা ও মনুর মা কথা বলছে)

নফিসা : আপনাদের এখানে গোসলখানারও কোন বন্দোবস্ত নেই?

মনুর মা : জ্বে না। গোসলের ঘর নাই। তয় একটা জায়গা পরিষ্কার করাইয়া বেড়া দিয়া ঘিইরা রাখা অইছে।

নফিসা : তাতে কি আর গোসলখানা হয়ে যায়? গাঁয়ের এত পর্দার কথা শুনি, এই কি পর্দার ব্যবস্থা?

মনুর মা : আপনেরা যদি বাড়ীতে আইতেন-যাইতেন ... তাইলে ওই সবের ব্যবস্থাও অইতো। গাঁয়ের মাইনষে ওই সব শিখতে পারতো।

নফিসা : মণিরা কোথায় গেল দেখেছেন?

মনুর মা : হে তো তার আব্বার লগে আছিল। পরে আর দেখি নাই তো।

নফিসা : এই হয়েছে আমার মুশকিল। এত নতুন লাগছে আমার কাছে সব কিছু যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। মনে হয়, দম আমার বন্ধ হয়ে আসছে।

মনুর মা : বউ মা গো, দম বন্ধ অইতে চাইলে এই বাতাসে আইয়া একটু খাড়ন। ভালা লাগব।

নফিসা : (বিরক্তির সঙ্গে) বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয় নি আমার। আপনি আপনার কাজ করুন গে'।

মনুর মা : বউ গো, কইতর আনাইয়া রাখছিলাম। আইজ দুপুরের লাইগ্যা কইতরের গোশ্‌তুই রান্ধি?

নফিসা : রাঁধুন গে' আপনাদের যা ইচ্ছে।

মনুর মা : আইচ্ছা যাই।

(চলে যায়। বউ ও আমিনা আসে)

নফিসা : এই, তোমরা কারা? কি চাই তোমাদের? ... কি মুশকিল, বল না কি চাই তোমাদের? ... এরকম হাবার মত তাকিয়ে দেখছ কি?

(বউ ও আমিনা চলে যায়)

www.pathagar.com

আরে, আবার চলে গেল যে! কি রকম মানুষ যে এখানে! চুপ করে এসে দাঁড়াবে, কোন কথা বলবে না, শুধু তাকিয়ে থাকে।

(মনুর মা আসে)

মনুর মা : বউ, ওরা আইছিলো আপনেরে দেখতে। নিজেরার মানুষ। এই তো পাশের হিস্যার। আরশাদ মিয়ার চাচাতো ভাইয়ের বউ একজন, আর একজন বইন। আপনের জাল আর ননদ।

নফিসা : (বিরক্তির সঙ্গে) আমাকে দেখবার কি আছে? আর আসবেই যখন, ঘরে এসে বসলেই হয়! তাছাড়া মুখে কথা নেই কেন, শুধু তাকিয়েতাকিয়ে দেখে।

মনুর মা : কথা কইতে সাহস পায় না, ডরায়।

নফিসা : ডরায়! আমাকে? আমি বাঘ-ভালুক নাকি যে খেয়ে ফেলবো?

মনুর মা : কত বড় ঘরের মাইয়া আপনে! ওরা সাহস পায় না।

নফিসা : খুব হয়েছে, থাক।

(ঘরে চলে যায় নফিসা। মনুর মা কিছুটা অবাক)

দৃশ্যান্তর

(চাচার বাড়ীর উঠান)

চাচা : কি মুশকিল। তোমরাও তো কথাবার্তা কইতে জানো না। বুঝাইয়া কইলেই অইতো যে তোমরা তার নিজের মানুষ। বউ কি গেরামে কোনদিন আইছে নাকি যে, কে কি লাগে তা জানবো?

আমিনা : (ঝাঁঝের সঙ্গে – মুখে যেন খই ফোটে) কওনের সময় দিব তো? আগেই তো ধমকাইতে আরম্ভ করছে! আমরা কি ভিক্ষা করতে গেছিলাম যে এইরকম কইরা তাড়াইয়া দিব?

চাচা : তুই বেশী কথা কস্ আমিনা। বারে বারে কইতাছি : বউয়ে চিনে না, জানে না কাউরে – চিনাইয়া না দিলে কেমনে চিনবো ক'। ধমকাইছে কি কইয়া?

আমিনা : কি কইছে না গো ভাবী?

বউ : (নফিসার কণ্ঠ অনুকরণ করে) কি চাই তোমাদের?

আমিনা : (ভাবীর অনুকরণ করে) হ্যাঁ হ্যাঁ, কি চাই তোমাদের? আরও কি জানি কইছে গো ভাবী?

বউ : (নফিসার অনুকরণ করে) হাবা। তাকিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আমিনা : হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও কত কিছু কইছে। মনে নাই সব।

চাচা : কিন্তু আমি তো বউমার কিছু দোষ দেখতাছি না।

আমিনা : দোষ দেখতেছেন না!

চাচা : না। চিনে না বইলাই কইছে এই রকম কইরা। চিনলে আদর-যত্ন করতো।

আমিনা : আর চিনন লাগবো না।

বউ : আমরা আর গেলে তো!

আমিনা : চলেন ভাবী, আমরা কাজকাম করি গিয়া।

(চলে যায়। আসে মনুর মা)

মনুর মা : ছোডভাই!

চাচা : ও মনুর মা! ওরা এই সব কি কয় রে?

মনুর মা : কয় একেবারে মিছা না। কেউরে চিনে না, জানে না। কি মুশকিল যে অইছে গো ছোড ভাই। আমার সন্দে অয়, বউ খুশী মনে বাড়ীতেআসেনাই।

চাচা : যে ভাবেই আইয়োক, আইছে তো! অখন সব কিছু চিনাইয়া জানাইয়া দেওন লাগবো আমরারই।

মনুর মা : আমি তো চেষ্টা করতাছি। মনে অয়, কোন কথাই শুনতে চায় না আমার।

চাচা : খুবই চিন্তার কথা মনুর মা।

(আনু আসে, সঙ্গে মণি)

আরে আনু মিয়া, কারে লইয়া আইছ তুমি?

আনু : হ্যাঁ হ্যাঁ চাচা, আমারে আপনেরা ক'ন ভবঘুইরা। দেখলেন তো, কার কান্ধে উইঠা বেড়াইয়া আইছে আমার বাবাজী? মণি, তোমার বাপের চাচা, চিন তো? আর এই যে তোমার বাপের ফুফু। এক জনরে ডাকবা দাদা, একজনরে দাদী।

মনুর মা : কত সুন্দর আমার দাদা! যাই, আমার কাম পইড়া রইছে।

(চলে যায়)

মণি : আপনি আমার আব্বার চাচা?

চাচা : হ্যাঁ। আমার ঘরে বাতাসা আছে। খাইবা মণি?

মণি : হ্যাঁ, খাব।

চাচা : খাড়ও, আইনা দেই। (চলে যায়)

আনু : বুঝলা মণিচাচা, আগামীকাইল বৈকালে নিমতলার বাজার।

www.pathagar.com

সেইখানে তোমারে লইয়া যামু।

মণি : নিউ মার্কেটের মত বাজার?

আনু : দূর বেডা বেআক্কল! হেইডা অইল শহরের বাজার। আর এইডা গাঁয়ের। এইডা আমরার বাজার। দেইখো যে কি মজা লাগে!

(মণির মুখে হাসি, আনুর আত্মপ্রসাদ)

দৃশ্যান্তর

(আরশাদদের ঘরের সামনে নফিসা দাঁড়িয়ে। আরশাদ আসে)

নফিসা : তুমি এলে, মণি কোথায়?

আরশাদ : কেন, মণি এখনো বাড়ী আসে নি?

নফিসা : সেটা তুমিই জান। তুমিই সঙ্গে করে নিয়েছিলে। তাহলে কি সে হারিয়ে গেল?

আরশাদ : হারিয়ে যাবে কেন! আমি তাকে আনুর কাছে দিয়ে ও পাড়ায় গিয়েছিলাম। এখনো হয়তো আনু তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নফিসা : আনু কে? ওই যে কালো মত লোকটা?

আরশাদ : হ্যাঁ।

নফিসা : (দৃঢ় কণ্ঠে) মণিকে তুমি এনে দাও। এখখুনি।

আরশাদ : নফিসা।

নফিসা : আমি অন্য কোন কথা শুনতে চাই না।

আরশাদ : আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি বেশী বেশী চিন্তা করছ।

(মণিকে নিয়ে আনু আসে। সঙ্গে কিছু আম)

এই তো মণি!

আনু : মণি চাচা, তোমার আম্মারে আমগুলো চিনাইয়া দিও। কোন্ আম কোন্ গাছের – তা শিখাইয়া দিলাম তো। আর আগামী কাইল যামু নিমতলার হাটে। মনে থাকে যেন।

একজন : (নেপথ্যে) আনু ভাই!

আনু : আইতাছি, রাখ! এইবার আরেকখান জিনিষ আনতাছি মণি চাচার লাইগা। (চলে যায়)

নফিসা : মণি! এস এদিকে। মুখের অবস্থা এরকম কেন? ওই লোকটার সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়েছিলে? কি কি খেয়েছ?

মণি : আম, বাতাসা, কলা।

www.pathagar.com

নফিসা : এত সব খাওয়া হয়েছে? নোংরা হাতের নোংরা করে দেওয়া এসব খেয়েছ তুমি? আর এগুলি কি? ওর কাছ থেকে আম আনবে কেন? দাও, ফেলে দাও।

আরশাদ : আহ্ নফিসা! কি সব করছ?

নফিসা : কারও কথা আমি শুনতে চাই না। মণি আমার একমাত্র ছেলে। এই লোকটা কেন তাকে নিয়ে ঘোরাফেরা করবে? চেহারা দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। মনে হয়, একটা চোর, গুণ্ডা!

আরশাদ : নফিসা, চুপ কর। ও শুনতে পাবে। এই যে আনু ...

আনু : (নফিসার কিছু কথা শুনে দূর থেকে) না ... মানে ... আমি... আরশাদ, এই কাডলডা মণির লাইগা আনাইছিলাম! থাউক, নিয়া যাই।

আরশাদ : আনু, শোন।

(নফিসা ঘরে যায়)

আনু : না ভাই, যাই। আমার ভুল অইয়া গেছিল। বুঝতে পারি নাই। তোমরা মাফ কইরা দিও। ... মণিরে কান্ধে নিয়া আমি বেড়াইছি – আমার জীবন থাকতে মণির কোন ক্ষতি অইতো না। অথচ আমারেই সন্দে করলেন ভাবী সা'ব!

আরশাদ : আনু, আমি তো করি নাই। মণির আম্মা তোমাকে চিনে না তো!

আনু : না না, তা কিছু না। তুমি তখন ছোডকালের কথা কইছো আমার লগে! মনে অইছে, জীবন আমার সার্থক। কিন্তু ভাই, আমি এত নোংরা যে, মণিরে এই কাডলটা দিয়া যাইতেও সাহস পাইতেছি না। আচ্ছা, তুমি ওই চাচার লগে কথা কও, আমি যাই।

(চলে যায়। চাচা আসে)

চাচা : সকালে খাঁ বাড়ীতে গেছ্লা ক্যান?

আরশাদ : কিছু আলাপ ছিল।

চাচা : আমার শোনার মত অইলে কইতে পার।

আরশাদ : আলাপ ... মানে এই জমিজমা নিয়েই কিছু কথাবার্তা ছিল।

চাচা : জমি আরো কিনতে চাও নাকি? আমার কাছে তো এর মধ্যেও কয়েকজন জমি বেচার লাইগা ঘুইরা গেছে। যদি কও, তো আমি তাগোরে খবর দিয়া আনাই।

আরশাদ : না চাচা, জমি কিনতে চাই না।

চাচা : তাইলে?

আরশাদ : চাচা! একটা কথা বলছিলাম ... মানে ঢাকায় বাসা করার জন্য

www.pathagar.com

জমির বন্দোবস্ত করছি। অনেক টাকার দরকার। এখানে এসে থাকা তো আমাদের আর সম্ভব নয়। তাই ঠিক করেছি, এখানকার জমিবাড়ী বিক্রি করে দেব।

(কথাটা শুনে থ' বনে যায় চাচা)

চাচা : সব কিছু বেইচা দিবা?

আরশাদ : হ্যাঁ, আপনি যদি রাখতে পারেন তো সবচে' ভাল হয়। নিজেদের মধ্যেই জমিবাড়ীটা থেকে যায়। (চাচা নীরব) সবটা যদি রাখতে না পারেন, কিছুটা আপনি রাখুন। বাকীটার জন্য অন্য জায়গায় কথাবার্তা বলি। কি হল চাচা? কথা বলছেন না যে!

চাচা : (ম্লান হেসে) কি কথা আর কমু! সব কথা যে আমার শেষ অইয়া গেল। ভাবীসা'ব-বড়ভাই আইজ থাকলে ... মানে ... বাপ-দাদার ভিটা ...

আরশাদ : কিন্তু গাঁয়ে এসে আমরা তো আর থাকতে পারছি না। শহরে একটা ঠাঁই-ঠিকানা করতে হবে না?

চাচা : তা তো অইবোই! কিন্তু তোমার বাপ-দাদার ঠিকানাটা ... আচ্ছা, তুমি অখন বড় অইছ, বুঝমান অইছ। তুমি যা বুঝবা, তাই তো করবা বাবা। আমি যাই।

(দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যায়)

আরশাদ : বুঝতে পারছি – জমি বিক্রির কথায় চাচা বিরক্ত। কিন্তু আমি এ ছাড়া আর কি করতে পারি! (চলে যায়)

দৃশ্যান্তর

(চাচার বাড়ীর উঠান। চাচা মোড়ায় বসে আছে। মনুর মা পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে)

মনুর মা : তুমি যে কথা কইলা ছোডভাই, তা যে মাথায় বাজ পড়নের মত। আরশাদ জমিবাড়ী বিক্রি কইরা দেওয়ার লাইগাই বাড়ীতে আইছে?

চাচা : এ ছাড়া আর কি কওয়া যায়!

মনুর মা : এই সর্বনাশের কথা শুইন্যাও তুমি চুপ কইরা রইলা?

চাচা : এই কথা শোনার পর কি আর কমু কও?

মনুর মা : ক্যান, জমিবাড়ী বিক্রি করবো আর আমরার মতামত নিবো না?

চাচা : না, আমরা কে? লেখাপড়া জানি না। নেহায়েত চাচা ডাকে, ফুফু

www.pathagar.com

ডাকে ... আমরা মনে করি, চাচা-ফুফুই আছি আমরা। কিন্তু দেখা গেল, লেখাপড়া শিখলে সব বদলিয়া যায় মনুর মা। খাঁয়েরাই জমিবাড়ী কিনব।

মনুর মা : জমিবাড়ীতে আমরার অংশ নাই? বেচবো যে, আমরার দস্তখত লাগবো না? বড়বু'র দস্তখত লাগবো না? ভাইয়েরা আছিল, আমরা জমিতে দাবী-দাওয়া তুলছি না। ভাইয়ের জায়গায় ভাতিজা, তার জায়গায় নাতি। দাবী আমরা তুলতামও না কোনদিন। কিন্তু আরশাদ যখন সব শেষ কইরাই দিবো, তখন আমরা চুপ কইরা থাকবো ক্যান?

চাচা : মনুর মা, কথাডা বুইঝা দেখ। এইডা অংশ বাইর কইরা নেওয়ার কথা না। কথা অইছে, বাপ-দাদার ভিটা হাতছাড়া করার। হাতছাড়াই যদি অইয়া যায়, বাপদাদার ভিটায় যদি অন্যের বসত করাই আরম্ভ অয়, তাইলে তোমরার অংশ বাইর কইরা নিলেও অন্যেরা বসত করবো, না নিলেও করবো।

মনুর মা : তাইলে কি করতে কও তুমি?

চাচা : চুপ কইরা সব দেইখা যাও। আর যদি সইতে না পার তাইলে কাইন্দা কাইন্দা চইলা যাও নিজের স্বামীর ভিটায়। যদি মনে কর, হেইখানে তোমার সুখ অইবো না, আমার হিস্যায় আইয়া পড়। আমার দিন যদি চলে, তোমারও চলবো।

মনুর মা : এদ্দিন তাইলে আমি বান্দী অইয়া আছলাম তার বাড়ীতে?

চাচা : এইসব কুকথা কইওনা মনুর মা। আমি তুমি মনে আঘাত পাইমু বইলা সে এই কাম থাইক্যা ফিরবো? তাইলে বড় ভাইর বুকে শেল বসাইলো ক্যান্?

(অদূরে আনুর চিৎকার)

অদূরে আনু : দিমু, সব শেষ কইরা দিমু। দুনিয়াই গয়রত কইরা দিমু!

চাচা : কে? চীৎকার করে কে?

মনুর মা : আনুর গলা শোনা যায়।

চাচা : কি অইছে? দেখি তো! (চলে যায়)

মনুর মা : (আপন মনে) কিয়ের মধ্যে কি অইলো। কত আশা কইরা ঘরবাড়ী সাজাইলাম ... ভাবলাম, অদ্দিন পরে বউয়ের সুমতি অইছে। ওমা, তারা বাড়ীতে আইছে জমিজমা বেচনের নিয়তে।

(আনুকে নিয়ে চাচা আসে)

www.pathagar.com

চাচা : এই সামান্য কথা থাইকা এই রকম ক্ষেপামি করে মাইন্‌ষে? কাডলের দাম চাইছে, চাইবোই তো।

আনু : চাইবো তো হাইসা দিলো ক্যান? বুঝি না, আমারে ঠাট্টা করে। কাডল দিতে গিয়া ফিইরা আইছি, হের লাইগা ঠাট্টা — বুঝলা চাচা!

চাচা : এইখানে একটু বইয়া জিরাও।

আনু : (রাগে) না, আমার জিরান লাগব না। আমি পাগল অইয়া যাই নাই। কিন্তু কাডল লইয়া আমারে ঠাট্টা করল ক্যান? দেখি। (চলে যায়)

মনুর মা : মারামারি করব নাকি?

চাচা : না, কাডলের লোক ব্যাপার বুইঝা চইলা গেছে কোন্ সময়। আসলে মনে লাগছে মণির আম্মার একটা কথা, তাই পাগলামী করতাছে। মাথায় একটু ছিট তো আছেই।

মনুর মা : ছোড ভাই, একটা কথা জিগাই। বড় ভাই বাক্সের একটা চাবি আমার কাছে দিয়া গেছিল। এই চাবি বউয়েরেই দেওনের কথা। দিয়া দেই অখন?

চাচা : কিয়ের চাবি?

মনুর মা : ভাবীসা'ব আরশাদের লাইগা, বউয়ের লাইগা, নাতির লাইগা রাজ্যের জিনিষ যোগাড় কইরা বাক্সবন্দী কইরা থুইছিল। ভাবীসা'ব মারা যাওয়ার পরে হেই চাবি আছিল বড় ভাইর কাছে। বড় ভাই দিয়া গেছে আমারে। কইয়া গেছে : বউ কোনদিন বাড়ীতে আইলে তার শ্বাশুড়ীর এই চাবিডা যেন দেই বউয়েরে।

চাচা : তাইলে দিয়া দেও।

মনুর মা : সব যখন শেষ অইয়া গেল, তখন চাবি আর রাখি ক্যান? যার চাবি, তারেই দিয়া দেই।

(মনুর মা চলে যায়। চাচা মাথা নীচু করে)

দৃশ্যান্তর

(আরশাদদের ঘরের সামনে)

নফিসা : কি বলতে চান, একটু খুলে বলুন।

মনুর মা : ভাবীসা'ব কইতেন : আরশাদের বউ আইয়া এই বাক্সডা খুলবো। তাগোর ঘর-সংসার করনের লাইগা ... সব জিনিষই রাইখা

www.pathagar.com

গেলাম। আরশাদের পুলাপানের লাইগাও। ... ভাবীসা'ব তো কিছুই দেইখা যাইতে পারলেন না।

(কান্নায় জড়িয়ে আসে কণ্ঠ)

মরবার আগে হেই বাক্সের চাবিডা দিয়া গেছিল বড় ভাইর হাতে। বড়ভাই হজ্বে যাওয়ার আগে আমারে চাবিডা দিয়া কাইন্দা কাইন্দা কইলো : মণির আম্মা যদি কোনদিন বাড়ীতে আইয়ে তো এই চাবিডা দিও বউয়েরে। কইও তার শাশুড়ীর কথা।

নফিসা : কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে বলুন।

মনুর মা : সবই যখন আপনেরা বিক্রি কইরা দিতেছেন, আমিও চইলা যামু। এই নেন, হেই চাবিডা। নেন গো বউ, চাবিডা নেন। ... এইবার আমি বাক্সডা এইখানে আইন্যা দেই।

(মনুর মা ঘরে গিয়ে একটা বড় বাক্স নিয়ে আসে)

নফিসা : আপনি এত কষ্ট করে আনছেন কেন? আমিই পরে খুলতে পারতাম।

মনুর মা : না গো বউ, এখনই একটু খুইলা দেখেন।

(নফিসা বাক্স খোলে)

ভাবী সায়বের অতদিনের আশা আইজ পূরণ অইলো। বড় ভাইর আশাও। বাইর করেন গো বউ। নিজের হাতে বাইর কইরা দেখেন জিনিষগুলি। আমি সাহায্য করি।

(নানা জিনিষ বের করে মুনর মা)

এই যে আপনেরার ভাত খাওনের থালা। এইগুলি তরকারীর বাডি, এই যে পানি খাওনের গেলাস। এক এক সময় এক একটা জিনিষ সখ কইরা কিইনা রাখছিল। নাতির লাইগাও জিনিসপত্র রাইখা গেছেন ভাবীসা'ব। আপনে খুইজ্যা দেখেন বউ। নাতির জিনিষও পাইবেন।

দৃশ্যান্তর

(চাচার বাড়ী উঠান। সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে আমিনা)

আরশাদ : মণি, মণি। চাচা, চাচা। কেউ নেই।

(ডাকতে ডাকতে আসে আরশাদ)

এই যে আমিনা, চাচা কই?

আমিনা : কই জানি গেছে।

www.pathagar.com

আরশাদ : মণিকে দেখেছ?

আমিনা : না তো! মণি কই?

আরশাদ : খুঁজে পাচ্ছি না! (মনুর মা আসে) এই যে ফুফু, মণিকে যে পাচ্ছি না।

মনুর মা : এ্যাঁ! মণিরে পাইতেছ না? তাইলে?

অদূরে আনু : হাঃ হাঃ ... দেইখা দিমু না? আমারে ঠাট্টা করার সাহস পায়? প্রতিশোধ নিয়া নিমু .... হাঃ হাঃ হাঃ ...

আরশাদ : (প্রায় চিৎকার করে) আনু! আনু!

(আনুর হাসি আরও দূরে মিলিয়ে যায়)

মনুর মা : কই যাও আরশাদ?

আরশাদ : ওই আনুর কাছে, মণির খোঁজে!

(ত্রস্তপায় চলে যায় আরশাদ)

দৃশ্যান্তর

(আরশাদদের ঘরের সামনে। বাক্স থেকে নফিসা নীরবে জিনিষপত্র বের করে। হঠাৎ ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হয়ে হয়ে অশরীরী কণ্ঠ ভেসে আসে-)

কণ্ঠস্বর : বউমা! বউমা!

নফিসা : কে? কে আমাকে ডাকে?

কণ্ঠস্বর : আমি তোমার শাশুড়ী বউমা। ওই যে, ওই যে দেখ পানদানি, পানের বাটা। আর ওই যে – কাঁসার জিনিষপত্র। ওইখানে ভাত-তরকারীর ডেকচী নামানোর বেড়ি আছে। ওই যে কয়েকটা শিশিও রাখছি গো বউ। নানারকম জিনিষ রাখতে পারবা। বোতলও আছে কয়েকটা। রুটি বানানোর বেলাইনটাও দেখ বউ। আর রুটি বানাইবা যে – ওই তো তার পিঁড়ি!

(কণ্ঠস্বরের মাঝে আগাগোড়াই নফিসার জোর শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে থাকে)

নফিসা : (প্রায় শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে) আমার ... আমার দম আটকে আসছে!

কণ্ঠস্বর : এই যে এইখানে নূনের বাটি। ছোট ছোট কয়েকটা। এই যে তেলের বাটি। বউ, এই বাটিতে তেল রাইখা শরীরে মাখতে পারবা। এইটা শইরষা তেলের বাটি, এইটা নারকেল তেলের। ঘরে জলচৌকি আছে। জলচৌকিতে বইসা তেল মাইখো বউ। আর এই যে একটা ছোট থালা হাতে নেও বউমা ... এতে আরশাদ ছোট সময় ভাত খাইতো। তুইলা রাখছিলাম।

www.pathagar.com

আরশাদ : (আসতে আসতে) নফিসা! নফিসা, আনু বোধ হয় আমাদের সর্বনাশ করে গেল। মণিকে খুঁজে পাচ্ছি না।

(নফিসার হাত থেকে পিতলের থালা পড়ে যায় ঝনঝন শব্দে)

আমি আবার খুঁজতে চললাম।

কণ্ঠস্বর : এই থালায় আমার নাতিরে ভাঁত খাওয়াইয়ো বউ।

(কথাগুলো কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হয়)

নফিসা : (আর্তনাদ করে ওঠে) আম্মা!

দৃশ্যান্তর

(ঝোপ-ঝাঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে চাচা ও মণি)

চাচা : তুমি এই জঙ্গলের কিনারায় ক্যান আইছ ভাই?

মণি : (একরোখা কণ্ঠে) আমার দাদীর কবর কোথায়?

চাচা : তোমার দাদীর কবর? কবর তো বাড়ীতে।

মণি : আমারদাদু?

চাচা : হ' হ' তোমার দাদু ... কি কইতে চাও?

মণি : দেখতে কেমন ছিলেন?

চাচা : দেখতে? এই আমারই মতন।

মণি : আপনার মত মুখে দাড়ি ছিলো?

চাচা : হ্যাঁ হ্যাঁ, সবকিছুই আছিল আমারই মত। আমার বড় ভাই যে!

মণি : একেবারে আপনার মত?

চাচা : হ'।

মণি : আর আমার দাদী?

চাচা : খুব সুন্দরী আছিলো। কিন্তু অত মমতা কেন লাগাইতাছ ভাই? দুই একদিন পর তো চইল্যা যাইবা। এখান থাইক্যা –

মণি : না দাদু। বড় হয়ে আমি চলে আসবো। এখানে — একা একা

চাচা : তাই আইসো দাদু, তাই আইসো। তোমরার অংশ তোমার বাপ বেইচ্যা ফেললেও আমার অংশ তো থাকবো। তুমি আইসো। চল দাদু। তোমারে আমি বাড়ীতে দিয়া আসি। না অইলে তোমার বাপ-মা বকবো।

মণি : বকবেন কেন?

চাচা : তুমি যে না-কইয়া এইখানে আইছ! কি যে পাগলামীটা করলা দাদু। চল। (চলে যায়)

www.pathagar.com

দৃশ্যান্তর

(আরশাদদের ঘরের সামনে। মণিকে নিয়ে চাচা আসে)

চাচা : বউ গো। মণি এতক্ষণ আমার কাছেই আছিল। আপনারে কইয়া যায় নাই। আমার অনুরোধ– ওরে বকাবকি কইরেন না বউ।

আরশাদ : এ্যাঁ। তাহলে মণি ... না, সব সাধ আমার মিটে গেছে। তোমাদের নিয়ে এ বাড়ীতে আর একদিনও নয়। কাল ভোরেই আমরা রওয়ানা করবো। তারপর একা এসে জমিবাড়ী সব বিক্রি করে যাবো।

নফিসা : আপনি বসুন চাচাজী। ... তুমি কালই যাবে তাহলে?

আরশাদ : মানে! তোমরা যাবে না?

(নফিসা একটু চুপ থেকে ধীর কণ্ঠে বলে –)

নফিসা : আমরা আরো কিছুদিন থেকে যাবো। আম-কাঁঠাল মাত্র পাকতে আরম্ভ করেছে ...

আরশাদ : এর অর্থ?

নফিসা : অর্থ খুবই সোজা। জমিবাড়ী বিক্রি হবে না। মণির দাদা-দাদীর ভিটা মণিরই থাকবে!

আরশাদ : তাই নাকি?

নফিসা : শহরের জমি আরো বছর দুই পরে কিনলেও চলবে। আব্বাকে তুমি এই কথাই বলে এসো।

(ব্যাপারটা বুঝতে আরশাদের একটু সময় লাগে)

আরশাদ : তাহলে আমি আর যাবো কেন এই আম-কাঁঠাল রেখে? আব্বাকে চিঠি লিখে দিলেই হবে!

মণি : ও দাদু, শুনলে তো?

চাচা : হ' হ', বুকটা আমার ভইরা গেলো রে দাদু!

(অপরাধীর মত একটা কাঁঠাল নিয়ে আনু এসে অদূরে দাঁড়ায়)

মণি : ও দাদু, আনু চাচার হাতে কাঁঠাল!

নফিসা : মণি! তোমার চাচাকে এখানে খেয়ে যেতে বল। আর যাও, কাঁঠালটা নিয়ে এসো।

(মণি অত্যন্ত খুশী মনে আনুর কাছে যায়। আনু তো অবাক! তারপর ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মণিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। অন্যদের মুখেও আনন্দের হাসি)

www.pathagar.com

অপদার্থ

চরিত্র-লিপিঃ

আফজল	ঃ	নীচের দিকের কেরাণী
সাইদা	ঃ	আফজালের স্ত্রী
হাই সাহেব	ঃ	কোন এক অফিসের হেড এ্যাসিস্‌টেন্ট
মুখলেস	ঃ	অফিসের পিয়ন
এ্যাসিস্‌টেন্ট	ঃ	অফিসের এ্যাসিস্‌টেন্ট
বড় বোন	ঃ	আফজলের বড় বোন
আরশাদ মিয়া	ঃ	সাধারণ চাকুরে
সুফিয়া	ঃ	আরশাদের স্ত্রী
রশীদ মিয়া	ঃ	কন্ট্রাক্টার
গ্রাম্য লোক	ঃ	তরি-তরকারির ব্যবসায়ী
পরিচালক	ঃ	সিনেমা–পরিচালক
সহকারী	ঃ	ঐ সহকারী
স্বপন কুমার	ঃ	সিনেমা-নায়ক
মন্টু	ঃ	আফজলের ছেলে
ছেলে	ঃ	নিম্নমধ্যবিত্তের ছেলে

ক্যামেরা ম্যান
ও
অন্যান্য

* ১৯৬৮ সালে (খুব সম্ভবত) পাকিস্তান টেলিভিশনে প্রচারিত এই টেলি–নাটিকাটির শিরোনাম ছিল 'এক্সট্রা'।

www.pathagar.com

অপদার্থ

(কোন একটা জনগুরুত্বপূর্ণ অফিসে এ্যাসিসটেন্টদের কামরা। সিনিয়র এ্যাসিসটেন্ট হাই সাহেব নিজের আসনে আরাম করে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। পিয়ন মুখলেস আলমারীতে ফাইল খুঁজছে। অন্য টেবিলে নিজের আসনে আর এক এ্যাসিসটেন্ট চুপচাপ বসে যেন ধ্যানমগ্ন। তার সামনে এক গ্লাস পানি। নীচের দিকের এক কেরাণী আফজল এসে কামরায় ঢোকে)

হাইসাহেব : এই যে আফজল সায়েব, শেষ পর্যন্ত তাহলে উদয় হলেন?

আফজল : একটু দেরীই করে ফেলেছি হাইসায়েব।

হাইসাহেব : আরে না না, আপনার নিয়মে তো রীতিমত সকালেই এলেন।

আফজল : কি করব বলুন, ছেলেটার জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না।

হাইসাহেব : এর পরে তো আর কোন কথা চলে না।

(আবার পত্রিকায় মনোনিবেশ করে। আফজল নিজের টেবিল–চেয়ার গোছগাছ করতে থাকে। মুখলেস আলমারী থেকে একটা ফাইল দেখতে দেখতে নিম্নকণ্ঠে আপন মনে বলে –)

মুখলেস : নিজে সময়মত আইসাও তো রোজ পত্রিকা খুইলা বসেন। এর পরে চা খাইবেন, পান খাইবেন, বাথরুমে যাইবেন। আফিসের কাজকাম আরম্ভ করতে আরও আধা ঘন্টা।

আফজল : অফিসে আসতে বাসে ওঠা অসম্ভব। আজ মরেই গিছলাম।

হাইসাহেব : তাই নাকি! কোথায় মরছিলেন?

আফজল : পথে, গাড়ীর নীচে পড়ে।

হাইসাহেব : তাই বলুন। গাড়ীর মধ্যে না ঢুকে হাতল ধরে ঝুলে থাকবেন। এমনি অবস্থায় নীচেও পড়বেন না –

(এটুকু বলেই হাসতে থাকে)

আফজল : না না, বাসে চড়ার আশা ছেড়ে দিয়েছি। পায়ে হেঁটে আসছিলাম।

হাইসাহেব : নিশ্চয়ই খুব অসাবধানে।

(মুখলেস অন্য এ্যাসিসটেন্টের সামনে একটা ফাইল রাখে। এ্যাসিসটেন্ট সেটা টেবিলের এক কোণে ঠেলে রাখে। মুখলেস ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আফজলের দিকে তাকায়। এ্যাসিসটেন্ট ধীরে সুস্থে পকেট থেকে একপাতা ওষুধ বের করে তার থেকে একটা টেবলেট বের করে সেটা দেখতে থাকে – কোন তাড়াহুড়া নেই)

আফজল : পথ দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ একটা ট্যাক্সির জোরে ব্রেক কষার শব্দ

www.pathagar.com

শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার এক ভদ্রলোক আমার হাত ধরে নিজের দিকে টেনে নিলেন। আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে বললেন – গাড়ীর নীচে চাপা পড়তেন তো!

হাইসাহেব : ইস! কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত তাহলে!

আফজল : এতক্ষণ আপনারা অফিসের ছুটি পেয়ে যেতেন।

হাইসাহেব : বাসায় ফিরে সদকা দিয়ে দেবেন।

(ওদিকে মুখলেস এ্যাসিসটেন্টের টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বলে –)

মুখলেস : অনেকক্ষণ ধইরা হাতাইতাছেন। এইবার খাইয়া ফেলান স্যার।

(এ্যাসিসটেন্ট নির্বিকার চোখে তাকায় মুখলেসের দিকে)

ফাইলডা আইন্যা দিলাম, একটু খুইল্যা দেখেন।

(এ্যাসিসটেন্ট টেবলেটটা মুখে পুরে গ্লাসের পানিটা খেয়ে নেয়)

আফজল : সদকার কথা বলছেন স্যার? আমার মত এক সামান্য কেরাণীরও একটা জীবন, তার জন্য আবার সদকা! মুখলেস, আমাকেও এক গ্লাস পানি খাওয়াও ভাই।

(মুখলেস খালি গ্লাসটা হাতে নেয়। নির্বিকার এ্যাসিসটেন্ট পকেট থেকে ছোট্ট চিরুনী বের করে চুল আচড়ায়। মুখলেস যেতে গিয়ে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকায়। রাস্তায় তখন ব্যস্ত জীবন – ঠেলাগাড়ীতে মাল চলছে, লোকজন রিকশা গাড়ী সব কিছু মিলে এক প্রাণান্ত ব্যস্ততা। – মুখলেস চলে যায়। যেতে যেতে শোনে হাইসাহেবের কথা –)

হাইসাহেব : নতুন বরকনের ছবিটা কী সুন্দর দেখুন আফজল সায়েব! দেখুন চোখের দৃষ্টিতে কত স্বপ্ন!

আফজল : আপনিই দেখুনস্যার।

হাইসাহেব : মনে হয়, চারদিকে শুধু ফুল দেখছে!

আফজল : কিছুদিন পরেই দেখতে আরম্ভ করবে সরষে ফুল!

হাইসাহেব : নিজেরা খুব দেখছেন বুঝি? অথচ শুনলাম – রীতিমত প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন!

আফজল : একথা বলে আর লজ্জা দেবেন না হাইসায়েব। শুনলেই মনে হয়– গায়ে কাতুকুতু লাগছে।

(সেই নির্বিকার এ্যাসিসটেন্ট আফজলের কথা শুনে এমনভাবে হাসতে থাকে যেন তার গায়ে কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে। আফজলের চোখে ভাসে অতীতের এক দৃশ্য – নবদম্পতী আফজল ও সাইদা গোদারা ঘাটে এসে রিকশা থেকে নামে।

www.pathagar.com

(তারা যে মোটেই সচ্ছল নয় – পোশাক–পরিচ্ছদ থেকে তা বোঝা যায়, যদিও নবদম্পতী হিসাবে পোশাক–পরিচ্ছদ কিছুটা ভাল। তারা রিকশা থেকে স্যুটকেস–বিছানাপত্র নামিয়ে গোদারা ঘাটের এক স্থানে রাখে)

আফজল : তোমার হয়তো মনে হবে সাইদা – হঠাৎ করেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল, আনন্দ–উৎসব বলতে কিছুই হল না। ... ইয়ে ... মানে বিয়ের পরই রওনা করলাম ঢাকায়। কিন্তু খুবই সাদামাটাভাবে... মানে ...

সাইদা : তাতে কি হয়েছে? দু'জন দু'জনকে পছন্দ করেছি জেনেই আমার বাপ আর সৎমা সাদামাটাভাবেই বিয়েটা সেরে ফেললেন। আমাকে বিদায় করে তাঁরা বাঁচলেন।

আফজল : আর আমার তো এক গরীব বড়বোন ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই যে ... জান সাইদা, আনন্দ–উৎসব হল না বলে আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। ভালবাসাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এই ভালবাসাকে সম্বল করেই আমরা সংসার পাতব। জানি, চাকরীটা আমার খুবই সাধারণ, এখনও টেম্পোরারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে – একটা ছোট্ট সাধারণ সংসার আমরা গড়ে তুলতে পারব যেখানে কোন উচ্চাশা না থাকলেও থাকবে শান্তি।

(সাইদা নীরবে একটা ছোট্ট পোটলা বাড়িয়ে দেয় আফজলের দিকে)

সাইদা : এতে আমার গলার চেনটা আছে। তোমার কাছেই সাবধানে রেখে দাও।

(পোটলাটা নিতে গিয়ে আফজলের দৃষ্টি পড়ে সাইদার মেহেদী–রঞ্জিত হাতের উপর। পোটলার সঙ্গে সেই হাতও হাতে নিয়ে আফজল বলে –)

আফজল : তোমার হাতে মেহেদীর রঙ। এই রঙ যেন আমাদের মনে অমলিন থাকে সাইদা।

সাইদা : ছাড়। ওই গোদারা এসে লাগছে, চল।

মুখলেস : স্যার।

(মুখলেসের ডাকে আফজলের ধ্যান ভঙ্গ হয়। দেখে– হাতে পানির গ্লাস নিয়ে মুখলেস দাঁড়িয়ে আছে)

পানি। আরও একটা ফরমাইশ সাইরা পানি আনতে দেরী অইয়া গেল। কিছু মনে কইরেন না স্যার।

www.pathagar.com

আফজল : (গ্লাস হাতে নিয়ে) নাহ্‌, আমাদের কি এতে কিছু মনে করলে চলে?

(পানি খেয়ে গ্লাসটা মুখলেসের হাতে দেয়)

হাইসাহেব : এর মধ্যেই একটু ঝিমুনি এসে গিছল নাকি? আচ্ছা আফজল সায়েব, অফিসে এসে ঝিমান, রাস্তায় হাঁটতেও ঘুম–ঘুম চোখ – খুব রাত জাগেন নাকি? মানে সেকেণ্ড শো সিনেমা কিংবা দু'জনের মধ্যে কথার ফুলঝুরি ছড়াতে ছড়াতে ...

আফজল : খেতেই পাইনা ভাল করে, সিনেমা দেখব কি। কয়েকদিন হয়ে গেল ছেলেটার জ্বর ...

হাইসাহেব : ছেলেটার জ্বর তো এই কয়দিন ধরে, কিন্তু অফিসে ঝিমিয়ে – ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন তো সারা বছর!

আফজল : চেয়ারে বসে চুপচাপ লিখতে লিখতে অনেক সময় ঝিমুনি এসে যায়।

হাইসাহেব : কিন্তু অফিস তো তা বুঝবে না। শুনুন, আপনি যে কাকলী সিনেমা হাউসের পাশ দিয়ে নিয়মিত ঘুরাফেরা করেন, আমরা তা জেনেছি। অফিসের এতে কিছু বলবার নেই। কিন্তু ... যাক, আপনার ব্যাপার আপনিই বুঝবেন।

(গ্লাস রেখে মুখলেস আবার আসে)

এই যে আমাদের মুখলেস, সে-ও সিনেমার শুধু ভক্তই নয়, তার একজন এ্যাক্টরও!

(আফজল চুপচাপ শুনে যায়)

মুখলেস : সময় পাই না স্যার, তাই ছোটখাটো পার্ট কই ফিলিমে। নায়ক-টায়ক না স্যার, এক্সট্রা।

হাইসাহেব : ওই হল। এক্সট্রা হলেও এ্যাক্টর তো!

মুখলেস : নায়ক-নায়িকারে নিয়া পলট্‌ সাজাইতে আশেপাশে আমাগো মত কিছু ফাল্‌তু লোক লাগে। তা আপনাগো দোয়ায় আমরাও স্যার এ্যাক্টরই!

হাইসাহেব : তবু নায়ক হওয়ার স্বপ্ন-টপ্ন নিশ্চয়ই দেখ!

মুখলেস : স্বপ্ন দেখি না স্যার, তয় টপ্ন মাঝে মধ্যে দেখতে চাইলেই চোখ খাওজ্জায়। আর সেই চোখ কচলাইতে কচলাইতেই সায়বের বাসার বাজার করার সময় অইয়া যায়। তাই এক্সট্রার পার্ট কইয়াই আমাগো খুশী থাকতে হয়।

www.pathagar.com

হাইসাহেব : ও হ্যাঁ, কথায় কথায় ভুলেই গেছি। আফজল সায়েব, বড় সাহেব আপনার খোঁজ করছিলেন – তখনও আপনি আসেন নি। দেখাকরতেবলেছেন।

আফজল : (ঘাবড়ে গিয়ে) তাই নাকি! কারণটা কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

হাইসাহেব : বরাবরের কথাই বলবেন হয়তো।

আফজল : সে তো বকাঝকা, ধমক!

হাইসাহেব : তা-ই কিছু খেয়ে আসুন গে'।

(আফজল চলে যায়)

একটা অপদার্থ – বুঝলে মুখলেস! এখানকার আগে যেখানে চাকরী করতেন, সেখানেও এই কুঁড়েমির জন্যই চাকরী গেল। এলেন এখানে। স্বভাব একই।

মুখলেস : একজন পিয়নের কাছে এমন কইরা কওয়া ... মানে আমি তো স্যার ফিলিমে এক্সট্রার পার্ট কই। তাই সব জায়গায় নানান রকম মাইনুষেরে লক্ষ্য করি। এইখানেও যে করি না তা না।

হাইসাহেব : মুখলেস, আমার জন্য চা আর পান।

(হাইসাহেব বাথরুমে যায়। মুখলেসের মুখে পরিহাসমাখা হাসির রেখা। অন্য এ্যাসিসটেন্ট ইশারায় কাছে ডাকে মুখলেসকে)

এ্যাসিসটেন্ট্ : (বাথরুম লক্ষ্য করে) নাটের গুরু – বুঝলে? সময়মত অফিসে এসে সময়টা যে কি করে কাটান, তা তো দেখছই?

মুখলেস : জ্বে। এক্সট্রার পার্ট কই তো! সব কিছুই চউক্ষে পড়ে।

এ্যাসিসটেন্ট্ : বড় সায়বের বাসায় কাজকাম কর, একটু বলতে পার না? আমরা যে খেটে মরছি – কই, আমার কনফার্মেশনের ফাইল তো এই দুই বছরেও খোলাসা হল না!

মুখলেস : ফিলিমের মত এই অফিসে আর সায়বের বাসায়ও আমি তো এক্সট্রা স্যার!

এ্যাসিসটেন্ট্ : (কথার ইঙ্গিতে সাবধান হয়ে গিয়ে) আমার জন্যেও পান আনবে। আর ওই খবরের কাগজটা ...

(মুখলেস মুখে হাসি এনে খবরের কাগজটা দিয়ে চলে যায়। একদিক দিয়ে বাথরুম থেকে হাইসাহেব, অন্যদিক দিয়ে আফজল আসে)

হাইসাহেব : এ কি আফজল সায়েব, বড় সাহেব এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলেন? বকুনিটা কেমন হল আজ?

www.pathagar.com

আফজল ঃ উনি আজ বকলেন না।

হাইসাহেব ঃ বকলেন না? বলেন কি! তবে?

আফজল ঃ ভাল মুখেই কথা বললেন। দু'একটা কথা – যা আমি আশা করি নাই। সত্যিই হাইসায়েব, অপদার্থ হলেও এটা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমাদের মত মানুষকে চাকরী দেওয়া তো আর একজনকেই চাকরী দেওয়া নয়, একটা পরিবারকে চাকরী দেওয়া, একটা হতভাগ্য গোটা পরিবারকে।

হাইসাহেব ঃ আপনার কথার কোন মাথামুণ্ডুই তো বুঝতে পারছি না। খুলে বলুন।

আফজল ঃ অফিসের কাজকাম নাকি খুব ঢিলেঢালা। উপর থেকে এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর চাপ এসেছে। আমার সম্পর্কে অনেকদিনের জমানো অভিযোগ – বড় সায়েব ফাইলটা শুধু এক নজর দেখালেন। তারপর ... আচ্ছা,আসি।

(যেতে পা' বাড়ায়)

হাইসাহেব ঃ একি! সত্যি সত্যি চললেন যে? আফজল সায়েব!

(আফজল তখন চলেই গেছে। মুখলেস চা-পান এনে হাইসাহেবের টেবিলে রেখে এ্যাসিসটেন্টকে পান দিতে যায়)

এ্যাসিসটেন্ট্ ঃ (নিম্নকণ্ঠে) আফজল সায়বের ছাটাই হয়েই গেল।

(মুখলেস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় এ্যাসিসটেন্টের দিকে)

অফিসে এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর ষ্টেপ্ নিলেন বড় সায়েব। আর অভিযোগগুলো – (হাইসাহেবের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে) উনিই তৈরী করে দিয়েছেন।

মুখলেস ঃ (মুখে করুণ হাসির রেখা) অপদার্থ লোকটা অদ্দিন পরে চইলাই গেল। স্যার, অফিসের সাধারণ এক পিয়ন আমি। আপনাগো ফাই-ফরমাস খাটি, বড় সায়বের বাসায়ও যাতায়াত আছে। অফিসে কে কেমন কাজকম্ম করেন, কে কেমন অকম্মা – তার কিছু কিছু তো জানি।

(হাইসাহেবের ডাক শোনা যায় –)

হাইসাহেব ঃ মুখলেস।

(মুখলেস কাছে আসে)

অফিস-আওয়ারে এতসব কথাবার্তা কিসের?

মুখলেস ঃ না স্যার, আফজল সায়েব চইলা গেলেন, এই নিয়া দু'একটা কথা ...

www.pathagar.com

হাইসাহেব : কথাবার্তা রেখে কাজে মন দাও। এই ফাইলগুলো নিয়ে বড় সায়বের রুমে এস।

(হাইসাহেব বড় সাহেবের রুমে যায়। মুখলেস ফাইলগুলো সাজিয়ে নিতে গিয়ে আপন মনে বলে –)

মুখলেস : এই অপদার্থ মানুষটা ক্যান্ যে অদ্দিন উনাগো কুকাজের সঙ্গী হইল না! সঙ্গী হইলে অফিসে না আইলেও চাকরী যাইত না।

(পথ হাঁটছে আফজল। রাস্তায় চলমান জীবন। পথ চলছে আফজল, আর নিজের নেপথ্য কণ্ঠ শুনছে নিজেই –)

আফজল : (নেপথ্য কণ্ঠে) আমার বিশ্বাস ছিল – একটা ছোট্ট সাধারণ সংসার আমি গড়ে তুলতে পারব। কোন উচ্চাশা তো আমার ছিল না! কিন্তু আমি কি এতই অপদার্থ যে কোন অন্যায় না করেও সাধারণ একটা চাকরীও আমার বজায় রইল না? মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা ... এখন কি করে সংসার চালাব আমি?

(আফজলের চোখে ভাসে – একটা টিনের বাসায় একটা কোঠায় কথা বলছে সাইদা ও আফজল)

সাইদা : যা মাইনা পাও, তাতে সংসারের খরচ কুলায় না। তোমার মত অনেকেরই কুলায় না। আর কুলায় না বলে অফিসের পর তারা বাড়তি রোজগার করে। তুমিও অফিস থেকে রোজই বাসায় আস রাতে। এতক্ষণ অফিসে কি কর?

আফজল : অফিসে তো আমি নীচের দিকের এক কেরাণী। উপরওয়ালাদের অনেক কাজ আমাকে করে দিতে হয় সাইদা। টেম্পোরারি চাকরী, না করেও উপায় নেই।

সাইদা : তার জন্য ওভারটাইমের টাকা পাবে তো! কিন্তু তার তো নামগন্ধ নেই!

আফজল : ওভারটাইম পাওয়া উচিত, কিন্তু দেয় না যে!

সাইদা : কি জানি বাপু, তোমার কথার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছ না তো?

আফজল : লুকাব কেন! তোমার কাছেও আমাকে লুকাতে হবে?

সাইদা : সেটা তুমি জান। এর তার কাছে যখন শুনি যে ...

আফজল : আমি একটা অপদার্থ।

সাইদা : তখন আমার গৌরব বাড়ে না।

আফজল : পারছি না সাইদা, আপনজন কেউ তেমন না থাকলেও যারাই

www.pathagar.com

আছে, তাদের কোন দাবীই আমি ঠিকমত মিটাতে পারছি না। অথচ চেষ্টার ত্রুটি আমি করছি না।

(আফজল রাস্তায় হেঁটেই চলেছে। রাস্তার মোড়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়ায় আফজল। এক ভিখারী তার কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়। আফজলের চোখে ভাসে তার গাঁয়ের বড় বোনের মুখ। বড় বোন করুণ কণ্ঠে বলছে আফজলকে –)

বড় বোন : তোর কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নাই রে আফজল। ছেলেমেয়ে নিয়া আমি কিছুতেই আর চালাইতে পারতাছি না। সামনে আমার ঘন আন্ধাইর।

আফজল : আমি যে বেতন পাই, তাতে আমারই সংসার চলে না বড়বু'!

বড় বোন : তোর চলে না? পুব পাড়ার আরশাদ মিয়াও তোর মত ছোট চাকরীই করে। কিন্তু আরশাদ মিয়ার বাসায় শুনলাম বিলাসিতার শেষ নাই।

আফজল : আরশাদ মিয়া যেভাবে টাকা আনে ঘরে, আমি যে তা করতে পারি না বড়বু'!

বড় বোন : কি জানি – আরশাদ মিয়া পারে, আর তুই যে ক্যান্ পারস না – বুঝি না। কিন্তু তুই শক্ত পায় না খাড়াইলে আমার তো শেষই, তোরও তো কোন ভবিষ্যৎ দেখতাছি না।

(ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আফজল মুখ ঘুরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে যেন ভবিষ্যতের দিকে তাকায়। তার চোখে ভাসে একটা সন্ধ্যার দৃশ্য : আরশাদ মিয়ার ড্রইংরুম। ড্রইংরুমের সাজানোতে আসবাবপত্র চেয়ার টেবিলের জৌলুষ যত বেশি, রুচিটা সেই অনুপাতে অনেক কম। আরশাদ মিয়ার ছেলের বার্থ-ডে পার্টি আজ বেশ জমজমাট। যারা এসেছে, দেখেই বোঝা যায় তাদের রুচিও খুব উন্নত নয়। সেখানে সন্তর্পণে ঢোকে আফজল ও সাইদা। পার্টির জৌলুষ দেখে দু'জনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। আফজলের ইঙ্গিতে সাইদা চলে যায় ভেতরে, আর আরশাদ গিয়ে আশ্রয় নেয় ড্রইংরুমের বারান্দার এক কোণে। তার কানে ভেসে আসে ড্রইংরুমের হৈ-হল্লোড়। .... আরশাদ মিয়া ও স্ত্রী সুফিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেয় পার্টির লোকজন। সুফিয়া আজ অতিমাত্রায় সালঙ্কারা ও সুবেশা। লোকজন চলে গেলে আরশাদের ইঙ্গিতে সুফিয়া ভেতরে যায়। .... ভেতরে রান্নার কোঠার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা সাইদার কাছে যায় সুফিয়া)

সুফিয়া : তোমরা অত দেরী করলা ক্যান্? পার্টি তো আরম্ভ হইছে পাঁচটার সময়।

www.pathagar.com

সাইদা ঃ আসতে আসতে দেরী হয়ে গেল সুফিয়া বু'।

সুফিয়া ঃ আস ড্রইংরুমে।

(সাইদা সুফিয়াকে অনুসরণ করে)। .... এদিকে আরশাদ গিয়ে দাঁড়ায় আফজলের কাছে)

আরশাদ ঃ পার্টি আরম্ভ হইছে কখন, আর তোমরা আইলা অতক্ষণে? আস, ড্রইংরুমে আস।

(আফজলকে নিয়ে আরশাদ ড্রইংরুমে আসে। সুফিয়া ততক্ষণে নাশতার দু'টি প্লেট নিয়ে এগিয়ে আসে। আফজল একটা বই তুলে দেয় আরশাদের হাতে)

আফজল ঃ আমার পক্ষে দামী উপহার দেওয়া তো....

আরশাদ ঃ উপহার দিতে অইবো এমন তো কোন কথা নাই!

(বইটা নিয়ে আলতোভাবে রাখে টেবিলে সাজানো উপহারের বড় বড় প্যাকেটের স্তূপের পাশে)

নেও, এইবার নাশ্‌তা খাইয়া নেও।

(আফজল 'ও সাইদা কুণ্ঠিত হাতে নাশতার প্লেট হাতে নেয়। দৃশ্যটি মিলিয়ে যায়। — চোখে ভাসে অন্য দৃশ্য। বড় বোন ও আফজল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে)

আফজল ঃ যতখানি পারি, তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব বড়বু'। আজ আসি।

(বিদায় নেয় আফজল। বড় বোন নির্বাক দাঁড়িয়ে)

(আফজলের দু'টি পা এগিয়ে চলে। চোখে ভাসে আরও একটি দৃশ্য। আফজল সিঁড়ি ভেঙে একটি মধ্যবিত্ত কোঠায় গিয়ে ঢোকে। বার–তের বছরের একটি স্কুল–ছাত্র বই–খাতা নিয়ে সেই কোঠায় আসে। টেবিলের পাশে বসে আছে আফজল – ওই ছেলেটির প্রাইভেট টিউটর। পড়াশুনায় মন দেয় দু'জনই)

ছেলে ঃ আর একমাস পরেই আমার বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষার পরে কয়েক মাস আর প্রাইভেট পড়ব না স্যার। আম্মু বললেন – দরকার মত আপনাকে আবার খবর দেবেন।

(আফজল নীরবে তাকায় ছেলেটির দিকে। তারপর বলে –)

আফজল ঃ হোম টাস্ক কি আছে, দেখি।

(বই–খাতা খোলে ছেলেটি। ... দৃশ্যটি মিলিয়ে যায়)

(ঢাকার এক বস্তীতে বিকালের হৈ চৈ, কলতলায় ঝামেলা। তার পাশ দিয়েই চলে যায় আফজল। – অন্য এক কলতলা থেকে সাইদা পানিভরা বালতি নিয়ে ঢুকে বারান্দায় রাখে। তারপর ঢোকে

www.pathagar.com

গিয়ে ঘরের মধ্যে। ঢুকেই দেখে – বিছানায় রুগ্ন ছেলের শিয়রের কাছে বসে আফজল ছেলের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে)

সাইদা : আজ এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এলে?

(আফজল সাইদার দিকে তাকায়)

নাও নাও, ওঠ। এত সেবা করতে হবে না। বাঁদী তো রয়েছেই!

আফজল : (মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে) না সাইদা, মানে .... মন্টুর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম একটু।

সাইদা : সাতদিনের মধ্যে একটিবারের জন্যও তো এত মায়া উথলে উঠতে দেখলাম না। এতদিন যখন সব করেও একা একা রোগীর সেবা করতে পেরেছি, বাকী যে কয়দিন লাগবে – পারব।

আফজল : হাতে টাকাপয়সা নেই বলে এই ক'দিন বাড়তি কিছু রোজগারের আশায় এখানে সেখানে ঘুরেছি। কিন্তু .... তাছাড়া হাতে যখন আজ একটু সময় আছে, মন্টুর কাছে একটু বসলেও তোমার সাহায্য হয়।

সাইদা : অফিস তো এখনও শেষ হবার কথা নয়। আবার যাবে নিশ্চয়ই?

আফজল : হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। মানে .... ইয়ে ....

সাইদা : রান্নাঘরে যা আছে, তা গিলে অফিসে চলে যাও। ছেলের জন্য তোমার ভাবতে হবে না।

আফজল : দেখ সাইদা, সামান্য একটা কথা – একটু ঘুরিয়ে বললে বলাও হয়, শুনতেও এত খারাপ লাগে না।

সাইদা : বেশ তো, ভাল কথা শোনার জন্য বেরিয়ে পড় না!

আফজল : ভাল কথা শোনার কপাল কি সকলের হয়! তবুও ভাল মুখে কথা বললে দারিদ্রের জ্বালাটা গায়ে একটু কম লাগে – এই আরকি!

সাইদা : এই একটিমাত্র ছেলে আমাদের। সাতদিন ধরে জ্বর। পারলে কিছুটা ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে? আনতে পারলে পছন্দমত একটু পথ্য?

আফজল : আনতে চেয়েছি সাইদা, পারি নাই। আল্লা' জানেন, আনতে আমি চেয়েছি!

সাইদা : অফিসে যাও। আদরের নমুনা বুঝতে আমার বাকী নেই। ওষুধ-পথ্য না হয় আনতে পার নাই, একরাত জেগেও কাটাতে পার

www.pathagar.com

নাই ছেলের পাশে? রাতে এসে মন্টুর পাশে বসেছ, আর আমি রান্নাঘরের সামনে আসতে না আসতেই ঘুমে ঢলে পড়েছ।

আফজল ঃ ওভাবে কথা বলো না সাইদা। মনের শান্তিতে মানুষ যেমন ঘুমায়, সারাদিন খাটুনির পর দুর্বল শরীরেও অনেক সময় তেমনি ঘুমায়।

সাইদা ঃ সারাদিন আমি খাটি না? আমার শরীরটাও কি ঘুমে ঢলে পড়তে চায় না?

আফজল ঃ উত্তর দেবার সত্যিই কিছু নেই আমার। তবুও সব কিছুর পরও আমি তোমার এতটুকু সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত হব, তা ভাবতে পারি নাই।

সাইদা ঃ তোমার মত অপদার্থ স্বামীর মুখে স্ত্রীর সহানুভূতি পাওয়ার কথা শুনতেও লজ্জা হয়।

আফজল ঃ সত্যিই তো, একটি অপদার্থ ফালতু ছাড়া আমি আর কি। অফিসেও যেমন, তেমনি রাস্তাঘাটে, তেমনি তোমার কাছেও।

সাইদা ঃ খুব যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কথা বলছ? কোন্ মুখে তুমি আমার কাছ থেকে সহানুভূতি আশা কর? নিজে যা যা কর, তার সবটাই কি আমাকে জানতে দাও?

আফজল ঃ তোমার কাছে লুকিয়েছি কিছু?

(সাইদার চোখে ভাসে একটা দৃশ্য – আফজলের জামাকাপড় গোছাতে গোছাতে শার্টের পকেট থেকে বের হয় একটা চিঠি। চিঠিটা পড়ে সাইদা। চিঠিতে ভাসে আফজলের বড় বোনের মুখ –)

বড় বোন ঃ আফজল, তোর পাঠানো টাকা ঠিক সময়েই পাইয়াছি। ইহাতে আমাদের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা শুধু আল্লা' জানেন। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই। আমি জানিতে পারিয়াছি, তুই বউকে না জানাইয়া আমার কাছে টাকা পাঠাস। কিন্তু কেন? এই গরীব বড় বোনটির জন্য তুই যাহা করিতেছিস, বউ জানিলে তাহাতে কি বাধা দিবে? ভাই, তুই সব কথা বউকে জানাইবে। বউয়ের জানামতে টাকা পাঠাইলে আমি যে কত খুশী হইব, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

(সাইদার চোখ থেকে বড় বোনের মুখ মিলিয়ে যায়)

সাইদা ঃ অফিসের পর তুমি এখানে-সেখানে কাজ করে টাকা রোজগার

www.pathagar.com

কর না? আর সেই টাকা বড়বু'র নামে মানি অর্ডার কর না? বলেছ এসব আমার কাছে? কি, মাথা নোয়াচ্ছ কেন? আমাকে বললে আমি কি বাধা দিতাম? পারতাম না তোমার মত আমিও আমাদের কষ্টের সঙ্গে বড়বু'র কষ্টকে এক করে দেখতে?

আফজল : না ... মানে বহু কষ্টে তুমি সংসার চালাও। সচ্ছলতা আনতে পারি নাই বলে অক্ষমতার লজ্জা আমার কম নয়। ওদিকে বড়বু'র কষ্ট ... তাই আলাদা পরিশ্রম করে ... মানে কথাটা বলতে ...

সাইদা : আমার মান-সম্মানের কথাটাও তোমার মনে জাগল না?

(আফজল নিরুত্তর)

কি, কথা বলছ না যে? আসল কথা জেনে ফেলেছি বলে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ল নাকি?

আফজল : একাজটায় তোমার যে অপমান হতে পারে, তা আমার মনে পড়ে নাই।

সাইদা : তোমার মত মানুষের আবার লজ্জা? ... অফিসের দেরী হয়ে গেল।

(আফজল তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে)

অফিসে তোমার অবস্থা যা তা তো জানিই! কি, সব খুইয়ে এসে মন্টুর কাছে বসে কপালে হাত বুলাচ্ছিলে নাকি? চাকরীটা তাহলে গেছে?

আফজল : জান সাইদা, অফিসের বড় সাহেব আজ বকাবকি করলেন না। তাছাড়া, সহানুভূতি জানাল অনেকেই। যে হাইসায়েব সবসময় ঠাট্টা করেন, তিনিও।

(থ' বনে যায় সাইদা)

হ্যাঁহ্, কি আমার চাকরী! কতই বা তার মাইনে। অন্য একটা কিছু দু'একদিনের মধ্যে যোগাড় করে নেব না? কল-কারখানা আজকাল কত হচ্ছে! খেটে খাব, চাকরীর অভাব আছে!

সাইদা : (নিঃশব্দ অসহায়তা ভঙ্গ করে –) কি করে চলবে এখন?

আফজল : তুমি কিছু ভেবো না সাইদা। আমি এখ্খুনি ...

সাইদা : বাজে বকো না। তোমার ক্ষমতার দৌড় জানতে আমার বাকী নেই।

মুখলেস : (নেপথ্যে) বাসায় আছেন নাকি স্যার?

www.pathagar.com

আফজল : সাইদা, মুখলেস এসেছে। নিশ্চয়ই আমার অফিসের পাওনা টাকা নিয়ে। আমি তখন তাড়াতাড়ি চলে এলাম তো।

(সাইদা ঘরের বাইরে যায়। দরজা খোলে আফজল। মুখলেস দরজায় দাঁড়ায়)

টাকা নিয়ে এসেছ বুঝি? আমার পনের দিনের মাইনে তো? দাও।

মুখলেস : জ্বি না। টাকা আনি নাই। এই চিঠি। শুনলাম, এই কয়দিনের মাইনা পাইবেন আগামী মাসের পরথম সপ্তাহে। চিঠি পইড়া দেখেন।

(আফজল চিঠি হাতে নির্বাক)

ছেলেটার বুঝি খুব জ্বর? আহা – ছেলে মানুষ। জানি, অভাব–অনটনে আছেন। কিন্তু যেমন কইরা হোক– এই ছেলের অসুখে–

আফজল : সাইদা, আমি বাইরে যাচ্ছি। চল মুখলেস।

মুখলেস : চলেন। আমারও কোন কাজ নাই। বাকী সময়টার ছুটি নিয়া আইছি বড় সায়বের কাছ থাইক্যা। আপনের লগে আমিও কিছুটা যাই। স্যার, যেমন কইরা পারেন, কিছু টাকার যোগাড় করেন।... বিষ্টি আইতে পারে। আমার ছাতি আছে, আসেন।

(ওরা চলে যায়। সাইদা এসে মন্টুর শিয়রে বসে তার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করে)

(দরজাবন্ধ একটা আধাভাঙা কোঠার বারান্দা। তার এক পাশে একটা ভাঙ্গা বেঞ্চিতে বসে আছে আফজল ও মুখলেস। বাইরে ছিটে ফোটা বৃষ্টি)

মুখলেস : এইখানে কেউ চিনাজানা আছে নাকি স্যার?

আফজল : হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের এক বড়লোক কন্ট্রাক্টার।

মুখলেস : দেখেন কোন সুরাহা করতে পারেন কিনা।

(একজন গ্রাম্য লোক একটা খালি ঝুড়ি হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়)

গ্রাম্য লোক : এমন সময় বিষ্টি নামল। (আফজলকে) কয়ডা বাজে সায়েব?

আফজল : আমার ঘড়ি নেই।

মুখলেস : বসেন না!

গ্রাম্য লোক : দিয়াশলাই আছে আপনাগো কাছে?

মুখলেস : (দিয়াশলাই দিয়ে) কি নিয়া আইছিলেন শহরে?

www.pathagar.com

গ্রাম্য লোক : তরি-তরকারির চালান নিয়া আইছিলাম। (আফজল ও মুখলেসকে সিগারেট সাধে) সিগারেট নেইন।

আফজল : সিগারেট আমি খাইনা ভাই। তুমি নাও না মুখলেস।

মুখলেস : না স্যার, থাউক। আপনে ধরান ভাই।

(লোকটি সিগারেট ধরায়। আফজল তাকে কিছুটা অবাক চোখে দেখে)

তরি-তরকারির ব্যবসায় লাভ কেমন হয়?

গ্রাম্য লোক : রোজ দেড়শ'-দুইশ'র মত থাকে। তাছাড়া বাড়ীতে গিরস্থির ব্যবস্থাও আছে। কোন রকমে চইলা যায় আর কি।

মুখলেস : তাইলে তো ভাল টাকাই রোজগার করেন।

গ্রাম্য লোক : জ্বে, যে দিনকাল পড়ছে - তবু আল্লায় ঠেকায় না।

(লোকটা নির্বিকার সিগারেট টেনে যায়। হঠাৎ আফজল ডেকে ওঠে -)

আফজল : এই যে রশীদ ভাই!

(গাড়ী থেকে নেমে রশীদ সাহেব আসে। কন্ট্রাক্টর রশীদ সাহেব)

রশীদ : তুমি এখানে বসে আছ যে?

আফজল : বিষ্টি নামল কিনা, বসে আছি এখানেই। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

রশীদ : সাইটে কাজ চলছে, সেখানে। রাস্তা তৈরীর কাজ। তারপর কেমন আছ? বাড়ীতে যাও না?

আফজল : কিছুদিনের মধ্যে যেতে পারি নাই। রশীদ ভাই, আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

রশীদ : আমার কাছে? বল।

আফজল : আমাকে যদি আপনার ফার্মে একটা কাজ দিতেন, তাহলে - মানে -

রশীদ : কেন, তুমি তো চাকরী করছই?

আফজল : ওই চাকরীতে আজকাল চলেও না, তাছাড়া আমার ভালও লাগছে না। ওটা আমি ছেড়েই দেব। কয়েক বছর ধরেই টেম্পোরারি করে রেখেছে। আপনি যদি একটা কাজ দেন -

রশীদ : একই গাঁয়ে বাড়ী যখন, তখন তোমাকে তো আমি ভাল করেই জানি। আমার ফার্মে তোমাকে দেওয়ার মত কোন কাজ নেই। তাছাড়া এখানকার কাজের সঙ্গে তুমি খাপ খাওয়াতেও পারবে না। অনেক খাটতে হয়। তার চেয়ে যেখানে আছ, থাক

www.pathagar.com

সেখানেই। আচ্ছা, আমার আবার তাড়া আছে, আসি। (পা বাড়ায়)

আফজল : রশীদ ভাই। .... মানে, কথাটা খুলেই বলি।

(রশীদ সাহেব ভ্রুকুটি করেন)

ওখানে আমার চাকরীটা আর নেই।

রশীদ : ও! ওই চাকরীটাও খুইয়েছ তাহলে?

আফজল : ছেলেটার সাতদিন ধরে জ্বর। হাতে পয়সাও নেই যে ওষুধ-পথ্য কিনে দেই। এ অবস্থায় ....

রশীদ : বর্তমানে আমার হাত একেবারে খালি। তাই তোমার জন্য কোন কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সরি আফজল। তাছাড়া যে রকম সঙ্গীসাথী দেখছি .... ওদের সাহায্যেই জুটিয়ে নাও কিছু একটা। ... বুঝলে আফজল, অপদার্থ হলেও এতটা সাধারণ স্তরে নেমে যাবে, ভাবতে পারি নাই। আচ্ছা, আসি।

(চলে যায়। রশীদ সাহেব। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে আফজল)

গ্রাম্য লোক : বিষ্টি আর নাই। উঠি এইবার।

(চলে যায়। মুখলেস উঠে গিয়ে দাঁড়ায় আফজলের পাশে)

মুখলেস : আমি স্যার রাস্তায় ঘুরাফেরা করতে গিয়া নানা ধরনের মাইন্ষের চরিত্র লক্ষ্য করি। কওয়া তো যায় না, এক্সট্রার পার্ট কই - কোন্ সময় কেমন চরিত্রের পার্ট কওয়ার ডাক আইসা পড়ে!

আফজল : (হতাশ কণ্ঠে) আচ্ছা, এবার তুমি এস মুখলেস। কত আর ঘুরবে আমার সঙ্গে?

মুখলেস : বাসায় আর যামু না এখন। একটু পরেই ষ্টুডিওতে যাওয়া লাগব- মানে ফিলিম ষ্টুডিওতে।

আফজল : ষ্টুডিওতে আজ তোমার শুটিং আছে বুঝি?

মুখলেস : আছে স্যার। সন্ধ্যা ছয়টা থাইক্যা। কিন্তু আপনের সমস্যাটারও কোন ... আচ্ছা স্যার, একটা কাজ করবেন? লগে লগেই কিছু টাকা পাইয়া যাইতে পারেন।

আফজল : কি কাজ?

মুখলেস : যদ্দিন অন্য কিছু না হয়, আপনে স্যার আমার মত পার্ট করেন ছবিতে, মানে এক্সট্রার পার্ট। ডাইরেক্টর সায়েব তো আমারে খুব পছন্দ করেন। কইছিলেন - পছন্দমত কাউরে পাইলে সঙ্গে নিয়া যাইতে। হঠাৎ কথাডা মনে পড়ল। আপনে রাজী অইলে তো

www.pathagar.com

কথাই নাই। কিয়ের পার্ট, তা তো আমি জানি। আপনেরে জবর মানাইব স্যার। টাকাও পাইবেন, আমি তো মনে করি – আপনের যাওয়া উচিত। ইয়ে- মানে কাজটা পছন্দ না অইলে বেয়াদবী নিয়েন না স্যার।

আফজল : না না, বেয়াদবীর কি আছে? তা – এই যে নগদ টাকার কথা বললে, কত দেয়?

মুখলেস : পার্টটায় কয়েক শিফটের কাজ থাকলে – কমছেকম একশ' টাকার নীচে তো নাই-ই। আমি ধরলে একটু বেশীই দিব।

আফজল : এত দেবে? এখন তোমার সঙ্গে গেলে আমাকেও দেবে?

মুখলেস : দিব না স্যার? আপনের মত এক্সট্রা পাইলে খুশী অইয়া দিব। তার উপ্রে আমি নিয়া যাইতাছি।

আফজল : কতক্ষণ লাগবে?

মুখলেস : বেশিক্ষণ না। আপনের অখন টাকার যে কি দরকার, আমি তো বুঝতাছি। চলেন না স্যার।

(অগত্য মুখলেসের সঙ্গে পা বাড়ায় আফজল)

(স্টুডিয়োতে নিম্নবিত্তের ঘর সাজানো হয়েছে। আফজলের বাসার ঘরটির মতই। ফিল্মের দরিদ্র নায়কের ছেলে মৃত্যুশয্যায়। নায়ক সেটে দাঁড়িয়ে। আফজল ও মুখলেসও নিম্নবিত্ত দুই প্রতিবেশীর মেক-আপ নিয়ে সেটে এসে দাঁড়ায়। ক্যামেরাম্যান, সহকারী পরিচালক ও পরিচালক উপস্থিত আছেন)

পরিচালক : Lighting O.k.?

ক্যামেরাম্যান : O. k. স্যার।

পরিচালক : All lights off.

(একটি ছাড়া অন্যান্য সব আলো নিভে যায়)

সব আর্টিষ্ট সেটে আছে?

সহকারী : আছে স্যার।

পরিচালক : এক্সট্রা যারা?

সহকারী : ওই তো দু'জন এসে গেছে স্যার। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

পরিচালক : সিকোয়েন্সটা ফাইন্যালি বুঝিয়ে দেওয়া যাক। ... এই শটে একটি রুগ্ন মুমূর্ষু ছেলে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পাশে দাঁড়িয়ে তার অসহায় বাপ, এ ছবির নায়ক। নায়িকা অর্থাৎ ছেলেটির মা এর আগেই ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এ অবস্থায় রুগ্ন ছেলের অবস্থা

www.pathagar.com

দেখে নায়ক কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

(আফজল নিবিষ্ট হয়ে পরিচালকের কথাগুলো শুনছে। নায়ক এদিকে তেমন খেয়ালই করছে না)

"আব্বা" বলে ছেলেটি কেঁদে ওঠে। আর তখনই নায়ক ছেলের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে আর্ত হাহাকারে। তার সেই হাহাকার শুনে ছুটে আসে দু'জন প্রতিবেশী।

(আফজলের চোখে ভাসে রোগশয্যায় শায়িত মন্টুর মুখ)

ব্যস, প্রথম শটটা এ পর্যন্তই।

নায়ক : O. k. স্যার।

পরিচালক : মনিটর দিন।

ক্যামেরাম্যান : All Lights. (সব আলো জ্বলে ওঠে)

পরিচালক : ক্ল্যাপ।

(সহকারী ক্ল্যাপ দেয়)

Ready .... Start .... Action.

নায়ক : (অভিনয় করে) ছেলের এই অসুখ, অথচ কেউ আজ কাছে নেই। কি যে আমি করি।

পরিচালক : কাট। (নায়ককে) এই action-এ চলবে না ভাই। মনে রাখবেন মিষ্টার স্বপন কুমার, আপনি এখন আর স্বপন কুমার নন। এক দুস্থ পিতা। সেটে এই-ই আপনার আসল পরিচয়। আপনাকে ভেঙে পড়তে হবে রুগ্ন সন্তানের যন্ত্রণায়। মৃত্যুর প্রহর গুণছে আপনার একমাত্র সন্তান। যে মা কাছে থাকলে এই রোগ-যন্ত্রণাতেও সন্তানটি আশ্বাস পেত, সেই মা-ও আজ কাছে নেই। আপনি সম্পূর্ণ একা। ওই feelings দিয়ে ডায়লগ বলুন। এর পরের ডায়লগেই আপনাকে ভেঙে পড়তে হবে যে। একমাত্র পুত্রকে আপনি বাঁচিয়ে তুলতে চাইবেন।

(অদূরে দাঁড়ানো আফজলের চোখে আবার মন্টুর অসহায় মুখ)

অথচ পারছেন না একটু চিকিৎসা করাতে, পারছেন না প্রয়োজনমত পথ্য দিতে। আপনি কপর্দকহীন। এমনি অবস্থায় আর্ত হাহাকারে কেঁদে উঠবে না আপনার সমস্ত সত্তা? আপনি নামকরা অভিনেতা। এই অসহায় দরিদ্র পিতাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজের মধ্যে গ্রহণ করুন।

(আফজল যেন সত্যিই সেই অসহায় দরিদ্র পিতা হয়ে উঠেছে। আর নায়ক তার চুলের ভাঁজ ঠিকঠাক করে নিচ্ছে)

www.pathagar.com

নিন, দৃশ্যটা আবার করুন। ক্যামেরা চলবে না, আপনি করে যান।

নায়ক : (অভিনয়) ছেলের এই অসুখ, অথচ কেউ আজ কাছে নেই। কি যে আমি করি!

পরিচালক : হচ্ছে না ভাই স্বপন কুমার।

নায়ক : বলছি কি স্যার, আমার মনে হচ্ছে – আমার চোখের দৃষ্টিতে কিছুটা ভাবালুতা, মানে 'কেউ কাছে নেই' কথাগুলোতে তার স্ত্রীর— মানে নায়িকার রেফারেন্স আসছে তো। তাই নায়িকার জন্যে খানিকটা প্রেম ....

পরিচালক : জ্বি না। ছেলের এই অবস্থা, এর মধ্যে প্রেম? অভিনয় আর চরিত্র সম্পর্কে কি যে ধারণা আপনাদের!

নায়ক : তাহলে ডায়লগটাই এখানে ঠিকমত দেওয়া হয় নি বলতে হবে।

পরিচালক : ঠিকমতই দেওয়া হয়েছে। কাছে তো কেউ নেই-ই। আপনি ওই 'কেউ' কথাটা আছে বলেই তার নেংটি ধরে নায়িকার কাছে বাসরশয্যায় গিয়ে হাজির হতে চান নাকি?

নায়ক : না না, তা নয়। কিন্তু 'কেউ' কথাটা যখন আছে, তখন তা বলার সময় একটা কল্পনা আসবে না?

পরিচালক : কিসের মধ্যে কি যে টেনে আনছেন, তা শুধু আপনিই জানেন। কল্পনা-টল্পনা যা-ই আসুক আপনার, অন্তত এ দৃশ্যটায় তা চেপে যান।

নায়ক : চেপে যাব?

পরিচালক : নয় তো কি? ডায়লগ বলার সময় চোখে যে ভাব আনছেন, তাতে মনে হবে চোখ মারছেন আপনি। ... যাক, আপনার মত বক্স-অফিস হিট করা নায়ক ... অথচ বোঝেন না যে জীবনটা শুধু ওই নষ্টামী-ফষ্টামীতেই সীমাবদ্ধ নয়।

নায়ক : ছবিতে কন্ট্রাক্ট করেছি, এখন যাচ্ছেতাই বলতে পারেনই তো। যাক, যদি allow করেন, তাহলে দুই ভাগে আমার conceptটা explain করি। আপনি শুনে ডিসিশ্যন নিন।

পরিচালক : বলুন কি বলতে চান।

নায়ক : মানে নায়কের এই যে নিঃসঙ্গতা, তার একটা প্রভাব নায়কের সমগ্র সত্তায় পড়বে। সে শুধু পিতা নয়, প্রেমিকও। যেভাবে নায়িকা নায়ককে ছেড়ে মধ্যরাতে চলে গেল, নায়কের হৃদয়

www.pathagar.com

ভেঙে চূরমার হয়ে গেল, কেঁদে উঠল নায়ক মনভাঙা ব্যথা-বেদনায়। এই যে ভাবটা, ডায়লগের প্রথমে এই ভাবটা আমি আনি।

পরিচালক : বেশ,আনলেন।তারপর?

নায়ক : তারপর কানে ভেসে এল সন্তানের ডাক। নায়কের সেই ভাঙা মন তখন আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু সে–ব্যাকুলতা যে সন্তানের জন্য, কে এই সন্তান? নায়ক-নায়িকারই প্রেমের দান। সেই দানের কণ্ঠে 'আব্বা' ডাক ....

পরিচালক : থাক। অত fine action আমার ছবিতে লাগবে না। আপনি মেহেরবানী করে যা করতে বললাম, তা-ই করুন।

নায়ক : কিন্তু আপনার পছন্দমত হচ্ছে না যে!

পরিচালক : হবে ভাই স্বপন কুমার, হবে। আপনি দয়া করে জীবনের দিকে তাকান। যার পার্ট বলছেন, তার সত্যিকার জীবনের দিকে! দেখবেন – সেখানে সত্যিকার নায়কের কী অসহায় অবস্থা! ওই তো দেখুন – ওই এক্সট্রার দিকে তাকিয়ে। ওই যে, ওই নতুন লোকটি। সিকোয়েন্সটায় তার চোখ ছলছল করছে, আর আপনি....

(আফজলের চোখ তখন সত্যিই ছলছল করছে)

নায়ক : দেখা যাক এবার। বরং পরের ডায়লগটা আগে রপ্ত করে নিই।

পরিচালক : ঠিক আছে। খোকা, 'আব্বা' বলে ডাকতো বাবা।

খোকা : (অভিনয়) আব্বা!

(সবাই চমকিত হয়ে ওঠে ওই ছেলের ডাক শুনে। ব্যাকুল হয়ে ওঠে আফজল)

আফজল : (নিম্ন কণ্ঠে,আপনমনে) মন্টু!

মুখলেস : (নিম্ন কণ্ঠে) আহ্, কি করেন স্যার! চুপ করেন।

নায়ক : খোকা! এই তো আমি তোর কাছে রয়েছি রে! কোন ভয় নেই বাবা, আমি তোকে বাঁচিয়ে তুলবই!

পরিচালক : কই, চোখে সেই ভাব কোথায়? গলা ধরে আসছে না কেন? আর ওই দেখুন তো এক্সট্রাকে। তার চোখ পানিতে ভেসে যাচ্ছে... অথচ আপনি যেমন ছিলেন, তেমনি রয়ে গেলেন!

নায়ক : তাহলে স্যার ওকে দিয়েই না হয় করান!

পরিচালক : জানেন তা সম্ভব নয়। সে এক্সট্রা, তাই বোধ হয় চ্যালেঞ্জটা

www.pathagar.com

দিতে পারলেন। যাক, আবার করুন। ... মনিট্যর। করুন, প্রথম থেকে।ক্যামেরা।

ক্যামেরাম্যান : Ready স্যার।

পরিচালক : ক্ল্যাপ।

(সহকারী ক্ল্যাপ দেয়)

Start .... Action.

নায়ক : (অভিনয়) ছেলের এই অসুখ, অথচ কেউ আজ কাছে নেই। কি যে আমি করি।

(হঠাৎ সব আলো নিভে যায়)

পরিচালক : কি হল?

ক্যামেরাম্যান : লাইট চলে গেছে।

সহকারী : এই, হ্যাজাক আন। (পরিচালককে)আজকে স্যার ঝড়ের সংকেত রয়েছে। তিন নম্বর।

(অন্য একজন জ্বালানো হ্যাজাক নিয়ে আসে)

পরিচালক : তাই নাকি? তাহলে লাইট আর আসবে না?

সহকারী : মনে তো হয় না স্যার।

পরিচালক : আমার কপাল! Half Shift আমার অমনি-অমনিই গেল। তাহলে কি আর করবে? প্যাক্ আপ্।

সহকারী : এই, আজ আর কাজ হবে না। প্যাক্ আপ্।

পরিচালক : এক্সট্রাদের কিছু দিয়ে বিদায় করে দাও।

সহকারী : কাজ হল না, কত করে দেব স্যার?

পরিচালক : দিয়ে দাও যা ভাল মনে কর। আমার সব মুড অফ হয়ে গেছে।

(সহকারী মুখলেস ও আফজলকে টাকা দেয়)

আফজল : কি হল মুখলেস?

মুখলেস : আজকে তো কাজ অইলো না। তাই পুরা টাকা পাওয়া গেল না স্যার। তবু ভালই দিছেন সহকারী সায়েব। চলেন স্যার।

আফজল : কিন্তু মুখলেস ... ইয়ে ... মানে ...

মুখলেস : কথা পরে অইবো স্যার। চলেন, রিক্শা কইরা চইলা যাই।

আফজল : মুখলেস ... মানে ... পথে আমার কাজ আছে। (হাতের টাকা পকেটে রাখে) তুমি একলাই যাও।

(মুখলেস আফজলকে দেখে। বুঝতে পারে – আফজলের কাজ থাকার কথাটা সত্য নয়)

www.pathagar.com

(রাত। জনবিরল আলো-আঁধারি পথে দ্রুত, প্রায় দৌড়ে, এগিয়ে যাচ্ছে আফজল। তার কানে ভেসে আসছে কিছু বিচ্ছিন্ন পরিহাস বাক্য – "এক্‌স্ট্রা ... তাও লাইট নিইভা গেল!" ... "ফালতু, ফালতু আফজল!" .. "মানুষের সমাজে এক আগাছা" ... "পরিবারের ভরণপোষণে অক্ষম এক অপদার্থ! অপদার্থ!! অপদার্থ!!!" ... একটা রিক্‌শা পাশে এসে থামে। রিক্‌শার আরোহী মুখলেস ডাকে –)

মুখলেস : স্যার! ... এই যে আফজল সায়েব!

(রিক্‌শা থেকে নামে মুখলেস)

স্যার! উঠেন রিক্‌শায়। যদি না উঠেন, তাহলে রিক্‌শা ছাইড়া দেই, দুইজনই হাঁইটা যাই।

আফজল : (প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে) পথে আমার কাজ আছে মুখলেস।

মুখলেস : না স্যার, কোন কাজ নাই – আমি জানি। আর ক্যান্ যে রিক্‌শায়ও উঠতে চান না, তা-ও জানি।

আফজল : মুখলেস!

মুখলেস : এই মুখলেসও অনেক পৌড় খাওয়া এক মানুষ স্যার! অভাব-অনটনের জীবন যে কত অপমান আর জ্বালার, হাড়ে হাড়ে তা টের পাইয়া আইজ আমি হাসি মুখে মাথা উঁচা কইরা অফিসে ফরমাইস খাঁটি, বড় সায়বের বাসার বাজার করি, এক্‌স্ট্রার পার্ট কইতে ষ্টুডিয়োতে ঢুকি। অফিসের হেড এ্যাসিসটেন্ট্, বড় সায়বের বেগম, ফিলিমের নায়ক-নায়িকা আমার দিকে করুণার হাসি ছুঁইড়া মারে। আমিও লগে লগে সেই হাসিই তাগো মুখে ছুঁইড়া মারি, তারা টেরও পায় না। এমন দিন আমারও গেছে যেদিন পকেটের সামান্য টাকা বাঁচাইয়া অসুস্থ ছাওয়ালের ওষুধ কেনার আশায় এই রকম কুচকি দৌড়ে পথ হাঁটছি!

আফজল : (দুঃখভরা নিম্ন কণ্ঠে) এর পরেও আমাকে কি করতে কও?

মুখলেস : প্রথমেই মন থাইক্যা মুইছা ফেলবেন এই বাজে ধারণাডা যে ভদ্রলোক হইলে গায়ে খাইট্যা টাকা রোজগার করা যাইব না। তার লাইগ্যা যে কোন লাঞ্ছনা-অপমান গায়ে মাইখ্যা কোন অফিসে একটা চাকরী করাই লাগব।

আফজল : আরও বল।

মুখলেস : বাজারে তরি-তরকারি বিক্রির কথা কমু না, কিন্তু পুরানা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই বিক্রি করবেন– তা ফুটপাথে বই সাজাইয়াই

www.pathagar.com

হোক, কিংবা হকার্স মার্কেটে এমনি বইয়ের কোন দোকানেই হোক।

আফজল : তার জন্যেও টাকা লাগবে তো?

মুখলেস : আমি টাকা দিমু – যা লাগে। কর্জ হিসাবে। কোনদিন শোধ কইরা দিবেন। এমনি এক বুক-ষ্টলে আমার টাকাও খাটতাছে স্যার। আর এই কাজে খাটে যারা, ভাল রোজগারই তারা করে।

আফজল : কিন্তু তুমি আমার জন্য এতটা করবে কেন?

মুখলেস : শুধু দেখতে যে একজন মানুষ তার সকল ভীরুতা-দুর্বলতা ঝাইড়া ফেলাইয়া মাথা উঁচা কইরা দাঁড়াইছেন। হক রোজগার দিয়া স্ত্রী-পুত্রের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলছেন। মাইনষের দেওয়া 'অপদার্থ' শব্দের কলঙ্কডা পুরাপুরি মুইছা দিছেন।

আফজল : (আবেগে) মুখলেস!

মুখলেস : স্যার, আপনাগো কাছে সাধারণ একটা পিয়ন অইলেও পরিচয়ে আমিও একজন মানুষ – আর দশজনের মতই এক মানুষ! ... স্যার, আপনেরই এক ভাই মনে কইরা আমার প্রস্তাবডা দূরে ঠেইল্যা দিয়েন না। মনে রাইখেন – আইজকাইল বি.এ./এম.এ. পাশ কইরাও এই কাজে লাইগা যাইতাছে অনেকে।

আফজল : না, তোমাকে পর মনে করার কোন উপায় আর নেই।

মুখলেস : তাইলে উডেন রিক্শায়। আপনেরে নামাইয়া দিয়া আমি বাসায় যামু। কাইল সকালেই আসুম টাকা নিয়া।

(দু'জনই রিক্শায় বসে। চলতে থাকে রিক্শা)

(দরজা ধাক্কায় আফজল। সাইদা দরজা খুলে দেয়। আলো-আঁধারি অবস্থা)

সাইদা : (ব্যস্তভাবে) এতক্ষণে এলে? আমার রান্না পুড়ে যাচ্ছে, মন্টু একা।

(চলে যায় সাইদা। আফজল সোজা মন্টুর বিছানার কাছে আসে)

আফজল : মন্টু!

মন্টু : আব্বু! তোমার এত রাত হল?

আফজল : তুমি কথা বলছ মন্টু! তোমার জ্বর ...

মন্টু : জ্বর কখন কমে গেছে!

আফজল : (আবেগে) কমে গেছে? আল্লাহ্!

মন্টু : তোমার চোখে পানি আব্বু?

www.pathagar.com

আফজল : মুছে দে রে মন্টু! তোর এই ছোট্ট হাতে মুছে দে।

(মন্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সাইদা এসে আফজলের মেক-আপ করা চেহারা দেখে অবাক হয়)

সাইদা : একি! কি হয়েছে তোমার? এরকম সং সেজেছ কেন?

আফজল : (সাইদাকে পকেটের টাকাগুলো দেয়) এই নাও, কয়েকটা টাকা।

সাইদা : এ টাকা কোথায় পেলে? মুখে রং চং মেখেছ কেন?

আফজল : ও! তাড়াতাড়িতে মেক-আপটা তোলার সময় পাই নাই।

সাইদা : তোমার কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না!

আফজল : মুখলেসের সঙ্গে ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে গিয়েছিলাম এক্‌স্‌ট্রা হিসাবে অভিনয় করতে। কিন্তু লাইট চলে গেল। কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তাই পুরো টাকা পেলাম না। এই টাকাটা পেয়েছি যাতায়াত আর খোরাকী বাবত। মন্টুর জন্য ওষুধ নিয়ে আসি গে'।

সাইদা : মন্টুর জ্বর থেমে গেছে। ডাক্তারের কাছে যেয়ো কাল। সন্ধ্যার আগেই আমাদের বিয়ের আংটিটা বিক্রি করিয়ে চালডাল কিনিয়েছি। এত রাতে তোমার মুখ থেকে যা শুনলাম ... তুমি মুখলেসের সঙ্গে গিয়ে এক্‌স্‌ট্রার পার্ট ....

আফজল : সাইদা, তুমি রাগ না করলে আমার অনেক কথা তোমাকে বলতে চাই।

সাইদা : যাও, বারান্দায় বসে ওই রং চং তুলে ফেল গে'।

আফজল : তুমি কি রাগ নিয়েই থাকবে সাইদা? আমার সব কথা শুনে না হয় ....

সাইদা : তোমার এই চেহারা আমি আর দেখতে পারছি না। আমি রাগ করছি না। কিন্তু এসব ধুয়ে মুছে এস। আমিও এ পর্যন্ত কিছু খাই নাই। মন্টুর জন্য বার্লি করে এনেছি। তুমি মুখ ধুয়ে এলে একসঙ্গে খেতে যাব।

আফজল : সাইদা!!... কিন্তু আমার যে অনেক পানি লাগবে সাইদা!

সাইদা : অনেক পানি দিয়ে কি করবে?

আফজল : রং তুলব সাইদা! এক্‌স্‌ট্রার মুখের রং। মনের মত মুখ পেয়ে রংটা অনেকখানি দেবে বসেছে কিনা!

সাইদা : আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না। এস।

আফজল : (সাইদার সঙ্গে বারান্দায় যেতে যেতে) কাল থেকে মুখলেসের সাহায্যে আরম্ভ করব এক নতুন জীবন!

সাইদা : (দাঁড়িয়ে গিয়ে) নতুন জীবন!

আফজল : হ্যাঁ, অপদার্থের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য এক নতুন জীবন!

www.pathagar.com

শপথ নিলাম
(কিশোর নাটিকা)

চরিত্র-লিপি ঃ

মুন্নি, শামু, আম্মা, নন্তু ও দাদু।

(বিছানায় শুয়ে অসুস্থ মুন্নি,
পাশে তার বড় ভাই কিশোর শামু।
জানলার দিকে তাকিয়ে বলে মুন্নি –)

মুন্নি ঃ ভাইয়া, দেখ – আকাশটা
কত নীল। ঝিলিমিলি
ডানা মেলে দল বেঁধে
বকগুলো উড়ছেই।

শামু ঃ মেঘ নেই, আকাশটা
তাই নীল। বকগুলো –

মুন্নি ঃ উড়ে যায়। কোথা যায়?

শামু ঃ মুন্নি, তোর অসুখ যে।
বেশী কথা বলতে মানা।

(আকাশে মেঘের মৃদু ডাক)

মুন্নি ঃ ওই যে ভাইয়া, দেয়া ডাকে!

শামু ঃ ঝড় আসবে। আকাশের
নীলটুকু কমে গেল।

মুন্নি ঃ বকগুলো চলে গেছে।
কোথায় যে গেছে– জান?

শামু ঃ ওই যে অনেক দূরে গিয়ে
পলাশতলীর বাঁক আছে না –
তার ওপারে কাজলা বিলে।

মুন্নি ঃ বকদেরও বাসা আছে?
আম্মা আছে?

শামু ঃ সবই আছে।
আব্বা- আম্মা ভাইবোন
সবাই মিলে থাকে ওরা।

www.pathagar.com

মুন্নি : কথা কয় না? কক্‌কক্‌
করে শুধু? কক্‌কক্‌?

শামু : কক্‌কক্‌ই কথা ওদের।
বক শুধু? পানকৌড়ি,
মাছরাঙা, হরিয়াল,
বালিহাঁস – কত পাখী!

মুন্নি : উড়ে আর ঘুরে বেড়ায় –
বাসায় ফিরে সন্ধ্যা বেলায়!

(আম্মা আসে)

আম্মা : এই যে মুন্নি, এতো অসুখ –
এর মধ্যেও কথা বলছো?
শামু তোকে বললাম না –
বসে থাক চুপচাপ?
কত কাজে ব্যস্ত আমি,
তাই তোকে বসতে বলা!

শামু : অনেকক্ষণবসেআছি!

আম্মা : চুপ কর। নাও মুন্নি,
ওষুধ খাও। খাও বলছি!

(আম্মা মুন্নিকে ওষুধ খাওয়ায়)

চুপচাপ শুয়ে থাক।
শামু, তুমি কাছে থাক।

(আম্মা চলে যায়। এতক্ষণের
আবহটা এমন যে একের
সঙ্গে অন্যের কথায় সঠিক
ছন্দানুসরণ হচ্ছেনা। মেঘের
স্পষ্টতর ডাক)

শামু : ঝড় বুঝি এসেই গেল!

মুন্নি : ভাইয়া, এবার ছুটি হলে
আমরা কিন্তু বাড়ী যাব।
অনেক দিন তো গ্রামে যাই না!

শামু : তাই রে মুন্নি, বাড়ীর জন্যে
মনটা পোড়ে। বুঝলি – সেবার

www.pathagar.com

খাল থেকে অনেকগুলো
মাছ ধরে না আমাদের ওই
তালদীঘিতে ছেড়েছিলাম।

(আপন মনে বলে –)

মাছগুলো সব বড় হল –
এবার গিয়ে ধরতে হবে।

মুন্নি : কথা বলতেই এত মানা!
বাড়ী কি আর যেতে দেবে?

শামু : অসুখটা তোর সারুক আগে,
বাড়ী আমরা যাবই যাব।
বুঝলি, সেবার বিষ্টি দিনে
শাড়ীপরা রাঙা পুঁটি
এত্তোগুলো ধরেছিলাম।

মুন্নি : শামু ভাইয়া, কি বোকা তুই!
মাছেরা কি শাড়ী পরে?

শামু : পুঁটি মাছে শাড়ী পরে।
বছরে প্রথম যেদিন
অঝোর–ধারা বিষ্টি নামে,
মাছগুলো সে-বিষ্টিতে
উজিয়ে চলে মনের সুখে।
পুঁটি মাছের গায়ে তখন
লাল রঙের ডোরা কাটা।
সেই হল রাঙা পুঁটির
সখ করে শাড়ী পরা।

আম্মা : (নেপথ্যে) শামু, এত কথা কেন?

মুন্নি : (নিম্ন কণ্ঠে) আচ্ছা ভাইয়া, আমরা তো
রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকি,
মাছেরাও কি তেমনি ঘুমায়?

শামু : ঠিক জানি না। তবে ওরা
যেমন খুশী ছুটে বেড়ায়।

মুন্নি : কি যে মজা! পুকুর জুড়ে
ঝিলমিলিয়ে কলকলিয়ে

www.pathagar.com

খেলে, আর খেলেই শুধু!

শামু : শুধুই খেলে। বুঝলি মুন্নি,
আমাদেরই পড়ার ঠেলা,
কত মানা! কত নিষেধ!
পাখীগুলো যেমন সুখী,
তেমনি সুখী মাছগুলোও।

(কাজের ছেলে নন্তু আসে দুধ নিয়ে)

মুন্নি : কি রে নন্তু? দুধের গেলাস –

নন্তু : আম্মা কইলেন – সবটুকু দুধ
খাওয়া লাগব।

মুন্নি : না না – আমি
দুধ খাব না। তুই খেয়ে নে।

নন্তু : কাজের মাইন্‌ষে দুধ বুঝি খায়?

মুন্নি : কেন খায় না? বেড়ালেও তো
দুধ খেয়ে যায়।

নন্তু : তা খেয়ে যায় —
কিন্তু সে তো চুপিচুপি।

(আরও জোরে মেঘ-গর্জন হয়)

শামু : ঝড় আসছে। মুন্নি, তুমি
দুধ খেয়ে নাও। গোল করো না।

মুন্নি : আমার যে কেমন করছে!

শামু : কি হয়েছে?

নন্তু : মুন্নিআপা!

মুন্নি : মনে হচ্ছে, আমার বুকে
কত কথার ভীড় জমেছে।

(আম্মা আসে)

আম্মা : মুন্নি, এমন করছ কেন?

মুন্নি : কত কথা বলতে চাই যে।
কিন্তু তুমি নিষেধ কর।

আম্মা : ডাক্তার বলেন – কথা বললে
অসুখ তোমার বেড়ে যাবে।
তুমি জান – কী আদরের,

www.pathagar.com

কত স্নেহের মুন্নি তুমি!
তাইতো আমার এত নিষেধ।
নন্তু, তুই দাঁড়িয়ে কেন?
দুধটা রেখে কাজে যা না!
শামু, তুই যা তো বাবা –
দাদুকে তোর ডেকে আন্ গে'।

(নন্তু ও শামু চলে যায়)

মুন্নি, আম্মু – কথা কয় না।
তোমার অসুখ বেড়ে যাবে।

মুন্নি : না না, আমি কথা বললেই
দু'য়েকদিনে সেরেউঠব।

(বুড়ো দাদু আসে)

দাদু : কি হয়েছে? শামু বলছে –
মুন্নির অসুখ বেড়ে গেছে।
তাহলে কি, মানে কিছু ....

মুন্নি : দাদু, আমি কথা ক'ব।

আম্মা : (দৃঢ় কণ্ঠে) না, তুমি চুপটি করে
শুয়ে থাকবে।

দাদু : বউমা,শোন।
মুন্নির আব্বা বাইরে যখন,
এ অবস্থায় কখন কি হয় ....
বলছিলাম কি, চাইছে যখন
মুন্নি না হয় কথা বলুক।

আম্মা : না না আব্বা, ডাক্তার সা'বের
সকল কথাই মানতে হবে।

দাদু : বউমা, দেখ – নিষেধ শুনে
দাদু আমার নেতিয়ে গেল।

আম্মা : ওর কাছে আপনি বসুন।
আমি যাই ডাক্তার আনতে।

(আম্মা বেরিয়ে যায়)

দাদু : মুন্নি, দাদু! আমি তোমার
মাথায় বুকে হাত বুলাচ্ছি।

www.pathagar.com

মুন্নি : আম্মা তো নেই, তুমি বরং
কথা বল – আমি শুনি।
আমি বলি, শোন তুমি।

দাদু : আস্তে আস্তে – বুঝলে দাদু,
চুপি চুপি কথা বল।

মুন্নি : নন্তু কেন দুধ খায় না?

দাদু : খায় না ... মানে ... খায়, তবে –

মুন্নি : জান দাদু, ওইদিন না –
স্যার বললেন – আল্লা'র রাজ্যে
সবাই সমান; বইয়ে লেখা!
আম্মাও যে সকাল বেলায়
কোরান পড়েন, তাতেও নাকি –

দাদু : হ্যাঁ রে দাদু – লেখা আছে।
আমি জানতাম, তবু কেমন ...
এলোমেলো হয়ে যায় রে!
তোমার মনে কালিমা নেই,
সব তাই স্পষ্ট বোঝ।

মুন্নি : শামু ভাইয়া বলে কিন্তু –
পাখীরা আর মাছগুলো
খুবই সুখী! সবাই স্বাধীন।

দাদু : হ্যাঁ ... ভাইয়া ঠিকই বলে।
মাছ-পাখীদের কথা এখন
থাক্ রে দাদু! আমি না হয় –

মুন্নি : গল্প বলবে? দেশের গল্প?

দাদু : তা-ও পারি। দেশের গল্প –

মুন্নি : এই বয়সে আগের কথা
মনে পড়ে?

দাদু : মনে পড়ে।
সরল মুখের কথা শুনে
সব কিছু মনে পড়ে।
স্বপ্ন হয়ে অনেক কথার
পাখী ওড়ে! কিন্তু এখন

www.pathagar.com

দিনগুলো যে কেমন হল ...
এমনি দিনে আমার কথা
কেই বা শোনে।

মুন্নি : আমি শুনব।

দাদু : এলোমেলো হয় যদি তা –
তবু তুমি বুঝে নিতে
পারবে দাদু? পারবে তুমি?

মুন্নি : পারব, তুমি কথা বল।

দাদু : অনেক দিন আগের কথা –
আমরা ক'জন সেই সে রাতে
স্বপ্ন দেখে জেগেছিলাম।
প্রাণ খুলে হেসেছিলাম
নতুন ভোরে, নতুন দেশে। ....
তারপরেতে কেমন যেন
অস্পষ্টতার অন্তরালে
স্বপ্নগুলো আড়াল হল।
তোমার কথায় সে-স্বপ্নেরা
আবার এসে উঁকি দিচ্ছে
আড়াল থেকে। শোলক হয়ে
বলতে চাইছে কত কথা।

মুন্নি : তাইলে দাদু শোলক বল।

দাদু : হ্যাঁ হ্যাঁ দাদু, শোলক শোন।
সেই সে দেশের শোলক-কথা ...
ফুলে ফলে ভরা যে দেশ,
যেই দেশেতে মেলা জমে
ধান-কাউনের, দোয়েল-শ্যামার
গান যেখানে, সেই সে দেশের
শোলক শোন। স্বপ্ন-শোলক।

(বাইরে কে যেন বাঁশীতে সুর তোলে)

উঠান ভরা ধান ছিল, আর
কণ্ঠ জুড়ে গান ছিল, আর
হাসি ছিল মুখে মুখে।

www.pathagar.com

আঁখের গুড়ে চালের পিঠা ...
দস্যি ছেলে মাঠ পেরিয়ে
দাঁড়ায় গিয়ে বনের ছায়ে।

(মাতাল হয়ে ওঠে বাঁশীর সুর)

শাপলা ফুলের হাতছানিতে
দস্যি ছেলে হঠাৎ করেই
ঝাঁপ দিয়েছে বিলের বুকে।

(হঠাৎ বাঁশী থেমে যায়)

তারপর যে কেমন করে
সব কিছু গুলিয়ে গেল।
ছড়িয়ে গেল, জড়িয়ে গেল
অমঙ্গলের অন্ধকারে।
প্রাণগুলো হারিয়ে গেল,
অশ্রুজলে কোন্ কন্যার
চোখের কাজল ধুয়ে গেল,
ছিঁড়ে গেল সখের শাড়ী
মেঘডুম্বুর, নয়ানসুখ।

(ক্ষণিকের নীরবতা)

মুন্নি : বল দাদু, আরও বল।
আরও তুমি স্বপ্ন দেখ।

দাদু : দুঃখভরা সেদিনগুলো
কি করে যে কেটে গেল।
আবার এসে ক্রমে ক্রমে
স্বপ্নেরা সব বাঁধলো বাসা
বুকে বুকে। উঠলো হেসে
ভোরের আলোয় নতুন দিনের
অনেক আশা। স্বপ্ন অনেক।

মুন্নি : তার পরে কি? স্মরণ কর।

দাদু : নতুন দিনের সুখের মেলায়
বুলবুলিরাওএসেছিল।
ভেবেছিলাম, বুলবুলি আর
দোয়েল-শ্যামা গান শোনাবে।

www.pathagar.com

সেই সে গানের আশায় আশায়
বসে থেকে হঠাৎ দেখি –
গানের পাখী বুলবুলিরা
ধানগুলো সব খেয়ে নিচ্ছে!

(বাইরে জোর বাতাস বইছে)

ঝড় আসছে রে! বুঝলে দাদু,
এমনি ঝড়ে কতবার যে
স্বপ্ন-সুখের ঘর ভেঙেছে!

মুন্নি : শুধু কি ঝড়? বানভাসি না?
দাদু : বানভাসি তো-ও এসে গেছে।
বন্যা এসে ডুবিয়ে গেছে!

(বাইরে ঝড়ো হাওয়া বইছে।
হঠাৎই ব্যগ্রকণ্ঠে মুন্নি বলে-)

মুন্নি : নন্তু কোথায়? কাজের ছেলে?
দাদু : তবে কি সে হারিয়ে গেল?

(আকাশে বজ্রনাদ হয়)

মুন্নি : না না দাদু, হারিয়ে যাওয়ার
কথাগুলো আর বলো না!

(মুহূর্তে স্মৃতিমগ্ন হয় দাদু)

দাদু : মুন্নি, তুমি শোলক শোন!
ঝড়-তুফান আর বন্যা-শোলক।
সে দুর্যোগে কাজলা দিদি
কোথায় গেল, শোলক শোন!

(আকাশে আবার বজ্রনাদ)

মুনি, তুমি ভয় পেয়েছ?

(উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে মুন্নি বলে-)

মুন্নি : দাদু, দাদু! ডাক্তার নিয়ে
আব্বা হয়তো আসছে ফিরে!

(তখনই শামু আসে)

শামু : মুন্নিমণি, কি হয়েছে?
মুন্নি : ভাইয়া, তুমি কোথায় ছিলে?
শামু : ঘরের পাশে, বাইরে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

দাদু : দাদু, এমন ঝড়ে তুমি ...
মুন্নি : ভাইয়া, তুমি এ দুর্যোগে ...
শামু : মুন্নি, দাদু! ভয় পেয়ো না –
বাইরে আমার যেতেই হবে।

(চলে যায় শামু। বাইরে ঝড়ের
সঙ্গে গুলির শব্দের মত শব্দ)

মুন্নি : (উচ্চ কণ্ঠে) দাদু, দাদু!
দাদু : এই যে মুন্নি, –
শিয়রে তোর বসে আছি।
শামুরা তো বাইরে যাবেই।
মুন্নি : (উদ্‌ভ্রান্তের মত) ডাক্তার আমায়
ভয় দেখাচ্ছে!
দাদু : আমি তোমার পাশে আছি।
আমরা তো আর ভয় পাব না।

(ক্ষণিকের নীরবতা। শান্ত কণ্ঠে
মুন্নি বলে–)

মুন্নি : দাদু, তোমার শোলক-কথা?
বলবে না আর, শুনবো না কি?
দাদু : চুপটি করে শুয়ে তুমি
কথা শোন। হাজার কথার
কথকতা! আমার দেশের –

(আম্মা আসে ব্যস্ত হয়ে))

আম্মা : মুন্নি আমার ভাল আছে?
দাদু : হ্যাঁ বউ, মুন্নি শুয়ে আছে।
আম্মা : কথা বলতে চাইছে আবার?
দাদু : না না, এবার শুনতে চাইছে।
আম্মা : কে শোনাবে এত কথা?
দাদু : মুন্নি বলে – আমিই যেন
কথা শোনাই, শোলক-কথা।
আম্মা : ধীরে ধীরে বলে যাবেন।

www.pathagar.com

ডাক্তারকে পেলাম না তো,
যাই, দেখি কোথায় শামু –

(আম্মা চলে যায়)

দাদু : মুন্নি, তুমি ঘুমিয়ে গেছ?
মুন্নি : না দাদু, না। কথা শুনছি।

(তখনই শামু আসে)

দাদু : এই তো শামু! কি হয়েছে?
শামু : কে ওই দূরে, গান গাইছে!
দাদু : হ্যাঁ হ্যাঁ, কে গান গাইছে!

(বাইরে থেকে গান ভেসে আসে)

গান।। আমার দেশের মাঠে বাটে
মায়ের ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল।
আমার দেশের আকাশ পারে
শতেক মায়ার প্রীতির কাজল।।

(গান দূরে মিলিয়ে যায়।
আত্মমগ্নভাবে দাদু বলে –)

দাদু : বন্যা এল, বন্যা গেল ...
আসবেআবার,আবারযাবে।
মড়ক এল, মড়ক গেল ...
আসবেআবার,আবারযাবে।
দুঃখ-ক্ষুধা-জরা-ব্যাধির
সঙ্গে থেকেই স্বাধীন জীবন
পেতে সবাই করছে লড়াই
অবিরত, লড়ে যাচ্ছে সাধ্যমত।
হাজার কথার এক কথা যে –
আমার স্বদেশ। প্রাণের চেয়ে
দামী সে যে, সোনার চেয়ে
খাঁটি এ দেশ। আশা আছে,
হাজার আশা– গান শোনাবে
দোয়েল-শ্যামা। ফলবে সোনা
মাঠে মাঠে, ঘাটে ঘাটে
ভিড়বে তরী, বসবে মেলা

www.pathagar.com

বটের মূলে! সুখের মেলা!

(আবার আকাশে হঠাৎ বজ্রনাদ।

উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে দাদু –)

শামু, তোরা বর্গী চিনিস?

শামু : চিনি দাদু, বর্গী চিনি।

দাদু : বর্গীরা চায় ভাঙতে মেলা।
তাদের সামনে দাঁড়া তবে
বুক ফুলিয়ে। এই আমাদের
দেশের দাবী। মাটির দাবী।

শামু : দাদু, তোমায় কথা দিলাম –
আমরা সবাই জাগ্রত আজ!

মুন্নি : দাদুর এ-দেশ, মায়ের এ-দেশ,
আমার এ-দেশ তীর্থভূমি!

দাদু : হ্যাঁ রে দাদু, সেরা সত্য।
সবাই তোরা তরুণ এখন –
তোদের দিকেই থাকবে চেয়ে
এ-দেশ তোদের স্বপ্নভূমি!

শামু : কথা দিলাম, শপথ নিলাম –
প্রাণ দিতে হয়, তা-ও দেব।

দু'জনে : রক্ষা করবো দেশের মাটি!
কথা দিলাম, শপথ নিলাম।

www.pathagar.com

সাতচল্লিশোত্তর আমাদের মঞ্চ-নাট্য

দ্বি-রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্তে ১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগষ্ট পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। বিভক্ত হয়ে গেল বৃটিশ আমলের বাংলা দেশ। এ যাবৎ বাংলা নাট্যান্দোলন ও নাট্যাভিনয়ের পীঠভূমি কলকাতার সঙ্গে আমাদের এই জনপদের সম্পর্ক বলতে গেলে ছিন্নই হয়ে গেল। পূর্ববাংলার 'প্রাদেশিক রাজধানী' এই ঢাকা নগরী হল আমাদের জন্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডের কেন্দ্রস্থল। মনে রাখতে হবে, তখনকার ঢাকা নগরী একটা জেলা শহর মাত্র। পেশাদার-অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর জন্য এমন একটা সাধারণ মিলনায়তনও ছিল না ঢাকায় যেখানে সাময়িকভাবেও দর্শকদের সম্মুখে রুচিসম্মত ভাবে কোন নাট্যানুষ্ঠান করা যেত। ঢাকা শহরের আগেকার নাট্যোন্মাদনা ততদিনে থিতিয়ে এসেছে। নাট্যানুষ্ঠানের কর্মকান্ড বলতে গেলে চল্লিশের দশকে এক রকম শেষই হয়ে গেছে।

ঢাকা শহরে নাট্যক্ষেত্রের অবস্থাটা তখন কেমন ছিল? অন্যান্য মফস্বল শহরের মতই। ইনি বা তিনি সুযোগ পেলে নাটকে অভিনয় করেন- এমন কেউ কেউ ছিলেন এখানে-সেখানে। সর্বজনাব নাজির আহমেদ, হাবিবুল হক, ফতেহ্ লোহানী, কাজী খালেক, বিনয় বিশ্বাস, রণেন কুশারী প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব তখন ঢাকায় সমবেত (প্রধানত বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে) যাঁরা সাতচল্লিশের আগে থেকেই নাটক, নাট্যাভিনয় ও সিনেমার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলকাতার নাট্যাভিজ্ঞতা নিয়ে ঢাকায় আরও এলেন সর্বজনাব নুরুল আনাম খান, আবদুল মজিদ, নূরুল ইসলাম এবং আরও দু'একজন। কিন্তু এঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন এখানে-সেখানে, ব্রতশীল নাট্য-সাধনার জন্য সংগঠিত ছিলেন না। একমাত্র নাজির আহমেদ ছাড়া প্রায় সবারই নাট্য-জ্ঞানের ভান্ডারে সঞ্চিত তখন কলকাতার প্রমোদ নাটকের কিছু সঞ্চয়। জনাব নাজির আহমেদ ছিলেন বিদেশী নাটকের সঙ্গে পরিচিত এক নাট্যব্যক্তিত্ব। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, আধুনিক নাটকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তিনিই জনাব ফতেহ্ লোহানীকে লন্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনিও শিক্ষা সমাপনের আগেই চলে আসেন দেশে। অগত্যা নাজির আহমেদ সাহেব রেডিওকে কেন্দ্র করেই আমাদের নাটকের শূন্য ভান্ডারে কিছু পুরে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত।

কালেভদ্রে ঢাকায় তখন এখানে-সেখানে নাট্যানুষ্ঠান হয়। তা-ও কলকাতার সেই প্রমোদ নাটক। এক বা দু'রাত্রির জন্য সে-নাট্যানুষ্ঠানকে কোন রকমে ম্যানেজ করা হয় মাত্র। কলকাতায় চল্লিশের দশকে যে নব-নাট্যান্দোলন, তার সঙ্গে এখানকার কারুরই তেমন সংযোগ ছিল না। উল্লেখ করা যেতে পারে

www.pathagar.com

যে, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে সে নব-নাট্যান্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন প্রধানত সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারীরাই। আই. পি. টি' এ বা গণনাট্য সংঘ ছিল সে-আন্দোলনের সংগঠক। ঢাকায় তখনো তার ঢেউ ততটা এসে লাগে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-ব্যক্তিত্বরা সাতচল্লিশের কিছু আগে এবং পরে-পরেই ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন। সব কিছু তখন নতুন করে আরম্ভ করার পালা। এমন কি, মাহবুব আলী ইনষ্টিটিউটের মত রেল-কর্মীদের নাট্যমঞ্চসম্পন্ন মিলনায়তনটিতেও তখন পাকা প্ল্যাটফর্মটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রমোদ নাটকের সেইসব পটে আঁকা দৃশ্যাবলী, উইংস, সাজসজ্জা, নাট্য-সংগ্রহ সব কিছু উধাও। হিন্দু ছাত্রদের জন্য নির্মিত ঢাকা হলে জগন্নাথ হলে আগে বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান হত জাঁকজমকের সঙ্গে (কলকাতার সেই প্রমোদ নাটক)। তা-ও ফাঁকা। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে নাট্যাভিনয়ের বাসনা জাগলে তার পরিচালনার জন্যে ধর্না দিতে হত রেডিওর সঙ্গে জড়িত পূর্বোক্ত নাট্যব্যক্তিত্বদের কাছে। তাঁরা আবার প্রধান প্রধান চরিত্রাভিনয়ের জন্য তাঁদের মধ্য থেকেই কাউকে কাউকে নিতে হবে বলে শর্ত উত্থাপন করতেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের এক ফাংশনের জন্য তখনকার ছাত্র মুনীর চৌধুরীরই স্বরচিত একাঙ্কিকা তাঁরই নেতৃত্বে ও পরিচালনায় অভিনীত হয়, এবং সাফল্যের সঙ্গেই।

আর একটি ঘটনার কথা বলছি। তাতে আমার নাম জড়িত থাকলেও বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তখনকার নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থার একটা খন্ড চিত্র তুলে ধরা। ১৯৪৯ সালে ফজলুল হক হলে বার্ষিক নাট্যাভিনয়ে আমার প্রকাশিত প্রথম নাটক 'বিরোধ' মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। ছদ্মনামের জন্য নাট্যকার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। হল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'বিরোধ'-এর নির্বাচন করেছিলেন সর্বজনমান্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তাঁর নাকি যুক্তি ছিল ঃ মুসলমান সমাজ নিয়ে মুসলমান রচিত এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটির মঞ্চায়ন প্রয়োজন। এর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পরলোকগত দুই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সর্বজনাব মুহম্মদ আবদুল হাই (বাংলা বিভাগ) ও জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার (ইংরেজী বিভাগ) উপর। শেষ পর্যন্ত জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব একাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কার্জন হলে ষ্টেজ বেঁধে মঞ্চস্থ হচ্ছে 'বিরোধ'। নাট্যারম্ভে হলের প্রভোষ্ট ডক্টর আবদুল হালিম সাহেব মঞ্চে এসে হাত জোড় করে (আক্ষরিক অর্থেই) দর্শকবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানালেনঃ এই প্রথম মুসলমান সমাজের উপর একজন মুসলমান নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। দর্শকদের চোখ-কানের অভ্যাসে

www.pathagar.com

হয়তো বিসদৃশ নাড়া লাগবে। তাঁরা যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিয়ে নাট্যাভিনয়ের পুরোটাই দেখে যান। অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে চলে না যান।

ঝাড়া সাড়ে চার ঘন্টার নাটক। সেই পুরনো প্রয়োগ পদ্ধতিতে। না, কেউ চলে যান নি। নিজেদের নাটক মনে করেই হয়তো তাঁরা উপভোগই করেছিলেন যথেষ্ট অব্যবস্থায় মঞ্চস্থ নাটকটি। পরের রাত্রের অভিনয় অতিথিদের জন্য। তখনকার রীতি অনুযায়ী ভাল অভিনয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হত। সে-রাত্রে পুরস্কারের জন্য বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন– সর্বজনাব ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক অজিত গুহ ও মুনীর চৌধুরী। কাজী সাহেবের ছাত্র ছিলাম বলে এই নাটকের রচয়িতা যে আমি তা তিনি জানতেন। রীতি অনুযায়ীই বিচারক মন্ডলী যখন গ্রীনরুমের পাশে 'জলযোগের' উদ্দেশ্যে মঞ্চ–এলাকায় ঢুকেছেন, তখনই তাঁদের সামনে পড়ে গেলাম আমি। অতর্কিতে। কাজী সাহেব চিনিয়ে দিলেন, মুনীর চৌধুরী আমার হাত ধরলেন। নিয়ে চললেন 'জলযোগের' জায়গায়। সে-রাত্রে যে আদর পেলাম তাঁদের কাছ থেকে, পরবর্তীতে অনেক বড় সম্মানও তার তুলনায় নেহায়েত পানশে। মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে তখন থেকেই আমার বন্ধুত্ব।

এমনি পরিস্থিতিতেই আরম্ভ হল আমাদের নাট্যচর্চা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে, বিভিন্ন কলেজে সাধারণত দু'রাত্রির জন্য বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান হত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক বা আয়ত্তাধীন থাকলে আজও যেমন হয়। তাছাড়া ঢাকায় বিভিন্ন সরকারী–বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হত, যেমনটি করা হয় আজও। আলাদা কোন প্রদর্শনী-গৃহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যানুষ্ঠানগুলো হত কার্জন হলের প্ল্যাটফর্মের উপর সাময়িক মঞ্চ তৈরী করে। বাইরের নাট্যানুষ্ঠানের জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হত মেহবুব আলী ইনষ্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট (কিছুকাল পরে নির্মিত এবং ইসকান্দার মির্জা হল নামে প্রথম দিকে পরিচিত) প্রভৃতি। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, নাট্যানুষ্ঠানের জন্য ছিল তখন গোটা কতক দুর্দশাগ্রস্ত অস্থায়ী প্রদর্শনী মঞ্চের লভ্যতা, অপর্যাপ্ত শ্রুতি ও আলোক নিয়ন্ত্রণের বিরক্তিকর আয়োজন। এক কথায়, এক সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি।

আর নাটক? কলকাতার নাটকের অভিনয়ই হত বেশি করে। তবে যত দিন যেতে লাগল, আমাদের রচিত নাটকও অভিনীত হতে থাকল ক্রমবর্ধমান হারে। এমনি পরিস্থিতিতে নাটক যারা লিখতাম, তারা পয়সাকড়ি কেমন পেতাম? আমার নিজের কথাই বলি। প্রাণপণ চেষ্টায় টাকা জোগাড় করে সেই টাকায় রচিত নাটক ছাপাতাম। এম.এ-সি. শেষ পর্বের পরীক্ষা দিতে গিয়ে হলের পাওনা মিটিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে পড়লাম সংকটে। শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

নিজেরই টাকায় ছাপানো ৮০০ কপি 'বিরোধ' নাটক সর্বস্বত্বসহ এক প্রকাশকের কাছে দু'শ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে সংকট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম।

নাট্যচর্চার পরিস্থিতি নির্ণীত হয় যা দিয়ে তা হচ্ছেঃ সমাজের নাট্যসংস্কার, একাজে ক্রিয়াশীলদের নাট্য-অভিজ্ঞতা, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিবেচনা, প্রায়োগিক উপকরণের লভ্যতা, বিরাজমান প্রয়োগ-পদ্ধতি, নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সকলের নাট্য-মানস।

সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরের সময়টায় এদেশের নাট্যসংস্কার ছিল একাজের পরিপন্থী। যে কোন স্তরেরই মেয়েদের নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল অকল্পনীয়। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া নাট্যকর্মীদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। যা কিছু ছিল, তা-ও সেই প্রমোদ নাটকের। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিবেচনায় তখন নতুন জাতিসত্তার জটিলতা। উৎকৃষ্ট নাট্যানুষ্ঠানের উপযোগী প্রায়োগিক উপকরণ মোটেই সহজলভ্য ছিল না, বলতে গেলে লভ্যই ছিল না। যেনতেন প্রকারে নাটক মঞ্চস্থ করার সেই সময়টাতে প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে ভাবনার অবকাশই বা থাকে কি করে? নাট্যরচনায় আমরা ব্রতী হই যখন, তখন আমাদের সামনে ইব্রাহীম খাঁর 'কামাল পাশা' জাতীয় কিছু রচনা। তা-ও বলতে গেলে শুধু পড়বার জন্যই। সর্বোপরি, সামগ্রিকভাবে কলকাতার পেশাদার নাটুকেদের নাট্যাভ্যাস থেকে ধারে পাওয়া কিছু নাট্য-জ্ঞানই তখন মোটামুটিভাবে আমাদের মানস-লোকে বিরাজমান।

দেশ-বিভক্তির পরেও সারা বাংলাদেশ জুড়ে শহরে-গঞ্জে নাট্যানুষ্ঠান হত, যেমন হত দেশ-বিভক্তির আগেও। সেসব কলকাতার প্রমোদ নাটক। ঢাকাতেও হত তা-ই। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই চিরাচরিত নাট্যাভ্যাসে সংযোজিত হল এক নতুন চেতনা।

এদেশের নাটক চাই। কিছুদিন আগে-পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ফাঁকে নাট্যকর্মে কমবেশি নিয়োজিত ছিলাম তিনজনঃ জনাব নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী এবং আমি। প্রখ্যাত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান সাহেব সরকারী কলেজের অধ্যাপক। তিনিও মাঝেমধ্যে নাটক লেখেন। কলকাতার 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় দেশ-বিভক্তির আগেই প্রকাশিত প্রশংসাধন্য নাটক 'নেমেসিস'-এর নাট্যকার নূরুল মোমেন তখনকার প্রথম দিকটাতে বিদেশে আইন অধ্যয়নে রত। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র (পরে বাংলা সাহিত্যেরও) পাশ্চাত্য নাটকের সহিত সুপরিচিত মুনীর চৌধুরী ছাত্র জীবনের অবসানে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত, মফস্বল কলেজে চাকুরিরত। আর পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ছাত্র আমি 'এদেশীয়' নাটক রচনার জন্য উৎসাহব্রতী। ধরা

www.pathagar.com

যাক ১৯৫১ পর্যন্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একা আমিই অধ্যাপনা ও নাটক নিয়ে চর্চা করছি। আমার নাট্য-জ্ঞানের ভান্ডারে কিছু সঞ্চিত তখন কলকাতার প্রমোদ নাটকের অভিজ্ঞতা। তবে ততদিনে সেখানেও পেশাদারী নাট্য ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে আর একটি মাত্রা : বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তর', 'দুই পুরুষ' ইত্যাদি। এসব নাটক শুধু অভিনেয়ত্বে নয়, সাহিত্য মূল্যেও উজ্জ্বল। সর্বোপরি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। এদেশীয় নাটক লিখতে হবে বলে ভেবে-চিন্তে ঠিক করলামঃ নাগরিক জীবনের ড্রইংরুম মডেলের নাটক নয় (সে-জীবন তখন এখানে ছিলও না বলা চলে), আমাদের জন-জীবন নিয়েই নাটক লিখব। 'দ্বীপান্তর'-এর টেকনিক আমার কিছুটা আয়ত্তাধীন, কিন্তু 'নবান্ন'র টেকনিক নয়। নবান্নর অভিনয়ও দেখি নি। পুরনো টেকনিকে তাই রচিত হল আমার তৃতীয় নাটক 'বিদ্রোহী পদ্মা'। (অবশ্যই দ্বীপান্তর-নবান্নের যোগ্যতা নিয়ে নয়। তবে সবদিক থেকেই এদেশীয়)।

তখনই আমাদের জীবনে এল ১৯৫২। একুশে ফেব্রুয়ারী। আমাদের জাতিসত্তার বিবেচনায় সংযুক্ত হল এক নতুন চেতনা। স্ব-পরিচিতি অন্বেষার এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। সাতচল্লিশের অনেক প্রত্যাশা মারণাঘাতে মুমূর্ষু হল মাত্র বছর পাঁচেক যেতে না যেতেই। মাতৃভাষার দাবীতে জীবন-দান, যে কোন দেশের ইতিহাসে এ যে অভাবিত-পূর্ব, অভিনব। ফলতঃ এর প্রভাব সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করে বেশি করে। তদনুযায়ী নাট্যক্ষেত্রেও। বিশেষ করে নাটক রচনার ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। নুরুল মোমেন সাহেবও ফিরে এসেছেন বিদেশ থেকে। একুশের ঘটনা নিয়ে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন 'কবর'। আমিও রচনা করি 'দুর্যোগ' নামে এক নাটিকা। এর পর অপ্রত্যক্ষভাবে একুশের চেতনা নিয়ে রচিত হয়েছে অন্যান্য নাটক- আমার অগ্নিগিরি, রক্তপদ্ম, অনেক তারার হাতছানি; আলাউদ্দিন আল-আজাদের মরক্কোর যাদুকর; আলি মনসুরের বোবা মানুষ; শওকত ওসমানের আমলার মামলা, কাঁকরমণি ইত্যাদি ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক। সব নাটকেই প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধিকার ও সংগ্রামী চেতনার সুর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্বোধন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের তিন নাট্যকারের মধ্যে আমিই নাটক লিখি বেশি করে। সেই নাটক বিভিন্ন ছাত্রাবাসে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করি। কমবেশি কাজটা করি তিনজনই; তবে একাজে আমিই ছিলাম বেশী উৎসাহী। আরম্ভে তো ছেলেরাই মেয়ে সাজত। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে মেয়েরাই মেয়ে হয়ে মঞ্চে দেখা দিতে আরম্ভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের

www.pathagar.com

আমরা অভিনয় শেখাতে সাহায্য করি। অতি অল্প সময়েই নাট্যক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নাট্য-তরঙ্গ ঢাকা নগরীর সর্বত্রই তখন দোলা দিচ্ছে। শুধু নগরীতে কেন, বলা চলে সমগ্র দেশেই।

বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারিক জনাব শামসুল হক সাহেব সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৪৭-১৯৬৯'-এ অনুবাদসহ ৫৪১ খানা প্রকাশিত নাটকের তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য থেকে পরিসংখ্যানগত হিসাব অনুযায়ী ১৯৪২ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই ৪ বছরে প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ১১; ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরে সেই সংখ্যা ৫২; ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ৯৬; ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ১৬৩ এবং ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ২১৯। শতকরা হিসাবে প্রথম ৪ বছরে ২·০ ভাগ, পরের প্রতি ৫ বছরে যথাক্রমে ৯·৬ ভাগ, ১৭·৭ ভাগ, ৩০·১ ভাগ এবং ৪০·৫ ভাগ। স্পষ্টতই নাটক রচনার সংখ্যা তখন ক্রমান্বয়ে বেশি করে বেড়ে চলেছে।

ওসব নাটক যে যে স্থানে প্রকাশিত হয়েছে, তার জেলাওয়ারী শতকরা হিসাব হচ্ছেঃ ঢাকায় শতকরা ৪৭·০ ভাগ, বগুড়ায় ১৭·১ ভাগ, বরিশালে ৭·২ ভাগ, চট্টগ্রামে ৬·০ ভাগ, ময়মনসিংহে ৪·২ ভাগ, নোয়াখালিতে ৩·৫ ভাগ, কুমিল্লায় ৩·৫ ভাগ, কুষ্টিয়ায় ২·৩ ভাগ, যশোরে ১·৪ ভাগ, রংপুরে ১·৪ ভাগ, সিলেটে ১·৪ ভাগ, খুলনায় ১·২ ভাগ, ফরিদপুরে ১·২ ভাগ, পাবনায় ০·৬ ভাগ এবং দিনাজপুরে ০·৫ ভাগ। উপরিউক্ত তথ্যসমূহকে খুব নির্ভুল মনে না করলেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সাতচল্লিশোত্তর কালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতাজনিত আবেগ যথেষ্ট চেতনাসমৃদ্ধ হয়েছে, এবং তা শুধু রাজধানী ঢাকা নগরীতেই নয়- কমবেশি বাংলাদেশের সর্বত্রই। ১৯৬৩ সালে জাপানের টোকিও মহানগরীতে অনুষ্ঠিত এক ড্রামা সেমিনারে ভাষণ দিতে গিয়ে মুনীর চৌধুরী বলেছিলেন : "গত পনের বছরে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উল্লেখযোগ্য নাট্যগুণ সম্পন্ন পঁচাত্তরটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক নাটক পান্ডুলিপি থেকেই মঞ্চস্থ হয়েছে। বছরের পর বছর সামাজিক অবস্থা বিশেষের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা নাটক সমকালীন জীবন ধারার মূলীভূত মানবিক দোষগুণ ও সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরছে। ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীমূলক নাটক স্পষ্টতঃ হ্রাস পেয়েছে যদিচ কখনো কখনো নাট্যকারগণ নতুন ও নিকট কিছুকে গৌরবান্বিত করার মানসে পুরনো কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসব নাটকে হয়তো লক্ষণীয় কোন পরিপূর্ণতা আসেনি, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এদের মধ্যে মহৎ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।"

www.pathagar.com

আলোচ্য সময়ে ২৭৮ জন নাট্যকার উপরিউক্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' নাটক রচনা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে ওসব নাটকের অধিকাংশই সফল মঞ্চাভিনয়ের জন্য ছিল অনুপযোগী। তার অর্থ এই যে এই ২৭৮ জন নাট্যকারের অনেকেই মঞ্চসফল নাটক রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলা যায় যে নাটক রচনার জন্য বিপুল প্রয়াস বিরাজমান ছিল সারা দেশে। গুণগত উৎকর্ষের কথা বাদ দিলে ওই সময়ে নাট্যপ্রয়াসী ও তাঁদের রচিত-প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা সেই প্রয়াসের বিপুলত্বই প্রমাণ করে। এঁদের রচিত নাটকের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায়ঃ শতকরা প্রায় ২২ ভাগ নাটক হচ্ছে ঐতিহাসিক, প্রায় ৭০ ভাগ সামাজিক, প্রায় ৪ ভাগ লোক কাহিনীভিত্তিক এবং প্রায় ৪ ভাগ অন্যান্য বিষয় নিয়ে রচিত। স্বাধীনতা-পূর্ব কালের সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শতকরা অনুপাতটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের মধ্যে ওলট-পালট হয়ে গেছে। স্বাধীনতা-পূর্ব কালের ঐতিহাসিক নাটকের অনুপাতটা স্বাধীনতা-উত্তর কালে সামাজিক নাটকের ভাগে পড়েছে।

এবার উপরিউক্ত ২৭৮ জন নাট্যকারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় খ্যাতিমানদের একটা সংক্ষিপ্ত খতিয়ান নীচে দেওয়া হলঃ

নাটকের নাম (নামের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)	নাট্যকারের জন্ম সাল	প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা	
অন্নদা মোহন বাগচী	–	১০	
আনিস চৌধুরী	১৯২৯	২	
আবদুল হক	১৯২০	৯	(৭টি ইংরেজি নাটকেরঅনুবাদ)
আবুল ফজল	১৯০৩	৪	
আজিম উদ্দিন আহমদ	১৯০৪	৪	
আলাউদ্দিন আল-আজাদ	১৯৩২	৩	
আলী মনসুর	–	৪	
আসকার ইবনে শাইখ	১৯২৫	১৭	(১টি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)
ইব্রাহীম খলীল	১৯১৭	৪	
ইব্রাহীম খাঁ	১৮৯৪	৩	

www.pathagar.com

ওবয়েদ-উল-হক	১৯১২	৭	
কবীর চৌধুরী	১৯২৩	৮	(সবকটিই ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)
কল্যাণ মিত্র	১৯৩৯	১৪	
গোলাম রহমান, এম.	–	১০	
কবি জসীমুদ্দিন	১৯০৪	৫	
নূরুল মোমেন	১৯০৮	৭	
প্রসাদ বিশ্বাস	–	৯	
বজলুর রশীদ, আ. ন. ম.	১৯১১	৮	
মুনীর চৌধুরী	১৯২৫	৭	(২টি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)
শওকত ওসমান	১৯১৯	১০	(৫টি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)

এখানে আবার উল্লেখ করছি যে উনিশ শ' সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সময় পূর্ববাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তান নামের এই জনপদে বলতে গেলে তেমন কোন বিশিষ্ট নাট্য-ঐতিহ্য ছিল না। "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাই দেখা গেল আমাদের কোন রঙ্গমঞ্চ নেই, নেই পেশাদার বা সৌখিন কোন নাট্য-সম্প্রদায়। শক্তিশালী নাট্যকার, পরিচালক বা অভিনেতা স্বভাবতঃই দুর্লভ। আছে নাটকের প্রতি সন্দিগ্ধ রক্ষণশীল সমাজ, জীবনের সঙ্গে যোগবিহীন কিছু নাটক, মান্ধাতার আমলের মঞ্চ সজ্জা, দৃশ্যপট ও আলোক ব্যবস্থা। শুরুতে যে অবস্থা দেখা গেল তার সঙ্গে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মঞ্চ ও অভিনয়ের তুলনা করলে দেখা যায়, পূর্ব-পাকিস্তানে নাটক ও অভিনয় তখনও গিরিশ যুগের পেছনে।" (পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্য আন্দোলনের বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাসঃ ঢাকা মঞ্চ, রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্রিকা সংযোগ, ১৯৬৫, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩)।

১৯৫০ সাল সেদিনের 'পূর্ব-পাকিস্তান'-এর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্মরণীয় এজন্য যে ঢাকার 'ডক্টর্স ক্লাব'-এর উদ্যোগে মেহবুব আলী ইনষ্টিটিউটে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায়ের 'বিজয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ওই সালের শেষের দিকে। তাতে সহ-অভিনয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন মিসেস সারওয়ার মোর্শেদ, ডাঃ মেহেরুন্নেসা, রাজিয়া খান, মুনীর চৌধুরী, ডাঃ শামসুল আজম প্রমুখ শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গ। পরিচালনা করেন হাবিবুল হক। মরহুম হাবিবুল হকের নাম আমাদের নাট্যান্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবার মত একটি নাম। কেবল 'বিজয়া' নয়, সাতচল্লিশোত্তর কালের প্রথম দিকটায় সহ-অভিনয় সমৃদ্ধ আরও দু'টি নাটক-

www.pathagar.com

হাবিব প্রডাকশন কর্তৃক বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি' ও সংস্কৃতি সংসদ নিবেদিত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' – জনাব হাবিবুল হকের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। ওই সময়ে মেডিক্যাল কলেজের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ও সাংবাদিক ইউনিয়নের 'নীলদর্পণ' – এও সহ–অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ–অভিনয়ের ব্যাপারে বিধি–নিষেধ ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা 'সংস্কৃতি সংসদে'র মাধ্যমে সহ–অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে 'জবানবন্দী' মঞ্চস্থ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মেহবুব আলী ইনষ্টিটিউটে। পরে চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক শিল্পী গোষ্ঠী'ও 'জবানবন্দী' মঞ্চস্থ করেন এবং সম্ভবত তাতেই সেখানে প্রথমবারের মত প্রচলিত হয় সহ–অভিনয়।

"পূর্ব–পাকিস্তানের নাট্যান্দোলনের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসে আরও কয়েকটি স্মরণীয় পরিবেশনা হল 'ছেঁড়া তার', 'ষোড়শী', 'নার্সিং হোম' এবং 'পথিক'। 'ছেঁড়া তার' – এর উদ্যোক্তা ছিলেন সুরশিল্পী আব্বাস উদ্দিন। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীও যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। 'নার্সিং হোম' নাটকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শরফুল আলমের মঞ্চ পরিকল্পনা। শরফুল আলম প্রথম আমাদের গতানুগতিক মঞ্চসজ্জার মধ্যে বৈচিত্র আনয়নে সচেষ্ট হন। 'পথিক' নাটক সংস্কৃতি সংসদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪)।

আমাদের নাট্যান্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের অভিনয় প্রয়াসকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যদিও সেখানে তখন কোন সংগঠিত নাট্যগোষ্ঠী ছিল না, তবুও বিভিন্ন ছাত্রাবাস, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয় নি) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্য প্রশিক্ষণ ও নাট্যান্দোলনের ধারাকে বেগবতী করে তাকে অব্যাহত রেখেছেন। আর সেই ধারাই ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হয়েছে সারাদেশে। আবার অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলামের কথায়, "স্মরণীয় যে প্রথম যুগের ডক্টরস ক্লাব বা সংস্কৃতি সংসদ এবং পরবর্তীকালের নাট্যগোষ্ঠী 'ড্রামা সার্কেল', বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'কবয়ঃ' এবং 'মেঘনাদ বধ কাব্য' অংশ বিশেষের নাট্য রূপায়ণ, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের 'কেরানীর জীবন' নাটক কেবল আনুষ্ঠানিক সহ–অভিনয়ের অনুমতি লাভের জন্যই নয়– সুষ্ঠু পরিবেশনার জন্যেও উল্লেখযোগ্য। মুনীর চৌধুরী কৃত শ' – এর 'ইউ নেভার ক্যান টেল' – এর রূপান্তর 'কেউ কিছু বলতে পারে না'র সার্থক মঞ্চ রূপায়ণ এবং বিজ্ঞান সম্মেলনে অভিনীত 'হ য ব র ল' পরিবেশিত গীতিনাট্য 'তাসের দেশ' ১৯৫৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণীয় অভিনয়। ১৯৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

ছাত্র ইউনিয়ন কার্জন হলে সপ্তাহব্যাপী নাট্য উৎসবের আয়োজন করে। পরপর সাত রাত ধরে অভিনয়ই এ নাট্য উৎসবের মূল কথা নয়। এ উৎসবে নতুন কিছু করবার চেষ্টা ছিল। বনফুলের 'কবয়ঃ', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র', মুনীর চৌধুরী রূপান্তরিত 'কেউ কিছু বলতে পারে না' মঞ্চস্থ করতে গিয়ে গতানুগতিক মঞ্চ, দৃশ্য ও আলোক সজ্জার পরিবর্তে এসেছে নতুন পরিকল্পনা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এ বছরের আর একটি পরীক্ষামূলক পরিবেশনা ২১শে ফেব্রুয়ারীর পটভূমিকায় রচিত মুনীর চৌধুরীর 'কবর'। পরের বছর সিপাহী বিদ্রোহের শত বার্ষিকী উপলক্ষে আসকার ইবনে শাইখের 'অগ্নিগিরি' নাটক ঐতিহাসিক নাটকের ঐতিহ্যকে জাগ্রত করে তোলে আমাদের সামনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যান্দোলনের পেছনে যে কয়েকজন অধ্যাপকের অপরিসীম দান রয়েছে তাঁরা হলেন– নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী ও আসকার ইবনে শাইখ। এই তিন জন প্রখ্যাত নাট্যকারকে কেন্দ্র করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয় প্রচেষ্টা রূপ লাভ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধকারের সৌভাগ্য হয়েছে উল্লিখিত ত্রয়ীর সহায়করূপে বা অভিনেতারূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পঞ্চাশ সাল থেকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকবার।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫)।

এবার প্রীতিভাজন অধ্যাপক-সহকর্মী ডক্টর রফিকুল ইসলামের প্রবন্ধ থেকে এক সুদীর্ঘ উধৃতি এখানে তুলে ধরছি। "পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্যান্দোলনের প্রগতি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বাংলা একাডেমী আয়োজিত 'নাট্য মৌসুম' বা অন্য কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

নাটকের উৎকর্ষে গোষ্ঠীগত সাধনার প্রয়োজন খুব বেশী। কারণ, নাটক একটি সমবায় প্রয়াস। আমাদের এখানে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা পেশাদার থিয়েটারের অভাব হেতু এমন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আরও অধিক, যে গোষ্ঠীতে নাট্যকার থাকবেন, থাকবেন প্রয়োগকর্তা, সঙ্গীত পরিচালক, শিল্প নির্দেশক, মঞ্চ ব্যবস্থাপক, অভিনেতা, অভিনেত্রী আর সবাই মিলে কাজ করবেন ভালো নাটক করার জন্যে। সে রকম গোষ্ঠী গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা বোধ করি 'ড্রামা সার্কেল'। বর্তমানে ঢাকায় আরো অনেকগুলো নাট্য সম্প্রদায় রয়েছে। নাট্য নিকেতন, সাতরং নাট্যগোষ্ঠী, রঙ্গম, বুলবুল একাডেমী নাটক বিভাগ, সমকাল কলা পরিষদ, কৃষ্টি সংঘ, নীতা থিয়েটার্স, মিনার্ভা থিয়েটার্স প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত নাট্য অনুশীলন প্রয়াস 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী'। নিম্নোক্ত তালিকা থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাট্য প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে, এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়। তাই কোন গোষ্ঠীর নাম বা উল্লেখযোগ্য অভিনয় বাদ যেতে পারে। তাই আগেই

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্টদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বলা বাহুল্য যে, এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে দায়ী পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব।

ড্রামা সার্কেল

কবয় ঃ বনফুল

কেউ কিছু বলতে পারে না ঃ রূপান্তর– মুনীর চৌধুরী

মানচিত্র ঃ আনিস চৌধুরী ঃ মাকসুদুস সালেহীন পরিচালিত

রক্ত করবী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ ঐ

অল মাই সন্স ঃ রূপান্তর– বজলুল করিম ও মাহমুদ হাসান ঃ মুনীর চৌধুরী পরিচালিত

রাজা ও রাণী ঃ রবীন্দ্রনাথ

তাসের দেশ ঃ রবীন্দ্রনাথ

ইডিপাস ঃ রূপান্তর– সৈয়দ আলী আহসান ঃ বজলুল করিম পরিচালিত

কালবেলা ঃ সাঈদ আহমেদ ঃ ঐ

আর্মস এন্ড দি ম্যান ঃ রূপান্তর ও পরিচালনা– বজলুল করিম

সপ্ত সূরের ধীবি আক্রমণ ঃ ঐ ঐ

সাতরং নাট্যগোষ্ঠী

রক্তপদ্ম ঃ রচনা ও পরিচালনা– আসকার ইবনে শাইখ

প্রচ্ছদপট ঃ রচনা–আসকার ইবনে শাইখ ঃ পরিচালনা– ফখরুজ্জামান চৌধুরী ও জিয়া হায়দার

মাইল পোষ্ট ঃ রচনা—সাঈদ আহমেদ ঃ পরিচালনা– আসকার ইবনে শাইখ

অনেক তারার হাতছানি ঃ রচনা ও পরিচালনা– আসকার ইবনে শাইখ

অগ্নিগিরি ঃ রচনা ও পরিচালনা– আসকার ইবনে শাইখ

মায়াবী প্রহর ঃ আলাউদ্দিন আল–আজাদ ঃ পরিচালনা– আসকার ইবনে শাইখ

রঙ্গম

চরিত্রহীন ঃ শরৎচন্দ্রঃ নাট্যরূপ ও পরিচালনা–নীলিমা ইব্রাহীম

দুয়ে দুয়ে চার ঃ নীলিমা ইব্রাহীমঃ পরিচালনা– রণেন কুশারী

কংকাল ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ নাট্যরূপ ও পরিচালনা–নীলিমা ইব্রাহীম

নব মেঘদূত ঃ নীলিমা ইব্রাহীম ঃ পরিচালনা– রণেন কুশারী

www.pathagar.com

নাট্য নিকেতন

ফেরদৌসী ঃ আবদুল হক ঃ পরিচালনা– আবদুন নূর

বহিপীর ঃ সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ ঃ পরিচালনা– শৌভনিক

বুলবুল একাডেমী

মনোনীতা ঃ রচনা ও পরিচালনা– নীলিমা ইব্রাহীম

আলোছায়া ঃ নূরুল মোমেন

ডাকঘর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ পরিচালনা– আমিনুল হক

সমকাল কলা পরিষদ

শকুন্ত উপখ্যান ঃ রচনা– সিকান্দার আবু জাফর ঃ পরিচালনা–ইসমাইল মোহাম্মদ

সিরাজ–উদ্দৌলাঃ ঐ ঐ

কৃষ্টি সংঘ

আমীর আকরাম ঃ রচনা ও পরিচালনা– আলী মনসুর

নীতা থিয়েটার্স

প্রত্যাগত ঃ রচনা– আবদুর রহিম আখন্দ ঃ পরিচালনা– নূরুল আনাম খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র–শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী

ক্রীতদাসের হাসি ঃ শওকত ওসমান ঃ নাট্যরূপ ঃ রামেন্দু মজুমদার ঃ পরিচালনা–নজমুল হুদা

দন্ড ও দন্ডধর ঃ মুনীর চৌধুরী ঃ পরিচালনা– রফিকুল ইসলাম

কৃষ্ণকুমারী ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ পরিচালনা– রফিকুল ইসলাম

ভ্রান্তিবিলাস ঃ সেকসপিয়ার ঃ গদ্য অনুবাদ– বিদ্যাসাগর ঃ নাট্যরূপ–রামেন্দু মজুমদার ঃ পরিচালনা–রফিকুল ইসলাম

১৯৬১–৬২ সালের নাট্য মওসুমে মঞ্চস্থ নাটক

(বাংলা একাডেমীর ড্রামা সিজন কমিটি আয়োজিত)

রক্তপদ্ম ঃ আসকার ইবনে শাইখ ঃ পরিবেশনায়– সাতরং নাট্যগোষ্ঠী

নৌফেল ও হাতেম ঃ ফররুখ আহমেদ ঃ পরিবেশনায়– রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা

www.pathagar.com

ইডিপাস ঃ সৈয়দ আলী আহসান ঃ পরিবেশনায়– ড্রামা সার্কেল
শকুন্ত উপাখ্যান ঃ সিকান্‌দার আবু জাফর ঃ পরিবেশনায়– সমকাল কলা পরিষদ
রক্তাক্ত প্রান্তর ঃ মুনীর চৌধুরী ঃ পরিবেশনায়– বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ

১৯৬২–৬৩ সালের দ্বিতীয় নাট্য মওসুমে মঞ্চস্থ নাটক

ফেরদৌসী ঃ আবদুল হক ঃ নাট্য নিকেতন
প্রচ্ছদপট ঃ আসকার ইবনে শাইখ ঃ সাতরং নাট্যগোষ্ঠী
আর্মস এন্ড দি ম্যান (বাংলা অনুবাদ) ঃ বার্নার্ড শ' ঃ ড্রামা সার্কেল
সিরাজ–উ–দ্দৌলা ঃ সিকান্‌দার আবু জাফর ঃ সমকাল কলা পরিষদ

১৯৬৩–৬৪ সালের তৃতীয় নাট্য মওসুমে মঞ্চস্থ নাটক

বহিপীর ঃ সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ্‌ ঃ নাট্য নিকেতন
কৃষ্ণকুমারী ঃ মাইকেল মধুসদন দত্ত ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র–শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী
ভ্রান্তিবিলাস ঃ সেক্‌সপিয়ার ঃ ঐ
অনেক তারার হাতছানি ঃ আসকার ইবনে শাইখ ঃ সাতরং নাট্যগোষ্ঠী

পঞ্চাশের দশক থেকে আরম্ভ করে ষাটের দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র–সংসদের উদ্যোগে যেসব নাট্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয়, তাতে অংশগ্রহণকারী যেসব কৃতী ছাত্রছাত্রীদের। নাম মনে পড়ছে তাঁরা হচ্ছেন ঃ সর্বজনাব অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, মুজিবুর রহমান খান (সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক), ওবায়দুল হক সরকার (অভিনেতা ও বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপ–পরিচালক), নুরুস সোবহান, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান (মরহুম), আবুল খায়ের মোহিবুর রহমান (অভিনেতা), রোকেয়া কবির, হোসনে আরা (বিজু), সাবেরা খাতুন, মনিমুন্নেসা, জহরত আরা, লিলি চৌধুরী, মমতাজ লিলি খান, নুরুন্নাহার, মাকসুদুস্‌ সালেহীন (মরহুম), অজয় কুমার রায় (ডক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), রফিকুল ইসলাম (ডক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), রাজিয়া খান আমিন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা), মাসুদা খাতুন, ফরিদা বারি মালিক, কামরুন নাহার লায়লী (মরহুমা এডভোকেট), সৈয়দা রওশনারা (অধ্যাপিকা), জাহানারা লাইজু, এম. আনোয়ার হোসেন (বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী), ফখরুল ইসলাম (বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার), সিরাজুল আলম খান, সাখাওয়াত হোসেন, মমতাজ উদ্দিন

www.pathagar.com

(নাট্যকার–অভিনেতা ও সরকারী কলেজের অধ্যাপক), তৌফিক আজিজ খান (প্রখ্যাত ক্রীড়া–ভাষ্যকার), নজমুল হুদা বাচ্চু (অভিনেতা), সৈয়দ আহসান আলী সিডনী (অভিনেতা), দীন মুহাম্মদ খান (ব্যাংকার), আবদুল্লাহ্ আল–মামুন (প্রখ্যাত নাট্যকার–অভিনেতা–চিত্রপরিচালক ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্যতম কর্মকর্তা), মুসা আহমেদ (বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্যতম কর্মকর্তা), আতাউর রহমান (বর্তমানে প্রখ্যাত অভিনেতা–পরিচালক), এনায়েত পীর খান (এডভোকেট), এনামুল হক চৌধুরী (বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশের অন্যতম আঞ্চলিক পরিচালক), ফেরদৌসী মজুমদার (প্রখ্যাত অভিনেত্রী), রামেন্দু মজুমদার (নাট্য–সংস্থার সংগঠক, অভিনেতা), খন্দকার শওকত আলী (বর্তমানে প্রখ্যাত ডাক্তার), কেরামত মওলা (প্রখ্যাত অভিনেতা ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্যতম ডিজাইনার), বজলুল করিম (মরহুম অভিনেতা–পরিচালক), তৌফিক হোসেন (এডভোকেট), মির্জা এম. এ. রশীদ (ব্যাংকের উচ্চপদস্থ অফিসার), জিয়া হায়দার (নাট্যকার ও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আবিদ হোসেন (মরহুম), মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (রংপুর সরকারী কলেজের অধ্যাপক), আশরাফ উদ্দিন আহমদ (বর্তমানে 'উজ্জ্বল' নামে চিত্র–তারকা), প্রদীপ কুমার দে (বর্তমানে চলচ্চিত্র–প্রযোজক ও পরিচালক), আফতাব উদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে ডক্টর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), সাঈদ তারেক (নাট্যকার–অভিনেতা), নুরুল আলম তালুকদার, নরেশ ভূঁইয়া, প্রদীপ কুমার সাহা, লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, এস. এম. কাউসার (এডভোকেট), এম. এ. কুদ্দুস (এডভোকেট), রুহুল কাদের চৌধুরী (এডভোকেট), এম. এস. এম. জিয়াউদ্দিন (এডভোকেট), এম. এ. বকর (এডভোকেট), এস. এম. হোসেন (এডভোকেট), এম. ইদ্রিস (এডভোকেট), এম. আবদুল্লাহ্ (এডভোকেট) এবং আরও অনেকে যাঁদের নাম এখন আর মনে পড়ছে না। উপরিউক্ত কৃতিবিদদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগের সঙ্গেই আমি নাট্য–প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। অভিনয়–শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে নাট্য–পরিচালনা ও নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাসহ সকল কাজেই কমবেশি সবার সঙ্গেই আমি ছিলাম ঘনিষ্ঠ নাট্যকর্মী। বেশ কিছু সংখ্যক কৃতিমানের সঙ্গে সে–সম্পর্ক আজও বিদ্যমান।

এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে নাট্যকর্মে সংশ্লিষ্ট থেকেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বেশ কিছু সংখ্যক নাট্য–প্রয়াসীর সঙ্গেও। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেনঃ অভিনেতা মরহুম নূরুল আনাম খান, এবং সর্বজনাব আমিনুল হক (অভিনেতা), আবদুল মতিন (অভিনেতা), সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার, নাট্য–পরিচালক ও

www.pathagar.com

অভিনেতা), শওকত আকবর (প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-অভিনেতা), মামুনর রশীদ (নাট্যকার ও অভিনেতা-পরিচালক), অভিনেত্রী গীতা দত্ত, বিশু মুখার্জী ও আবদুস সালাম (মঞ্চসজ্জাকর) এবং সুরেশ দত্ত (রূপসজ্জাকর)।

জনাব আসিরুদ্দীন আহমদ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসেন ১৯৫৭ সালে। অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন 'মিনার্ভা থিয়েটারস'। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারসের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। তারপরই তাতে আসে ভাটার টান। কিছুটা অনিয়মিতভাবে তা চলে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

'মিনার্ভা থিয়েটারসে'র ফাইল-পত্র, শিল্পীদের কন্ট্রাক্ট-পত্র সবকিছুই জনাব আসিরুদ্দীনের কাছে আজও সুরক্ষিত। সেসব থেকে দেখা যায়ঃ ১৯৫৯ সালে 'মির্নাভা থিয়েটার্স'-এ অংশ গ্রহণ করেছেন সর্বজনাব আনোয়ার হোসেন, আমজাদ হোসেন, সৈয়দ হাসান ইমাম, আহসানুর রহমান ভূঁইয়া, মিসবাহ উদ্দিন, সাইফুদ্দিন, আখতার হোসেন, কাজী মেহফুজুল হক, আনোয়ারা, রাণী সরকার, আফরোজ হাসনাইন, ফওজিয়া ইয়াসমিন, নাজমা ইয়াসমিন, ইসমাইল তালুকদার, সোনা মিয়া, মাসুদ খান (রাজ আহমদ), জহীর চৌধুরী, মনতোষ দেব, মীর আলতাব আলী, মাহবুবুর রহমান, শচীন কুমার চাকী, আল-ইমাম, এম.এ. খালেক, ভগবতী চক্রবর্তী, রেণুকা চক্রবর্তী, নূরুল ইসলাম, শাহীন ইসলাম, ফরহাদ খলীল, শরীফ হোসেন, আবদুর রশীদ, দেবেন্দ্র ভৌমিক, গোলাম কিবরিয়া, সাইফুল আলম, আজমল হোসেন খান, আবদুর রহমান, আবদুস সোবহান (আশু বাবু), আকরাম মালিক, জাহাঙ্গীর হোসেন, খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ শা'জাহান প্রভৃতি।

১৯৬০ সালের কন্ট্রাক্ট-ফরম অনুযায়ী 'মিনার্ভা থিয়েটারস'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বজনাব সিরাজুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর কবির, নেজামত উল্লাহ্, নারায়ণ চক্রবর্তী, মনজুর হোসেন, আহমাদুর রহমান (রানু), সৈয়দ হাসান ইমাম, জরীনা, তন্দ্রা ভট্টাচার্য, মিনতি হোসেন, চিত্রা সিন্‌হা, ফতেহ্ লোহানী, শামসুদ্দোহা, মিস পিনু, মিস আবেশ, প্রণয় কুমার, বরুণ কান্তি, গোলাম রফিক, ননী দাস, হুমায়ুন, বুলবুল ইসলাম, গীতা দত্ত, স্বপ্না, মুহাম্মদ আনিস, পূর্ণিমা সেনগুপ্তা, মুক্তা আন্না, ডাঃ এন. এন. সিদ্দিকী, সুভাষ দত্ত, নাসিমা খান, ফজলুর রহমান, বিনয় বিশ্বাস, নাজনীন, মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস, গোলাম কবীর, দেলোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, শেখ আবদুল মান্নান, ফিরোজ খন্দকার, আলেয়া খন্দকার, শেখ গোলাম মোস্তফা ও মণি। 'মিনার্ভা থিয়েটার্‌স্'-এর মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব আবদুল গফুর সারথী এবং নির্দেশনায় জনাব

www.pathagar.com

আসিরুদ্দীন আহমদ, মুহাম্মদ আনিস এবং অন্যান্যরা। এখানে উল্লেখ্য যে এই পেশাদার থিয়েটারে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই আজ সিনেমা শিল্পের নানা দিকে সুপরিচিত। পারফরমেন্স অনুযায়ী প্রতি রাত্রিতে শো'র জন্য তাঁরা পেতেন ১৫ টাকা, ১০ টাকা ও ৫ টাকা করে। টিকিটের হার ছিল ৫ টাকা, ৩ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা ও আট আনা।

উল্লিখিত তথ্য-তালিকা প্রমাণ করবে, সাতচল্লিশোত্তর কালে আমাদের নাটক রচনার উৎসাহ-উদ্দীপনা সাতচল্লিশ-পূর্ব কালের তুলনায় বেড়েছে অনেক। সাতচল্লিশের দুই পারের নাট্য-অভিজ্ঞতার দুইকালের পরিমাণও প্রায় সমান বলে এই তুলনা বৈধ। কিন্তু নাটক আমাদের উঁচুমানের হয় নি। শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর রাজার এক যুদ্ধের প্রয়োজনে একটি নদীর গতিপথকে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত করবার জন্য যথাবিহিত খাল কাটালেন। যুদ্ধ হল, জয়-পরাজয়ও হল। কিন্তু নূতন পথে নদী প্রবাহিত হল না। নাট্যধারার পরিবর্তনও হঠাৎ হয় না। অবিশ্যি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে অতি অল্প সময়ে সে পরিবর্তন আনা অসম্ভব নাও হতে পারে। গত কয়েক বছরে এখানকার পরিবেশ পরিবর্তিত হলেও তা উপযুক্ত ছিল, একথা বলা যায় না। এতদিন আমরা যেসব নাটক লিখেছি, সাধারণভাবে দেহ-ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যাবে- অধিকাংশেরই আঙ্গিক, অভিনয় ও মঞ্চ-রীতি পুরনো ও চিরাচরিত। সেগুলো কাহিনী, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ ও দৃশ্য-পরিকল্পনা আমাদের লব্ধ নাট্য-অভিজ্ঞতারই ছাপ বহন করে। দেশে সমাজে অত্যাচার-অবিচার চলছে। ঘুষখোর, মুনাফাখোর, মামলা-বাজ, ফতোয়াবাজ নিরাপরাধের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। তরুণ নায়ক এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। একটি ষোড়শী প্রেম তাকে উৎসাহ যোগায়। অনেক কষ্টের পর সে জয়ী হয়। কোন ক্ষেত্রে ষোড়শী গৃহিণী হয়, কোন ক্ষেত্রে হয় না। এই হল মোটামুটি নাটকের কাঠামো। কাহিনীর কাল দীর্ঘ। স্থান একাধিক। নাটক কতিপয় অঙ্কে এবং প্রতি অঙ্ক কতিপয় দৃশ্যে বিভক্ত। সমগ্র নাটক যেন সংলাপে ব্যক্ত পুরনো আঙ্গিকের এক বাংলা উপন্যাস। আমাদের রচিত বেশির ভাগ সামাজিক নাটকের মোটামুটি এই পরিচয়। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রমও নিয়ম প্রতিষ্ঠার মত জোরদার নয়। যাত্রা ও ঐতিহাসিক নাটকের আঙ্গিকও মোটামুটি তাই। পার্থক্য যা, তা অনেকাংশে কাহিনী-উৎসের পার্থক্যের জন্য। বলা যায়, যাত্রার আঙ্গিকই দেশ-কালের পরিবর্তনে গা' মুড়ে ঐতিহাসিক নাটক হয়ে বর্তমানের সামাজিক নাটকে এসেছে। কাহিনী-উৎসের পরিবর্তন

www.pathagar.com

অর্থাৎ পৌরাণিক থেকে ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক থেকে সামাজিক নাটক রচনার ধারাবাহিকতা যুগ পরিবর্তনের ফল। এই পরিবর্তনে নাট্য-পিপাসুদের চাহিদারও এমন কোন পরিবর্তন হয় নি যাতে আঙ্গিক-পরিবর্তনের খুব জোর তাগিদ আসতে পারে। চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক খুব প্রত্যক্ষ। সাধারণ নাটকেই আমাদের দাবি মিটে এসেছে এতদিন। এতেই সমাজের মনোরঞ্জন হয়ে এসেছে। নূতন ভাবধারা ও জাতীয়তার আবেগ প্রকাশের ইচ্ছা থেকেও আমাদের বহু নাটকের জন্ম। আবার এত নাটক 'বহু'র ভাবধারা ও আবেগকে বাড়িয়ে দিতেও কম সাহায্য করে নি। এদিক থেকে ওসব নাটকের প্রয়োজন ছিল বৈকি! এবং এই সাধারণ নাটকের পক্ষে এ প্রয়োজন মেটানোর গৌরবও যথেষ্ট। Poetic justice-এর প্রতি আমাদের প্রকৃতিগত যে একটা সাধারণ টান আছে, সেই টানই এসব নাটক দ্বারা কিছুটা শান্ত হয়। কারণ এ জাতীয় নাটকে ধর্ম, সত্য, ন্যায়, মহত্ত্ব প্রভৃতি জীবন-ধারণা যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচারিত হয়ে থাকে অথচ কিছুতেই সেই অন্যায়ের উপশম হয় না- তারই পরাজয় বা ধিক্কারে আমরা আত্মপ্রসাদ পাই। মোহিতলাল মজুমদারের কথায়ঃ

"এই সাধারণ নাটক যে সর্বকালীন বা সার্বভৌমিক সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাতে সময় বিশেষে সমাজ বিশেষের মনোরঞ্জন হইয়া থাকে, সেই প্রত্যক্ষ ফললাভই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি সেইরূপ নাটকেও যে ভাবোদ্দীপনা থাকে, তাহাতেই এক ধরনের রসোদ্রেক হয়। সাধারণ নাটকে ঐ ভাবোদ্দীপনা নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়, চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয় না, ধাক্কা দেয়- একটা উত্তেজনাপ্রসূত নেশার সৃষ্টি করে মাত্র। তথাপি সেই নেশারও দাম আছে। মানুষের নিতান্ত বাস্তবপীড়িত মন উহাতেই কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব-মুক্তির একটা সুখ অনুভব করে; বাস্তবকে খুব গভীররূপে রূপান্তরিত করিবারও প্রয়োজন হয় না, কেবল তাহাকে জীবনের মঞ্চ হইতে রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া অভিনয়ের দ্বারা একটু শোধন করিয়া লইলেই হইল।"

রাষ্ট্রীয় ও যুগ-পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ও মননের পরিবর্তন হয়। কিন্তু তা রাতারাতি হয় না। কিছুটা সময় লাগে। তাছাড়া ধাতস্থ হয়ে সে পরিবর্তন শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে নূতন রূপে প্রকাশিত হতেও সময় লাগে। বিশ-পঁচিশ বছর তার জন্য খুব যথেষ্ট নয়। অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। এখনও অতীতের নাট্য-অভিজ্ঞতা আমাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে- চাহিদাতেও, সরবরাহেও।

www.pathagar.com

কিন্তু পরিবর্তন এসেছিল। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ছাড়াও। সে পরিবর্তন জীবনযাত্রার, দৃষ্টিভঙ্গির। নাটক কি ধরনের হবে, তা জেনেই তার অভিনয় দেখতে যাই। কিন্তু তৃপ্তি পাই না। অথচ এ ধরনের নাট্যাভিনয়ে কিছুদিন আগেও তুষ্টি ও চাঞ্চল্য ছড়ানো ছিল। আমরাই তা কুড়িয়েছি। এ কি অস্বীকার করা যাবে যে এই আনন্দ-বঞ্চনার দায়িত্ব অনেকটা আমাদেরই মনের? মনেরই পরিবর্তন হচ্ছে। এটা যুগ পরিবর্তনের ফল। রুশ-মার্কিন শিল্প-জ্ঞানে মানুষ চাঁদের মুখ ঘুরে বেড়ালেও সেদিন পর্যন্ত আমরা অনেকেই বাস্তব জেট বিমান চোখে দেখি নি। কাজেই ওসব দেশে শিল্প যুগ বুড়িয়ে গেলেও আমাদের দেশে তা নবজাত। শিল্প যুগ স্বাভাবিকভাবেই এদেশের জীবন-যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনবে। নবজাতের বয়স একটু বাড়লেই তা আশা করা যায়। নতুন যুগের সমস্যায়-সমাধানে তখন মানুষ জীবনকে অনুভব করবে নতুন করে। নাট্যকার এই অনুভূত জীবনকেই তুলে ধরবেন নতুন আঙ্গিকে। এই পরিবর্তনের কারণ ও ফল কিছুটা সময়ের দুই পারে অবস্থিত। আমাদের এখানে পরিবর্তনের কারণ ঘটেছে এবং ঘটছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের মধ্যযুগীয় আরাম-আয়েশ, চলা-বলা, আনন্দ-উৎসব বর্তমান যুগের শহর-জীবনে তো কল্পনা করাই যায় না। গ্রামীণ জীবনেও আজ তা বেমানান। সারারাত জেগে থেকে যাত্রাগানের লীলা-মাধুর্য উপভোগ করতে গাঁয়ের চাষীও আজ নারাজ। সে জানে, রাতের পরের দিনটি তাকে ক্ষেতে কাটাতে হবে। রাতের ঘুম তার সহায়ক। তাছাড়া যাত্রার আসর বসায় কে? আগে ছিল রাজ-রাজড়া, জমিদার-তালুকদার। তাঁদের মিহি জীবনের দ্যুতির বিচ্ছুরণ হিসাবে জনসাধারণ পেত যাত্রা-থিয়েটার, নাচ-গানের আনন্দ। কিছুদিন আগেই তাঁরা অতীত হয়েছেন এবং যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত, তাঁরা আজও ব্যাংকের ব্যস্ত পথে ধূলি উড়াচ্ছেন। মনের আনন্দ-বাসনার গলি-পথে নজর দিলেও সংস্কৃতির ছায়াপথে দৃষ্টি ফেরানোর প্রবৃত্তি লাভ করতে তাঁরা এখনও পারেন নি। গাঁয়ের লোকেরা মাঝেমধ্যে তাঁদের লাখ-বিলাখের খবর পায়। কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া অতীতের আস্বাদন আর পায় না। কাজেই মধ্যযুগীয় আনন্দ-ধারার তলানিটুকুতে গা' ভিজিয়ে অবগাহনের আস্বাদ পেতে চেষ্টা করে এদেশের শতকরা নব্বই জন। বাকী দশ জন- অশিক্ষিত-শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম শিক্ষা ও সম্মানলব্ধ সংস্কৃতিবান- যাঁরা শহরে বসবাস করছেন, তাঁরা পরিবর্তনের বিভিন্ন স্রোতে ভাসমান। বিভিন্ন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন তাঁদের দাবির প্রকৃতি ও মান। তাঁদেরই মধ্যেকার শিল্পীরা দিশাহারা না হলেও

www.pathagar.com

চকিতদৃষ্টি। হয়তো কিছুটা হতচকিত। আজকের দুনিয়া থেকে সাধ তারা যত পেয়েছেন, এই অল্প সময়ে সাধ্য ততটা পান নি। ফলে, তাঁদের সৃষ্টি শিল্পপিপাসুর মনকে অতৃপ্তির বিরক্তিতে চঞ্চল করে তোলে। যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এ স্বাভাবিক। এখন এখানে শিল্প যুগের আরম্ভ। পরিণতি আসার সময় আরও পরে।

কিন্তু আমরা এই নতুন দিনকে গ্রহণ করতে কতটা তৈরি হচ্ছি, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নাট্যোন্দোলনে এ প্রস্তুতির লক্ষণ যদি থাকে, তার প্রমাণ মিলবে নাট্যকর্মীর বিভিন্ন প্রচেষ্টায়। নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় নতুন আঙ্গিক আবিষ্কারের অভিলাষ যদি আমরা এ অবস্থায় আপাতত মুলতবী রাখি, তাহলে সাদামাঠা প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়ঃ আমাদের নাট্যকার ও প্রযোজক কি বিভিন্ন নাট্য-প্রযোজনার উন্নত আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন?

করছেন যে, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিয়েছেন নূরুল মোমেন, সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, ফররুখ আহমদ, সিকানদার আবু জাফর, সাইদ আহমেদ প্রমুখ নাট্যকারেরা। আর নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিয়েছেন 'ড্রামা সার্কেল' 'সাতরং নাট্যগোষ্ঠী' ও অন্যান্যরা। নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস' একটিমাত্র চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ নাটক। সমস্ত ঘটনাকে নেপথ্যে রেখে চরিত্রটির উপর তার প্রভাব প্রকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে নাট্য-রচনার এ কৌশল অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবিদার। সৈয়দ আলী আহসানের 'কোরবাণী' 'জোহরা ও মুশতারী' এবং 'জুলায়খা' বই হিসাবে ছাপা হয়ে বেরোয় নি। কিন্তু আঙ্গিকের পরীক্ষায় তাঁর রচনা প্রোজ্জ্বল। জাপানের 'নো প্লে'র আঙ্গিকের অনুসরণ তাঁর রচনায় লক্ষণীয়। জাপানের 'নো প্লে' মূলত একটি বিশেষ মঞ্চ-ব্যবস্থায় সঙ্গীতের আবহের মধ্যে প্রকাশিত একটি কাব্য। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি মৃত আত্মা তার মুক্তির জন্য পৃথিবীতে আসে এবং পৃথিবীতে তার সেই জীবন যাপনের কাহিনী ব্যক্ত করে। অবিশ্যি নাটকটি শেষ হয় তার বাঞ্ছিত মুক্তিতে। 'আনন্দ-আহত' চিত্তে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আলী আহসানের রচনাগুলো মঞ্চে অভিনীত হলে এ আঙ্গিকের সাফল্য বোঝা যেত। মুনীর চৌধুরীর 'কবর'ও আঙ্গিকের পরীক্ষায় বিশিষ্ট। যেমন বিশিষ্ট সিকানদার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' ও সাইদ আহমেদের 'কালবেলা' ও 'মাইল পোষ্ট'। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক 'নৌফেল ও হাতেম' এক অভিযাত্রীক

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা। কাব্য ও ছন্দ নাটকে অচল না হয়ে বরং তাকে সচল ও সজীব করে তুলতে পারে—এ পরীক্ষার প্রমাণ 'নৌফেল ও হাতেম'।

উল্লিখিত নাটকগুলো ছাড়াও ভালো নাটক আমাদের রয়েছে। এসব নাটকের আঙ্গিক ও নতুন প্রচেষ্টা অনায়াসেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এ কথাও প্রমাণ করে যে বিশ্ব-নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের নাট্যকারদের পরিচয় পরোক্ষ হলেও অন্তরঙ্গ। উন্নতির পথে অনুসরণ অপরিহার্য। অনুসরণ তখন অন্বেষণেরই নামান্তর। শিল্প-সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য রত্ন অন্বেষণ সম্পূর্ণ কাম্য। বিভিন্ন সাহিত্যের রত্ন খুঁজে এনে তাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে অনুবাদ ও এডাপ্টেশন। যুগান্তকারী বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও এডাপ্টেশন করে আমাদের নাট্যকারেরা প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাচ্ছেন।

নাট্য-সাহিত্যের জনক গ্রীক-নাট্যকারেরা। 'সফোক্লিস'-এর 'ইডিপাস রেক্স' গ্রীক নাটকের মধ্যমণি। তার অনুবাদ করে সৈয়দ আলী আহসান আমাদের নাট্য সাহিত্যেকে দীপ্তিময় করে তুলেছেন। গল্স্ওয়ার্দি ও বার্নার্ড শ'কে এদেশে পরিচিতির ব্যাপ্তি দিতে চেষ্টা করেছেন মুনীর চৌধুরী। কবীর চৌধুরী করেছেন ইবসেন ও ক্লিফর্ড ওডেট্সের অনুবাদ। আর্থার মিলার ও বার্নার্ড শ'র নাটকের অনুবাদ করেছেন বজলুল করিম। অনুবাদের ক্ষেত্রে আবদুল হকের দানও যথেষ্ট। এমনি করে নিজস্ব রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের নাট্যকারেরা যে উদ্যম ও প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন, তার সামগ্রিক প্রকৃতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, সাধনা দিয়ে সাধ্য বাড়ানো যায়। আর তাতে সাধও অপূরণ থাকার কথা নয়। নাট্যান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এখনও কিছুটা অন্ধকারে, সন্দেহ নেই। তবু নাট্যকারেরা দীপ জ্বালাচ্ছেন একটি দুটি করে। অবিশ্যি দীপান্বিতার জন্য এখনও অনেক দীপের প্রয়োজন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, 'কবর' ছাড়া উপরিউক্ত নাটকগুলোর অধিকাংশই গুণগতভাবে না হলেও প্রকৃতিগতভাবে 'দ্বীপান্তর' মডেলের অনুসারী। ইতিমধ্যে ঢাকা নগরীর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন দিগন্ত। সর্বজনাব মাকসুদুস সালেহীন, বজলুল করিম প্রমুখ তরুণ নাট্যকর্মীদের দ্বারা গঠিত হয় 'ড্রামা সার্কেল'। কার্জন হলে তাঁদের দ্বারা মঞ্চস্থ 'রক্ত করবী' আমাদের এখানকার প্রয়োগ-পদ্ধতিতে আনে এক বিরাট পরিবর্তন। অতঃপর মাকসুদুস সালেহীন নাটকে প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। কিছুদিন পর এমনি নতুন আধুনিক প্রয়োগ পদ্ধতিতে বজলুল করিমের নেতৃত্বে মঞ্চস্থ হয় সাইদ আহমেদ

www.pathagar.com

রচিত 'কালবেলা'। 'কালবেলা'র মঞ্চায়ন এজন্য বিশেষ উল্লেখের দাবিদার যে নাট্যকার সাইদ আহমেদ তাঁর নাটক রচনা করেন সম্পূর্ণ আধুনিক টেকনিকে। 'নেমেসিস'-এর পর 'কবর' ও 'কালবেলা'ই আমাদের আধুনিক নাটকের পথিকৃৎ। আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত সাইদ আহমেদের অন্য নাটক 'মাইল পোষ্ট' মঞ্চস্থ করে আমারই নেতৃত্বে সংগঠিত 'সাতরং নাট্যগোষ্ঠী'। এখানে স্মরণীয় যে, ১৯৬১-৬২ সালে বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ড্রামা-সিজন কমিটি'। বাংলা একাডেমীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ছোট-খাটো একটি নাট্য-মঞ্চ। প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েতই সামান্য আয়োজন। তবুও পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার জন্য নাই-মামার ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই সেটা ছিল কানা-মামা। পরপর কয়েক বছর ধরে ড্রামা-সিজন কমিটির মাধ্যমে সরকারী অর্থানুকূল্যে পালিত হয় নাট্য-মওসুম। নতুন-পুরনো বিভিন্ন নাট্য সংস্থা পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার সুযোগ পায়। বৃদ্ধি পায় আমাদের নাট্য-অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।

তদুপরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঞ্চ ব্যবস্থাসহ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অডিটোরিয়াম নির্মিত হওয়ার পর ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন উদ্যম। কবি শাহাদাত হোসেনের 'মসনদের মোহ' থেকে আরম্ভ করে আমাদের বিভিন্ন নাট্যকারের নাটক এবং সৈয়দ ওয়ালিউল্লা'র 'তরঙ্গভঙ্গ'র অভিনয়ের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক এ. জেড. খানের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে এবং আমারই নেতৃত্বে পালিত হয় সপ্তাহব্যাপী এক নাট্যোৎসব। তা ছাড়াও মঞ্চস্থ হয় 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য নাটক।

ইতিমধ্যে মাকসুদুস সালেহীন ও বজলুল করিমের অনুপস্থিতিতে 'ড্রামা সার্কেল' অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। আমার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'সাতরং'-এর সঙ্গে কাজ করতে আসেন সর্বজনাব নজমুল হুদা, সৈয়দ আহসান আলী সিডনী, আবদুল্লাহ আল-মামুন, আতাউর রহমান, জিয়া হায়দার, ফখরুজ্জামান চৌধুরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ নাট্যকর্মীরা। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আধুনিক নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে আমি এসব নাট্যকর্মীদের যথেষ্ট কাজের সুযোগ করে দিতে পারি নি নানা করণে। বিশেষভাবে জনাব আতাউর রহমান তখন বিদেশী আধুনিক নাটকের চর্চায় অধীর আগ্রহী। ইতিমধ্যে জিয়া হায়দার বিদেশ থেকে নাটকের উপর ডিগ্রী করে আসেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আতাউর রহমান ১৯৬৮

www.pathagar.com

সালে গড়ে তোলেন 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়'। জাঁ পল সার্ত্রের 'ইন ক্যামেরা' নাটকের অনুবাদ (দ্বাররুদ্ধ) মঞ্চস্থ করার জন্য প্রাণপাত করেও ব্যর্থ হয়ে এই 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' রেডিও-টেলিভিশনে নাটক করতে আরম্ভ করে। অল্পদিন পরেই ভাঙা-গড়ার প্রক্রিয়ায় নাগরিক-এ এসে যোগ দেন আলী যাকের। আতাউর রহমান-আলী যাকেরের নেতৃত্বে নব উদ্যমে তাঁরা লেগে থাকেন আধুনিক নাট্য-স্বপ্নের বাস্তবায়নে।

পুনশ্চঃ স্মৃতি থেকে লিখেছি বলে দেখা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ কিছু নাম বাদ পড়ে গেছে। যেমনঃ এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম (বর্তমানে ডক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক), কাজী ফজলুর রহমান (বাংলাদেশ সরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষা সচিব), সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ (মরহুম 'চিত্রালী' সম্পাদক)। এঁদের প্রথম জন ১৯৪৯ সালে আমার রচিত 'বিরোধ' নাটকে, পরের দুইজন ১৯৫০ সালে আমারই রচিত 'পদক্ষেপ' নাটকে 'নারী' চরিত্রে অভিনয় করেন। এমনি আরও আরও নাম আমার উল্লেখ থেকে বাদ পড়েছে হয়তো। সুযোগ এলে পরে এসব ত্রুটি সংশোধনের আশা রইল।

www.pathagar.com

সখী সোনার উপকথা

আজ থেকে তিন শ' বছর — তারও আগে বর্ধমানের কবিভূষণ ফকীর রাম রচেছিলেন যে রাজকন্যার প্রেম কথা, নাম তার দিয়েছিলেন সখীসেনা, শশীসেনা। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ১৩৫২-১৩৬৫)। আর আমাদের মহাপন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই কন্যার নাম বলেছেন 'সখী সোনা'। (বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খন্ড, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পৃঃ ১০)। সুন্দর নাম। আমরাও তাই ডাকব তাকে এই নামেই — 'সখী সোনা'।

আর শোনাব তারই কথা ফকীর রামের লেখা থেকেই।

* * * * * * *

রাজকন্যা সখী সোনা।

"একে রূপে যৌবনী রূপের নাঞি সীমা।
গাএর বরণ জিনি কাঞ্চন-প্রতিমা।।
দান্ডাইলে অবনী লোটায়্যা পড়ে চুল।
পূর্ণচন্দ্র-বদন নাসিকা তিল-ফুল।।
কুরঙ্গ-নয়ন জিনি লোচন-যুগল।
অলি-পাঁতি দশন অধর বিম্বফল।।"

এই সে রাজকন্যা সখী সোনা। পাঠগৃহে গুরুর কাছে পড়ে, শোনে, পড়াশুনা করে। একা নয়, পড়ুয়া আরও আছে, ছেলেমেয়ে এক সাথে লেখা পড়া। তাদের একজন— কোটাল-পুত্র। কাছাকাছিই আসন দু'য়ের, তবে কিনা রাজকন্যার আসন উচ্চে, আসন মানে শ্রেণীমত বসার আসন। সেইমতে কোটাল-পুত্রের আসনটা কিছু নীচে — ইয়ে — মানে হাজার হোক রাজার মেয়ে রাজকন্যা — উচ্চে আসন হবেই তো! সেই কথা যাক। দিনের পর দিন যায়, বার মাসে বছর ফুরায়। এগিয়ে চলে গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ, পাঠ প্রদান। কল্যাণময় সর্বদিক।

এরমধ্যে একদিন।

হল কি সেই একদিন? রাজকন্যার হাতের কলম হাত থেকে পড়ে গেল হঠাৎ করেই। কাছাকাছি বসা ছিল কোটাল-পুত্র, অল্প নীচে — কি করল সে? সঙ্গে সঙ্গেই — না! গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল। তুলল শুধু রাজকন্যার

www.pathagar.com

অনুরোধে, তা-ও একটা প্রতিশ্রুতি আদায়ের পর। কি ছিল সেই প্রতিশ্রুতি? ভবিষ্যতের একটি দাবি। তাতেই সত্য-বদ্ধ হল রাজকন্যা।

একদিনই নয়। আরও একদিন। আরও একদিন।

একইভাবে একই রকমে তিন সত্যে সত্য-বদ্ধ হল রাজকন্যা সখী সোনা। কোটাল-পুত্র অবশেষে জানাল তার দাবির কথা। সেই দাবিঃ রাজকন্যার পাণি গ্রহণ।

"এত যদি বলে কোঙর কন্যার সাক্ষাতে।
শুনিঞা কন্যার মুন্ডে পড়ে বজ্রাঘাতে।।
কন্যা বলে কি বোল বলিলা পাপমতি।
ইহার লাগিয়া মোর সঙ্গে কৈলা সত্যি।।
দীক্ষা গুরু নাই বলি আজি পাইলে দায়।
মোরে সঙ্গে লয়্যা বাহির হৈয়্যা যাত্যে চায়।।
কোন লাজে কোঙর কহিলে হেন কথা।
রাজাকে কহিয়া তোর কাটাইব মাথা।।
ভণএ ফকীর রাম শুনে লাগে ডর।
কন্যার বচনে কোঙর কাঁপে থর থর।।

সত্যি-সত্যিই কি রাজকন্যা এতটাই রাগ করেছে? সত্যি-সত্যিই কি রাজকন্যা 'রাজাকে কহিয়া' উপকারীর 'কাটাইবে মাথা?' না না, তা কি করে হয়! একই রকমে তিন দিন পড়ে যায় হাতের কলম, একই রকমে তিন দিন কন্যার হাতে কলম তুলে দেয় কোটাল-পুত্র — তার পরেও এত রাগ? ফকীর রাম কি বলেন? বলবার আগে ফকীর রাম কোঙরের কথা শুনে নেন। সেই কথা রাজকন্যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্যরক্ষার কথা।

তখন "ভণএ ফকীর রাম ঐ দৃঢ় কথা।
ছাড়িলে ছাড়ান নাই যদি কাট মাথা।।
দশরথ সত্য কৈল কৈকেয়ীর সনে।
রাম হেন পুত্রকে পাঠাইল বনে।।
সুগ্রীব সহিত সত্য করিলেন রাম।
চোরা বাণে বালিকে পাঠাল্য স্বর্গধাম।।

www.pathagar.com

সত্য কৈল রামচন্দ্র বিভীষণ সনে।
মিতারে দিলেন রাজ্য মারিয়া রাবণে।।
ভণএ ফকীর রাম এ কথা নিশ্চয়।
সত্যে বন্দী থাকিলে নরকবাসী হয়।।"

কোটাল-পুত্র যে নাছোড়বান্দা তাতে আর সন্দেহ কি। এবার সখী সোনার আক্ষেপের পালা। তাই বলছে কন্যা —

"কি খেনে আইলাম আজি পড়িবার লাগি।
না জানিঞা সত্যে বন্দী হইলাম অভাগী।।
হাতে তুলি অভাগী আপনি খাইলাম বিষ।
আপনি আপন মুন্ডে পড়িলাম কুলিশ।।
এতকাল পড়্যা শুন্যা এই দশা হল্য।
এক শ' মাএর নৌকা দরিয়ায় ডুবিল।।
ভণএ ফকীর রাম শুন রাজার ঝি।
বিষ খ্যায়া বিষাদ ভাবিলে হবে কি।।"

সত্যি করে বলতে কি, 'বিষ খ্যায়া' অর্থাৎ হাতের কলম সংক্রান্ত ব্যাপার 'ঘটাইয়া' রাজকন্যার যত না 'বিষাদ', তার চাইতে বেশি 'বিষাদ' এই বাপারে পিতামাতার প্রতিক্রিয়ার কথা 'ভাবিয়া'। পিতা তো এক রাজা, রাণী তাঁর এক শ' জন। তার অর্থ — একশ' মায়ের আদরের ঝি এই রাজকন্যা সখী সোনা। এই সখী সোনাকে গুরুর আশ্রয়ে পাঠায় প্রধানত মায়েরাই। রাণীদের মতামতেই রাজার মতামত। আক্ষেপ করতে করতে রাজকন্যা যখন রাজপুরীতে ফিরল, একশ' মা তখন আনন্দে উদ্বেলিত। এক-এক রাণী কন্যাকে আদর করে, আর বলে —

"কার ঘরে গেছিলে সাধের বাছা মোর।
শূন্য কর‍্যা এক শত জননীর কোর।।
এক তিল যদি না দেখিতে পাই তোরে।
বিফলা মাএর প্রাণ অছিপছি করে।।
অনেক সাহসে তোরে পড়িতে পাঠায়্যা।
চাতক-সমান থাকি পথ পানে চায়্যা।।

www.pathagar.com

মণি হারাইয়া যেন ফণীর হাইবাস।
মাণিক্য হারায়্যা যেন দরিদ্রের হুতাশ।।
আজ হৈতে পড়িঞা শুনিঞা নাহি কায।
বস্যা থাক একশত মাএর সমাজ।।
অবিরত দেখিয়া থাকিব চাঁদমুখ।
পাসরিব যাবৎ কালের যত দুঃখ।।
ভণএ ফকীর রাম আর বল কত।
ঘুচিয়াছে লেখা পড়া জনমের মত।।"

আক্ষেপের বদলে রাজকন্যার মনে এখন দুশ্চিন্তা। কোটাল-পুত্রের কাছে সখী সোনার তিন সত্যে 'বন্দী' হওয়ার কথাটা পিতামাতার গোচরে আনবে কি করে রাজকন্যা? কথাটা তাঁদের গোচরে আনলেই কি সখী সোনার পিতামাতা এ বিবাহে সম্মত হবেন? সম্মত না হন যদি, তখন? তাকে না দেখলে মায়েদের প্রাণ যেমন 'অছিপছি' করে, কোটাল-পুত্রের সঙ্গে বিবাহ না হলেও তো সখী সোনার প্রাণ 'অছিপছি' করবে! তিন সত্যে 'বন্দী' বলেই তো নয় শুধু, এর মধ্যেই তো দু'জনের হৃদয় দু'জনের হৃদয়ে বন্দী। রাজকন্যার হৃদয়ই তো 'কোঙর'-মুখী (কোঙর মানে কুমার) হয়েছে আগে, হাতের কলম মাটিতে পড়েছে তো পরে! আর 'কোঙর'ও তো মনে প্রাণে কামনা করেছে — এমনটিই হোক, সখী সোনার হাতের কলম মাটিতে পড়ুক, আমি তুলে দিই! দু'জনের এই চাওয়াচাওয়ি এখন এক মহা সমস্যায় রূপান্তরিত।

অবশেষে শিক্ষাগুরু হলেন বিপদ-ভঞ্জন, বিপদের ভরসা। গুরু তো ব্যাপারটা জানেনই, এবার কন্যা-কুমারের অনুরোধ — তিনিই যেন রাজা-রাণিগণকে তা বুঝিয়ে বলেন।

"কহিয় কহিয় গুরু জননীর ঠাঞি।
তোমার কন্যার সনে আর দেখা নাই।।
এই কথা আমার পিতার কাছে বল্য।
তোমার সাধের কন্যা সখী সোনা মল্য।।
কান্দিলে প্রবোধ কর্য বুঝায়্যা সাদরে।
গিয়াছে তোমার কন্যা শ্বশুরের ঘরে।।
কন্যা লৈয়া চিরদিন কেবা করে ঘর।

www.pathagar.com

আপনার কন্যা যেবা সেহ হয় পর।।
দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
লয়্যা গেল তাহারে পান্ডব বিভা করি।।
পড়িল কূলের ঝি আজিকে অকূলে।
ফকীর রাম দাসে বলে ভাবি তরু-মূলে।।"

তারপর আর কাউকে না বলে-কয়ে কন্যা-কুমার নব-জীবনের পথে গোপনে রওয়ানা দিল। পথ চলে কোটাল-পুত্র, পথ চলে রাজকন্যা। পথ-ঘাট খুব একটা চেনা নয়, তবুও পথ চলে। চলতে হয়। পথ চলে তারা পাশাপাশি, হাত ধরাধরি করে। ভয়ও লাগে, ভালও লাগে। অনেকটা পথই চলে এসেছে তারা। এমন সময় — কি 'হল্য' এমন সময়? পথিমধ্যে ঝড় উঠল, মহাবিপদের মধ্যে পড়ল কুমার-কুমারী।

"গগনে উড়িল মেঘ করিঞা আন্ধার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে করিল একাকার।।
গগন উপর উড়িলা জলধর
করিঞা ঘোর ঘটা।
কালিয়া মেঘে চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া
পড়িছে বিজলী-ছটা।।
উনপঞ্চাশ পবন সঞ্চার
করিয়া আইল ঝড়।
চৌদিগ যুড়িয়া চলিল উড়িয়া
না রহে চালের খড়।।
পাকাও পাঁচীর দালান মন্দির
ভাঙ্গিয়া লৈয়া যায় ঝড়ে।
পশু লক্ষ লক্ষ খেচর আদি পক্ষ
আকাশ হৈতে পড়ে।।
কন্যাতে কোঙরে গুরুদেব সোঙরে
পড়িয়া ঘোর সঙ্কটে।
এইবার রক্ষ ওহে বিরুপাক্ষ
দাস ফকীর রাম রটে।।"

www.pathagar.com

শেষমেষ অবসান হয় ঝড়ের, অবসান হয় রাতের; অবসান হয় ঝড়ের-রাতের। এই ঝড়ের-রাতের জন্য কন্যা-কুমারের আশ্রয়-স্থল ছিল এক ভাঙা মন্দির। সেই ভাঙা মন্দিরের দুয়ারে এসে পড়ে ভোরের আলো। স্বস্তি ফিরে পায় বর-কনে। সূর্য হেসে ওঠে পূবের আকাশে, বর-কনের মুখে হাসি ফোটে ভাঙা মন্দিরের সামনের পথে।

পূবের আকাশে আরও ওপরে উঠে যায় সূর্য। বর-কনে কোটাল-পুত্র ও রাজকন্যা পথ চলে, চলতে চলতে চলতে চলতে মানুষের মেলে এসে দাঁড়ায় তারা। পিতামাতাদের পক্ষ থেকে তাদের তেমন কোন ডর-ভয় নাই। তাদের এ মিলনকে রাজা-রাণীরা যেমন অনুমোদনও করেন নাই, তেমনি অন্যায় বলেও ঘোষণা করেন নাই। ভাবটা এই যে— করুক ওদের যা ইচ্ছা। কোটাল-পুত্র ও রাজকন্যা তাই নিজেদের ইছামতই বর-কনে হয়েছে। তারপর গোপনে নীরবে চলে এসেছে রাজপুরী থেকে। একটু ভয় যা লাগছে তা অজানা জীবনের জন্য, ভালও যা লাগছে, তা-ও সেজন্যই।

কিন্তু পথ চলতে যে বড় কষ্ট হচ্ছে রাজকন্যা সখী সোনার! আর বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করছে দু'জনই। দু'জনই অনুভব করছে খাদ্য গ্রহণেরও। সেইমত তারা একটা নির্জন বাড়িতে গিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে কিছু খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করে আনল কোটাল-পুত্র; রান্নাবান্নার আয়োজন চলল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর রান্না করতে আরম্ভ করল রাজকন্যা। কিন্তু রান্না করতে চাইলেই তো আর রান্না করা যায় না! রান্না করতে হলে রান্না করা জানতে হয়। তা কোনদিনই জানতে চেষ্টা করে নাই রাজকন্যা সখী সোনা। আর কোটাল-পুত্র তো পুরুষ! রান্না করার কায়দাকানুন সে কি জানে! অগত্যা রাজকন্যাকেই বসতে হল চুলার কাছে। রান্না করতে চেষ্টা করে রাজকন্যা, আর মনে মনে বলে—

"আমি যে সাধের কন্যা রূপে গুণে কূলে ধন্যা
এক শত জননীর ঝি।
কখন আপন জন্মে নাই জানি গৃহকর্ম্মে
কড়ায় কুট্যা তুল্যা নাই দি।।
গৃহ-কর্ম্ম বল্যা বাণী কোনকালে নাহি জানি
আগুন-আখাতে দিতে ফুক্।
পুনঃ পুনঃ ফুক্ দিতে ভিজা কাঠের ধোঙাতে

www.pathagar.com

মলিন হইল মোর মুখ।।

ওমা ওমা মরি মরি লোচন মেলিতে নারি
ধোঙাতে করিল অন্ধকার।
সহিতে না পারি ঘ্রাণ অছিপছি করে জান
জীবন নাহিক রয় আর।।
বিষম ধুমে অন্ধ প্রবেশিলা নাসা-রন্ধ্র
সজল হইল আখির তারা।
ভণএ ফকীর রামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল ঘামে
বুক মুখ বায়্যা পড়ে ধারা।।"

বুকে মুখে ধারা 'বায়্যা' পড়লে হবে কি, শত কষ্ট হলেও রাঁধতেই হবে তো, নইলে খাবে কি? তাই প্রাণপণে আগুনের আখাতে ফুক্ দিয়ে দিয়ে ভিজা কাঠে আগুন ধরাতে হল। বিষম ধুম নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করে। আঁখির তারা সজল করেও রাঁধতেই হল কন্যাকে। আজ যে একশ' জননীর আদরের ঝি রাজকন্যাকে কোন দাসীই সেবা করতে এগিয়ে আসবে না। আদরের ঝি রাজকন্যা আজ যে শুধুই প্রেমিকা সখী সোনা! শক্তিমান কোটাল-পুত্র যে আজ গৃহস্থালির প্রয়োজন মেটাতে শুধুই সাধারণ মানুষের সহযোগিতা প্রার্থী।

কোন রকমে রান্নাবান্নার কাজ তো সারা হল। এবার খাওয়ার পালা। খাদ্যের গ্রাস মুখে পুরার পর মুখাবয়বের পরিবর্তন কেমন এবং কতটা হয়েছিল, তার বিবরণ কবিভূষণ ফকীর রাম দেন নাই। তাই কথা আর না 'বাড়ায়্যা' আমরা নতুন বর-কনেকে খাদ্য গ্রহণরত অবস্থায় রেখেই স্থান ত্যাগ করছি। কল্যাণ হোক রাজপুরী থেকে সাধারণ মানুষের মেল-এ অবস্থান গ্রহণ করা নতুন বর-কনের। কল্যাণ হোক কোটাল-পুত্র ও আমাদের আদরের কন্যা সখী সোনার।

www.pathagar.com

কিছু গান

। আটান্ন ।

যুগে যুগে জন্মভূমি জনমে জনমে,
বিনা তারে বাজে বীণা মরমে মরমে গো –
শর্ষে ফুলের সোনা কোথায় আর।

শর্ষে ফুলের সোনা কোথায় মৌচাকে মউ ভরা,
ধানের শীষে শিশির যেন মায়ের আদর ঝরা গো –
কাজল মেঘের ছায়া কোথায় আর।

কাজল মেঘের ছায়া কোথায় রাখালীয়া সুর,
মরমীয়া গানে গানে একতারা মধুর গো –
দোয়েল–শ্যামার গান কোথায় আর।

দোয়েল–শ্যামার গান কোথায় শীতল পাটির দেশ,
সুখে–দুঃখে স্বপ্নভূমি আমার বাংলাদেশ –
যার গলায় নদীর সাতনরী হার।
আমি চারণ-বাউল হলাম রূপে তার।

। ঊনষাট ।

আমার দেশের মাটি, ওরে জন্মভূমি দেশ!
তোরই লাগি' অঙ্গে আমার চির-বাউলবেশ।।
আমার জন্মভূমি দেশ।

এই না দেশের শতেক মায়া চোখের কাজল হয়ে,
রাত্রি শেষের স্বপ্ন কত এনেছিল বয়ে।

www.pathagar.com

একতারাতে .... (আমার এই)
একতারাতে বেজেছিল কতই সুরের রেশ।।
আমার জন্মভূমি দেশ।

কোথায় গেল চোখের কাজল মেঘডুম্বুর শাড়ী,
কোন্ অজানার দেশে আমার স্বপ্ন দিল পাড়ি।
দুঃখ-নদীর .... (কখন এই)
দুঃখ-নদীর কোন্ বা চরে যাত্রা হবে শেষ।।
আমার জন্মভূমি দেশ।

সপ্ত ডিঙা মধুকর আর ভাঙবে নাকি ঢেউ,
গঞ্জে-ঘাটে সওদা নিয়ে ফিরবে না আর কেউ?
চম্পাবতী .... (কন্যা)
চম্পাবতী আসবে না যার মেঘবরণ কেশ??
আমার জন্মভূমি দেশ।

-। ষাট।

যে দেশেতে গাঁথা হয় রে বিনি সূতের মালা,
যে দেশেতে আঁধার রাতি জোছনায় উজালা।
সেই দেশেরই মায়ের দুধে জহর মিশায়ো না,
তুমি ছড়াও প্রীতির সোনা।
পথের দিশা ওই যে তোমার হাজার তারায় বোনা।।

যে দেশেতে হাজারো ফুল শতেক পাখীর গান,

www.pathagar.com

যে দেশেতে অঝোর ধারায় নদেয় নামে বান।
সেই দেশেরই চলার পথে কাঁটা বিছায়ো না,
তুমি   ছড়াও প্রীতির সোনা।
পথের দিশা ওই যে তোমার হাজার তারায় বোনা।।

যে দেশেতে রঙ-ধনুকে সপ্ত রঙের খেলা,
যে দেশেতে মাঠে ঘাটে শতেক মনের মেলা।
সেই দেশেরই বুকে বিষের শেল হানিয়ো না,
তুমি   ছড়াও প্রীতির সোনা।
পথের দিশা ওই যে তোমার হাজার তারায় বোনা।।

। একষট্টি।

দুখের রাতে ......
দুখের রাতে অন্ধকারে করিস না তুই ভয়।
আলো জ্বেলেই অন্ধকারকে করতে হবে জয়।।

সূর্য যদি ডুবেই গেল
নামল যদি রাত,
শক্ত করে ধর্ তবে তুই
বন্ধু-সাথীর হাত।
জানিস– ঘন আঁধার পারেই
প্রভাত জেগে রয়।।
শুনিস যদি ঘুমের ঘোরেও স্বদেশ তোরে ডাকে,
ঘর ছেড়ে আয়, বুক ফুলিয়ে দাঁড়া পথের বাঁকে।।

www.pathagar.com

সামনে যদি দেখিস পাতা
ধূর্ত ব্যাধের ফাঁদ,
সর্বনাশা মেঘে মেঘে
শোন্ রে বজ্রনাদ।
আলোর পাখীর তরে কভু
আঁধার বাধা নয়।।

।বাষট্টি।

রূপ দেখে যার হলাম বাউল কোথায় সে দেশ,
সে–বাংলাদেশ?
ছায়াঢাকা পাখীডাকা আমার স্বদেশ!!

এখানেমাঠে-বাটে শকুনিরা এল উড়ে,
এখানে ফসলী মেঘ তপ্ত দাহে উধাও দূরে।
এখানে চলার পথে ধুকে ধুকে মৃত্যু আবেশ!!

কোথায় সে-দেশ সবাই মিলে জমি করে চাষ,
দুঃখে-সুখে সমভাগী কাটায় বারো মাস।
ময়ূর মেঘে উতল কন্যা রূপবতীর কেশ!!

মানবতার মায়া ঘেরা সে-দেশ কোথায়
মোহন বাঁশীর প্রেম ও হাসির সে-দেশকোথায়?
আজ কেন তার প্রীতি-সুখ ও
সাম্যহারা ভিখারী বেশ??

www.pathagar.com

। তেষট্টি।

প্রীতি ঘেরা যে ঘর আমার স্বপ্ন বোনে–
তা এখানে, এই দেশে।
যা পেয়েছি, যা পাব আর এই জীবনে–
তাএখানে,এইদেশে।।

রূপকথার স্বপ্নকথা শত শত,
চম্পাবতীরকন্যা-মনে আশা যত,
কল্পপুরীর দোর পেরিয়ে ফিরে আসে
এমাটিতে,এই দেশে।।
দেও-দানব ওই শত্রু আসে বর্গী-লোভে
ঈর্ষাকালো পথ বেয়ে।
গর্জে ওঠে হায়দারী হাক বজ্রনাদে
মাঠে-ঘাটে দেশ ছেয়ে।।
মুক্ত স্বদেশ, রক্ত-লেখা, কত কথা
রাঙা ভোরে স্মৃতিমুখর কথকতা–
কোটি প্রাণের জিম্মাতে যে স্বাধীনতা
তাএখানে,এইদেশে।।

। চৌষট্টি।

স্বাধীনতা তুমি বাদশা-রাজার মহল পেরিয়ে শেষে,
হাজারোজীর্ণপর্ণকুটির-দুয়ারে দাঁড়ালে এসে!!
কি দিয়ে তোমাকে স্বাগত জানাই বল –
ফুল-ফল-মূলে ভরা ছিল ঘর, তাও তো উধাও হল।
আছে শুধু প্রাণ – তা-ই দিতে পারি

www.pathagar.com

তোমাকে যেভালবেসে।।

যখন এ জীর্ণ পূর্ণকুটির-দুয়ারেদাঁড়ালে এসে।

আমাদের স্বাধীনতা।

তোমারই জন্য জীবন-মরণ

তোমারই জন্য সাধন ভজন,

প্রাণ দেব তবু রাখব তোমার মর্যাদা স্বাধীনতা।

আমাদেরস্বাধীনতা।

শেষ হয়ে তবু শেষ হবে না তো আমার দেশের কথা ....

সব কথা মিলে বুকের গহনে কথা ক'বে স্বাধীনতা!

আমাদেরস্বাধীনতা!

তোমারই জন্য জীবন-মরণ

তোমারই জন্য সাধন ভজন,

তোমারই জন্য যুগ যুগ ধরে স্বপ্নের কথকতা।।

আমাদেরস্বাধীনতা।

আশা বুকে নিয়ে জেনে রাখো সাথী-কেটেযাবেঅমানিশা,

আঁধারের পারে পাখী-ডাকা ভোরে জাগবে আলোর দিশা।

সাথী ও, ওগো বন্ধু —

পাখীদের গানে নদী-কলতানে

জোয়ারী ধারায় বৈঠার টানে

ভাঙবেই জানি চোখে-মুখে-বুকে সুপ্তির নীরবতা।।

প্রাণ দেব তবু রাখব তোমার মর্যাদা স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গ নীলিমা

চরিত্র- লিপি

চাচাজান

হাশেম

জানে আলম (জন)

সুমার মা

সুমা

রহমান সাহেব

জোয়ান

জোয়ানেরবাবা

ম্যাট্রন (মধ্য বয়সী)

ম্যাট্রন (একটু কম বয়সী)

এক স্ত্রীলোক

www.pathagar.com

(রাস্তায় লোকজন জমেছে। হাশেম ও 'চাচাজান' ভিড়ের মধ্যে ঢুকে এক বিপন্ন রিকশাওয়ালাকে পথচারীদের মারমুখো নাজেহাল অবস্থা থেকে বাঁচাচ্ছে। একাজে চাচাজানের ভূমিকা খুবই মহৎ। চাচাজানই রিকশাওয়ালাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বলা যায়)

চাচাজান : এ্যাকসিডেন্ট এ্যাকসিডেন্টই। ইচ্ছে করে কেউ কখনো করে না। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে বে-খেয়াল হয়েই মানুষ এ্যাকসিডেন্ট করে। সামান্য এক রিকশাওয়ালা, একে মেরে কি হবে ভাই। মাফ করে দিন। অন্তত — আমি বুড়ো মানুষ বলছি যখন —

(লোকজন চলে যেতে থাকে। রিকশাওয়ালাও মুক্তি পেয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়। চাচাজান ও হাশেম পা বাড়ায়)

(চাচাজান আর হাশেম এসে ঢোকে একটা সাধারণ ঘরে। তখন বিকাল। ঘরে ঢুকতেই শোনে, রান্নাঘরে কি যেন একটা ভাঙ্গল)

চাচাজান : দেখ তো সুমার মা, কি যেন ভাঙ্গল! আর হাশেম এসেছে, আমাদের হাশেম মিয়া। বস হাশেম।

(দু'জনেই বসে)

বুঝলে বাবা, রাস্তায় রিকশাওয়ালার গোলমালে মনটা একটু খারাপই হয়ে গেছে বলা যায়। এমনি অবস্থায় ঘরে পা দিতেই কি যেন ভাঙ্গল! চারদিক থেকে অভাব এসে মানুষকে এমনভাবে চেপে ধরেছে — মানে ইয়ে — আজকাল সংসারে সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনাও মনটাকে ভয় পাইয়ে দেয়।

হাশেম : খুবই স্বাভাবিক চাচাজান। আমাদের মত পরিবারে এখন আর কোন ক্ষতিই সামান্য নয়। হোক না একটা চায়ের কাপ অথবা গ্লাস, কিনতে গেলেই কয়েক টাকা বেরিয়ে যাবে।

চাচাজান : হুঁম্ — জিনিসপত্রের দাম কবে যে আমাদের স্বস্তির পর্যায়ে নেমে আসবে! যাক, রিকশাওয়ালাটা হয়তো খুবই মার খেতো।

হাশেম : আপনার উদারতার জন্যই বেঁচে গেল। পথচারীদের বৈশিষ্ট্যই দাঁড়িয়ে গেছে– কোন কিছু তলিয়ে না দেখেই মারধোর করা।

(সুমার মা আসে চা নিয়ে)

www.pathagar.com

সুমার মা : কি যেন ভেঙ্গেছে ওই পাশের বাসায়, আমাদের নয়। তারপর, কেমন আছ বাবা হাশেম?

হাশেম : কোন রকমে দিন চলছে। এত তাড়াতাড়ি চা —

সুমার মা : তোমার চাচাজানের আসার সময় এটা। চা তৈরীই ছিল এক রকম।

চাচাজান : বলছিলাম কি হাশেম– মন যা চায় তা করতে না পারাটাই যেন আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য।

হাশেম : তবুও মনটা আপনার বড় বলেই আজকের সকল নির্মম আক্রমণকে আপনি প্রতিহত করতে পারছেন। এমনি অবস্থায় অনেকেই ছটফট করছে, অসহায় হতাশায় তলিয়ে যাচ্ছে। অভাবের মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ আজ দিশাহারা।

চাচাজান : অথচ মনুষ্যত্ব দিয়েই মানুষকে এই মরুভূমিতে রচনা করতে হবে মরুদ্যান। সংগ্রাম করতে হবে মানুষের পরিচয়ে বেঁচে থাকার জন্য।

হাশেম : সুমাকে দেখতে পাচ্ছি না?

সুমার মা : সুমা গেছে তার এক বান্ধবীর বাসায়, দুপুরে। আসার সময় হয়ে গেল। তার বান্ধবীর বিয়ের ব্যাপারে কি একটা সমস্যা জানি আছে!

হাশেম : সুমার বিয়েশাদীর ব্যাপারে কিছু হয় নি এখনো?

চাচাজান : না, সুবিধামত কোন কিছু হয়ে উঠতে চাইছে না।

সুমার মা : আজকালকার কথা তো জানোই বাবা—'শুধু মেয়ে' কেউ নিতে চায় না। মেয়ের সঙ্গে তারা চায় কত কিছু —

চাচাজান : টাকাপয়সা না হলেও আজকাল চলে, যদি মেয়ের সঙ্গে একটা চাকরী দেওয়া যায় ছেলেকে। অথচ মেয়ে আমার দেখতে খারাপ নয়, লেখাপড়াও কিছু শিখেছে।

সুমার মা : হয় টাকাপয়সা, না হয় চাকরী– এসব হচ্ছে এখন বিয়েশাদীর শর্ত।

হাশেম : সুমাকে নিয়ে কোন সমস্যা হতে পারে বলেই তো আমি মনে করি না।

চাচাজান : আমিও সমর্থন করি হাশেম যে উপার্জনশীল না হয়ে বিয়ে করা উচিত নয়। কিন্তু বিয়েটাকে উপার্জনের একটা উপায় হিসাবে নেওয়া– এটা কেমন কথা।

www.pathagar.com

সুমার মা : মেয়েটাকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়েও করেছি ভুল। তা-ও যদি বেশী লেখাপড়া শিখত, না হয় তার উপর নির্ভর করেই থাকত। কিন্তু এদিকেও হল না, ওদিকেও না। বিয়েশাদীর এসব শর্ত তার কাছে লাগে রুচিহীন। সব কিছু বুঝতে পারে আর মনে মনে গুমরে মরে। মা হয়ে এমনি অবস্থায় আমার যে কেমন লাগে তা শুধু আমিই জানি, আর জানেন আল্লাহ্‌।

হাশেম : যদি অভয় দেন, আমি কিন্তু একটা ছেলের সন্ধান দিতে পারি।

চাচাজান : কি বললে? ছেলের সন্ধান দিতে পার! চাকুরে ছেলে?

হাশেম : জ্বি, ভাল টাকাই রোজগার করে।

চাচাজান : তা সে-ছেলে টাকাপয়সা ছাড়া বিয়ে করতে চাইবে কেন! বিয়ের বাজারে তার দাম তো অনেক!

সুমার মা : টাকাপয়সা চায় না- এমন ছেলে কি আর থাকতে পারে না?

হাশেম : আমি নিশ্চিত করেই জানি, টাকাপয়সা কিছুই সে চাইবে না।

চাচাজান : বল কি, আজকের দিনেও এমন ছেলে আছে?

হাশেম : এমন ছেলে সব সময়ই ছিল, এখনো আছে।

সুমার মা : থাকতে কি আর পারে না? হয়তো কোন অভাবই তাদের সংসারে নেই!

হাশেম : সংসার বলতেও ছেলের কিছুই নেই। কেউই নেই তার, সম্পূর্ণ একা। দেখতে সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র। ভাল রোজগার। তবে বয়সটা একটু বেশী — ত্রিশ-বত্রিশ।

(স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মুগ্ধ)

চাচাজান : তা হোক। তবু আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে!

সুমার মা : চমৎকার ছেলে, খুবই ভাল প্রস্তাব।

হাশেম : জ্বি, তবে একটা কথা আছে।

সুমার মা : কি কথা বাবা?

হাশেম : ছেলেটি খৃষ্টান থেকে মুসলমান হয়েছে। ধর্মপ্রাণ, অথচ পুরাপুরি আধুনিক।

(মা চাচাজানের দিকে চায়)

চাচাজান : তাতে কি হয়েছে — এখন তো সে মুসলমান!

সুমার মা : তাছাড়া অতীতের পরিচয় দেবারও যখন কেউ আর বেঁচে নেই —

www.pathagar.com

হাশেম : জ্বি, এদিক থেকে বলা যায়– অতীতটা তার একেবারেই কাট্ অফ্।

চাচাজান : চিন্তা করলে কিছুটা ট্র্যাজিক সন্দেহ নেই, তবু ভালই হয়েছে বলতে হবে। তাছাড়া যে-ছেলে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে– তাকে সাদরে আপন করে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে।

হাশেম : তা তো অবশ্যই। আগে তার নাম ছিল জন, হাসপাতালের এক ম্যাট্রনের ছেলে জন। এখন জানে আলম খান। বর্তমানে আলম খান আমার খুবই ঘনিষ্ট বন্ধু। অবিশ্যি তার অফিসে আমার চাকরী পাওয়ার মাধ্যমেই আমাদের পরিচয়। সে না থাকলে হয়তো চাকরীটা আমার হতই না। আমি যদ্দূর জেনেছি চিনেছি তাকে– তাতে জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, ছেলে হিসাবে আজকের দিনে তার তুলনা মেলা ভার। অমন একটা সুন্দর রুচিবান মন আজকের দিনে সত্যিই বিরল।

সুমার মা : সেটাই হচ্ছে সবচে' বড় কথা। একটা সুন্দর রুচিবান মন নিয়ে মেয়েমানুষ যত সুখী হয়, এমন আর কোন কিছুতে নয়।

হাশেম : আপনারা যদি মত দেন, তাহলে আমি ওকে এ-ব্যাপারে সব জানাতে পারি।

চাচাজান : নিশ্চয়ই — (হঠাৎ থেমে স্ত্রীর দিকে চেয়ে) মানে — তুমি বল সুমার মা, তুমিই প্রথম বল।

সুমার মা : আমার জন্য অপেক্ষা কি আর করেছ তুমি? তুমিই বাকীটা বল না!

চাচাজান : আরে না না, তুমি হলে মেয়ের মা। তোমাকেই তো প্রথম বলতে হবে।

সুমার মা : তুমি ছেলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কর বাবা।

চাচাজান : আমরা তো রাজী। কিন্তু ছেলের মতামত —

হাশেম : আমি জানি, সে রাজী হবে। আপনারা যদি ছেলের সঙ্গে আলাপ করতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। তবে সুমার মতামতটা জানতে পারলে আমার সামনে কোন বাধাই আর থাকত না।

সুমার মা : সুমা এ-ব্যাপারে অমত করবে না, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

www.pathagar.com

চাচাজান : আগে তুমি ছেলের সঙ্গে আলোচনাটা সারো, তারপর দেখবার জানবার সময় ঢের পাওয়া যাবে— কি বল সুমার মা?

সুমার মা : তুমি ঠিকই বলেছ। যেখানে আমাদের হাশেমের পছন্দ হয়েছে ছেলেকে, সেখানে দেখাশুনার দরকারই বা কি?

চাচাজান : তা বটে। আমাদের হাশেমও তো বিয়ের সময় ওর শ্বশুরের কাছ থেকে একটা পয়সাও দাবি করল না। তাই নিয়ে আত্মীয়-স্বজনরা কত মুখ টিপে হাসল! চোখ টাটালো কত জনের!

সুমার মা : কত জনে বললঃ পছন্দ-করা মেয়ে বিয়ে করে হাশেম মিয়া কি ঠকাটাই না ঠকেছে।

চাচাজান : কিন্তু সুমার মা, হাশেম বাবাজীকে শুধু এক কাপ চা খাইয়েই বিদায় করছ?

সুমার মা : একটু বস বাবা, আমি কিছু নাশতার যোগাড় করছি।

হাশেম : না চাচীআম্মা, আমি এখখুনি উঠব।

(সুমা আসে বাইরে থেকে)

এই যে সুমা!

সুমা : হাশেম ভাই! এতদিনে মনে পড়ল আমাদের কথা?

(মা চলে যায়)

ভাবীকে আনেন নি?

চাচাজান : আলাপ কর তোমরা। আমি দেখি, সুমার একটা ফটো পাই কি না।

(চলে যায়। ফটোর কথায় সুমা হাশেমের দিকে তাকায়, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে)

সুমা : আমার ফটো?

হাশেম : তোমার ভাবী আসবেন কোন এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। তার প্রথম আয়োজনের জন্য এ-বান্দা কাজে লেগেছে। তারপর, বান্ধবীর বিয়ে স্থিরীকৃত?

সুমা : হঠাৎ নাটক করতে লেগে গেলেন?

হাশেম : যে অনুষ্ঠানের আয়োজনে আমি আছি, তা যে যথেষ্ট নাটকীয় হবে— সে-সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

সুমা : সে-নাটকের কোন চরিত্রে আমাদের মত অভাজনেরাও কি চান্স পাবে?

www.pathagar.com

হাশেম : অবশ্যই, এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রে।

সুমা : ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন বলতে হবে!

হাশেম : উত্তরে শুধু বলতে পারিঃ হাস্যাননা হে ভগিনী, ভাগ্যকে প্রসন্ন করে গড়ে তোলাই নর কিংবা নারী সবারই একান্ত কাম্য। এবং তার জন্য চাই বাস্তব জ্ঞানের দীপ্ত ঝলক, চাই বিশাল ঔদার্যের পরম আশ্বাস।

সুমা : সে-আশ্বাস না হয় দেয়া গেল, কিন্তু নাটকের অন্যান্য চরিত্র?

হাশেম : ধীরে ভগিনী, ধীরে। তার আগে তোমার বান্ধবী-সংবাদ?

সুমা : আপনাদের মত কত জ্ঞানী-গুণী আত্মীয়-পরিবৃতা আমার বান্ধবী শেষ পর্যন্ত মিলিত হতে যাচ্ছে তার দয়িতের সঙ্গে। কিন্তু বলিহারি হাশেম ভাই, ওইসব আত্মীয়-স্বজনের বাস্তব জ্ঞানের দীপ্ত ঝলক কি প্রখর!

হাশেম : খুলে বল।

সুমা : ছেলেটি খুবই সাধারণ ঘরের। তাই কিছুতেই এ-বিয়ে হওয়া উচিত নয়— বিশ শতকের শেষ দিকেও আত্মীয়-স্বজনের ছিল এই অমোঘ রায়। কিন্তু বান্ধবী আমার পরাজয় মেনে নিতে কিছুতেই রাজী হল না। শেষে আমরাই বিজয়ী হলাম।

হাশেম : বল, মানুষের পরিচয় শুধু মানুষ হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলে।

সুমা : তা-ই।

হাশেম : আমার ভগিনীর এ-মহত্ত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়, এ-কামনাই করছি আমি।

সুমা : আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

(চাচাজান আসে সুমার একটা ফটো নিয়ে। সুমা বেরিয়ে যায়)

চাচাজান : এই নাও হাশেম, সুমার এই ফটোটা নিয়ে যাও।

(হাশেম ফটোটা নেয়)

হাশেম : ফটোর কোন দরকারই ছিল না। আমার বন্ধু ও-রকম ছেলেই নয়। সে চায় স্নেহময় এক আশ্রয়। সে চায় এমন মানুষ, যে বা যারা তাকে আপনার জন করে কাছে টেনে নেবে।

(মা আসে নাশতা নিয়ে)

আমি এখন আর কিছুই খাব না চাচীআম্মা।

www.pathagar.com

সুমার মা : খুবই সামান্য নাশতা। এত আনন্দের একটা খবর আজ পাব, কখনো মনেই আসে নি।

চাচাজান : সুমার এমনি ফটো আরও কেউ কেউ নিয়ে গেছে বাবা, আর ফেরতও দিয়ে গেছে তেমন কিছু না বলেই।

হাশেম : সুমার মত মেয়েকে নিয়েও বাপ-মায়ের চিন্তা করতে হয় — আশ্চর্য।

চাচাজান : বুঝবে না বাবা, সুমার কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের যে কেমন লাগে, বয়স্কা মেয়ের বাপ-মা ছাড়া কেউ আর তা বুঝবে না। তুমি ছেলেটার সঙ্গে কথাবার্তা বল। হাসিমুখে সুখবর দেবে এসে, সে-আশাতেই আমাদের সময় কাটবে।

(হাশেম নাশতার প্লেট থেকে সামান্য কিছু মুখে দেয়)

হাশেম : আমি এখ্খুনি ওর কাছে যাচ্ছি। সুসংবাদ নিয়ে এসে ভাল করে নাশতা খাব।

(চলে যায়)

(একটা মেসের রুম। আলম খান জানালার পাশে চৌকীতে পা ছড়িয়ে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগরেট টানছে আর দেখছে বাইরের নীল আকাশ। পাশের চৌকী থেকে সদ্য জেগে ওঠা রহমান সাহেব বলছেন-)

রহমান : কি হল, আকাশের সঙ্গে একেবারে মিতালী করে বসলেন নাকি? ও মিষ্টার জানে আলম খান!

আলম খান : কেন বলুন তো?

রহমান : বিকালটা enjoy করার জন্য যখন চাদরের নীচে গেলাম, দেখলাম জানলার ধারে গিয়ে বসলেন। এই প্রাক-গোধূলী লগ্নে চোখ মেলে যখন তাকালাম, দেখছি একইভাবে একই জায়গায় বসে। জিজ্ঞাস করলাম কিছু কথা। অন্যমনস্ক। তাই বলছিলাম — প্রেমে পড়লেন নাকি?

আলম খান : ওটা সম্পর্কে একেবারই যে ইচ্ছাশূন্য — তা আর কি করে বলি!

রহমান : পড়ে যান ভাই, প্রেমেই পড়ে যান। সময়টা কাটবে ভাল। সংসার জ্বালা লাঘব করতে বড়ই উপকারী। শত অভাব, লাখো চিন্তার মাঝেও সময় কাটাবেন একেবারেই চিন্তাহীন।

www.pathagar.com

আলম খান : প্রেসক্রিপশনটায় অথরিটির সুর বাজছে যেন? যেন অতীতেরই কথাকলির আলাপ?

রহমান : বলুন অভিজ্ঞতার প্রলাপ।

আলম খান : প্রয়োজনে শিষ্য হয়েও এ-বিষয়ে আমি জ্ঞানপ্রার্থী।

রহমান : অন্যের জ্ঞানদানের গুরুর দীক্ষার ওতে কিছু লভ্য নেই। দুনিয়ার এই একটিমাত্র বিদ্যাই আছে, জ্ঞানলাভ করে যাতে অভিজ্ঞ হতে হলে কোন শিক্ষকেরই প্রয়োজন হয় না। গুরুহীন এ-বিদ্যায় স্বোপার্জিত জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। স্বশিক্ষিত হয়েই শুধু এতে সুশিক্ষিত হওয়া যায়।

আলম খান : জানতে বড়ই খায়েশ — আপনার এই অর্জনটা আরম্ভ হয়েছিল কখন থেকে?

রহমান : প্রথম যখন গোঁফ উঠতে আরম্ভ করে। বলতে পারেন- গোঁফ গজানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রেমের চারাও গজাতে আরম্ভ করে। সেই চারা তারপর পরিণত হল গাছে, ফল পরিণয়ে। তারপর ভাইরে পরিণতি!

আলম খান : পরিণতিটাকে নিশ্চয়ই শুভ বলে ধরে নিতে পারি!

রহমান : নিতেও পারেন, না-ও নিতে পারেন। তবে দিল্লীকা লাড্ডু বলে অবশ্যই মনে করতে পারেন।

আলম খান : খুবই পস্তাচ্ছেন নাকি?

রহমান : ততটা নয়। তবে প্রথম যৌবনের এই গজানো গোঁফ যেমন পরবর্তীকালে নিয়মিত বিদায় নিয়ে আসছে অর্থাৎ রোজ শেভ করছি, প্রেমের চিন্তাটাকেও তদ্রূপ আর তেমন লম্বা হতে দিচ্ছি না। ফলে, নিদ্রার গাঢ়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাক, এতক্ষণ আকাশের মেঘে মেঘে কার চুল খুঁজে বেড়ালেন? দেহধারিণী কেউ আছে, না শুধুই কল্পনা?

আলম খান : আকাশে তো মেঘই নেই! শুধুই নীল — নিঃসীম নীলাকাশ।

রহমান : বা বা বা — নিঃসীম নীলাকাশ! আর একটু বাড়িয়ে বলুন না- নিঃসীম নীলাকাশ তারই নীল চোখ যেন।

আলম খান : আকাশের মত নীল চোখ কারও থাকে কি না জানি না, তবে এদেশে তা পাব কোথায়? অবিশ্যি আপনার অভিজ্ঞতায় —

রহমান : অতটা রঙ মিলিয়ে দেখি নি। তবে ওইসব চোখটোখ, একটু-আধটু আকাশ-বাতাস, পাখী-টাখী, নদী-নালা যে সবার মত আমিও দেখি নি, তা নয়।

www.pathagar.com

আলম খান : তারপর?

রহমান : সব ফাঁকিবাজি ভাই রে, সব ফাঁকিবাজি! শেষতক যা পাওয়া যায়, কবিরা তাকে হৃদয়ের দাগা বলে থাকেন।

আলম খান : আহ্‌হা রে!

রহমান : বেরুবেন কোথাও?

আলম খান : নাহ্‌, বসে থাকার একটা ঝোঁক এসে গেছে।

রহমান : তাহলে আপনি বসে বসে আকাশ দেখুন, আমি দেহটায় একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি। (যেতে গিয়ে) এই যে নিন, আর এক বন্ধু এসে গেছেন।

(হাশেম আসে, রহমান বেরিয়ে যায়)

হাশেম : আছিস্ তাহলে? ভাবলাম, হয়তো পাবই না।

আলম খান : আজ আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে হল না। ঘরে থাকতেই ভালো লাগছে।

হাশেম : হ্যাঁ! আজ এসময়টা ঘরে থাকতে তোর ভালো লাগছে! রহমান সায়েব হয়তো এ নিয়ে ঠাট্টা করতেন, কিন্তু আমি এতে দেখতে পাচ্ছি এক অপূর্ব যোগাযোগ — মানে ভবিতব্যের একটা নির্ঘাত ইঙ্গিত।

আলম খান : অর্থাৎ?

হাশেম : যা ঘটতে যাচ্ছে — মানে যা ঘটা উচিত বলে আমার স্থির বিশ্বাস, তার একটা কন্‌ফারমেশন্। আর যা সংঘটনের জন্য তোকে ঘরে পাবার আশায় ছুটে এলাম — ভবিতব্য যেন তা-ই ঘটাবার জন্য ছুটির দিনেও তোকে ঘরে রেখে দিয়েছে!

আলম খান : সেন্ট্ পার্সেন্ট্ হেয়ালী হয়ে গেল যে।

হাশেম : তোর বিয়ে ঠিক করে এলাম।

আলম খান : কি বললি? বিয়ে — মানে আমার বিয়ে?

হাশেম : হ্যাঁ, তোর না তো কার? রহমান সায়বের মত আমিও বিবাহিত, একেবারে ছেলেমেয়ের বাপ। কৌমার্য ধরে বসে আছিস্ শুধু তুই।

আলম খান : তোর গুল্ মারার কিছুটাও সফল হতো যদি বলতি — তোরই জন্য আবার একটা বিয়ে ঠিক করে এলি। আমার সঙ্গে রসিকতার আর কি কোন বিষয় খুঁজে পেলি না?

www.pathagar.com

হাশেম : হায়রে, যার জন্য করি চুরি — আরে, শুধু তুই হলে না হয় গুলই মারতাম, কিন্তু সম্পর্কের দিক দিয়ে অন্য পক্ষটি যে আমার বোন।

আলম খান : তাই বন্ধুকে বোনাই করার খেয়াল চেপে গেল?

হাশেম : খেয়াল কি আর এমনিই চাপে! বন্ধুটিকে পাত্রীস্থ করার গুরুদায়িত্ব যে অনুভব করি সারাক্ষণ!

আলম খান : বার্তাটুকু যত অসম্ভবই হোক, সুখপ্রদ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিয়ে — কথাটা শুনতেও কেমন জানি লাগে।

হাশেম : লাগাটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ সারাক্ষণ কল্পনায় দীনতা আর দুর্বলতার মাঝে তুমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখছ।

আলম খান : তা-ই যদি হত, তাহলে ভেসে ওঠার চেষ্টা করতামা। কিন্তু দুর্বলতা আর দীনতায় আমি আজন্ম বন্দী হাশেম!

হাশেম : কিসের দুর্বলতা? দীনতা কিসের? স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র যুবক তুমি, সংসারে সম্পূর্ণ একা। উপার্জনশীল, অভাবমুক্ত। এমনি অবস্থায় হাজার ভাবনার জঞ্জাল সরিয়ে একবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। দেখবে, 'কিছু নেই'-এর কুয়াশা কাটিয়ে 'সব পেয়েছি'র ঘরে তুমি প্রতিষ্ঠিত।

আলম খান : কিন্তু সুদীর্ঘ ধৈর্যের পর আমি ক্লান্ত।

হাশেম : রাখ তোমার কথার বুনট। সোজা কথায়, বিয়ে করে তোমাকে ছোট্ট একটা সংসার সাজাতেই হবে।

আলম খান : তবুও দ্বিধা — সংসার সাজাতে গিয়ে সং সাজাই না সার হয়!

হাশেম : সে-সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাছাড়া সময়ের মত সময় চলে যাচ্ছে। এমন নয় যে, তুমি চিরকুমার থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তাই মনে-প্রাণে যা চাও — সেই বিয়ে করতে গিয়ে দীনতা আর দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়েই বরং সং সাজার পথে এগিয়ে যাচ্ছ।

আলম খান : কিন্তু আমি চাইলেই তো আর বিয়ে করা হয়ে যাচ্ছে না। যত মহৎ চিন্তাই আমরা করি না কেন, বলি না কেন যত বড় বড় কথাই, আত্মীয়-পরিজনহীন খৃষ্টান থেকে মুসলমান হওয়া একটি লোককে —

www.pathagar.com

হাশেম : সসম্মানে আপন করে নেওয়ার লোকের অভাব আজ আর মোটেই নেই। দূর সম্পর্কের হলেও চাচাজানকে যতদূর জানি, একজন সৎ খৃষ্টানের কাছেও বিয়ে দিতে তিনি অমত করবেন না, যদি —

আলম খান : পেছনে উপযুক্ত কারণ থাকে। যদি মেয়েটি খৃষ্টানকে বিয়ে করতে সিদ্ধান্ত করে থাকে।

হাশেম : Agreed. এবং সে–'যদি'র প্রশ্নই ওঠে না যখন ছেলেটি মুসলমান হয়েই বসে আছে। তাছাড়া চাচাজানের 'হাশেম বাবাজী' যখন ছেলেটিকে ফাইন্যালি পছন্দ করেছে। সুতরাং বন্ধু —

আলম খান : মেয়েটির মতামতের তোয়াক্কা না করেই এ–বেচারাকে বিয়ের পাগড়ী বাঁধতে হবে?

হাশেম : হবে এজন্য যে মেয়েটার মতামত কিছুটা জানেন বলেই হাশেম সাহেবের ধারণা। অতএব, এই রইল সুমার ফটো, তোমার সম্মতি নিয়েই আবার আমি ছুটলাম চাচাজানের দরবারে।

আলম খান : এত তাড়াহুড়া করার কোন দরকার কি সত্যিই আছে হাশেম?

হাশেম : আছে এবং সে–দরকার জরুরী।

(চলে যায় হাশেম। আলম খানের মনে রাজ্যের চিন্তা। — ফটোটা সে হাতে তুলে নেয়। দেখে। আলম খান যেন তলিয়ে যায় মেয়েটিকে জানার চিন্তায়। — মেয়েটির ফটোতে আস্তে আস্তে ভেসে ওঠে বধূবেশী সুমার চেহারা। ঘোমটা দেওয়া বউ। মুগ্ধ ভ্রান্তির মাঝেই আলম খান বলে যায় কত কথা।)

আলম খান : আমাদের বিয়ে হবে? হলে বলব– কতবার আমি হাশেমকে বলেছি তোমার মতামত নিয়ে একাজে এগোতে। সে কান দেয় নি আমার কথায়। বার বার আমার মন জানতে চেয়েছেঃ পরিজন–পরিচয়হীন তোমাদেরই ধর্মবিশ্বাসে নবদীক্ষিত এই একলা মানুষটিকে তুমি কি পারবে সুমা আপন করে নিতে? শুনেছি তোমার প্রশংসা–গীতি, সব পাওয়ার আনন্দে আজ আমার হৃদয়–মন ভরপূর। এ–বিয়েতে তোমার মত আছে জেনে আকাশের সবটুকু নীলিমা এসে আমার চোখে মেখে

www.pathagar.com

দিয়ে গেছে মোহের অঞ্জন। সাধারণ নিয়মে তোমাকে দেখতে চাই নি তোমার অসম্মান হবে বলে। চোখে না দেখলেও মন আমার দেখেছে, তুমি অনুপমা। তবু আমার সংশয়ঃ সুমা! তুমি কি সত্যি আমাকে আপন করে নিতে পারবে?

(ধীরে ধীরে ঘোমটা অপসারিত হয়। প্রকাশিত হয় বধূবেশী সুমার হাসিমাখা মুখখানি। আলম খান তাতে খুঁজে পায় যেন পরম আশ্বাস)

সুমা!

(চাচাজানের ঘর। সুমা ও হাশেম কথা বলছে-)

সুমা : বলুন না কি বলতে চান।

হাশেম : এ-বিয়েতে তোমার মতামত?

সুমা : তার আমি কি জানি।

হাশেম : না না, একটু খুলে বল সুমা। তোমার মতামত না পেয়ে এ-কাজে এগোতে সে ভয় পায়।

সুমা : এতে ভয়ের কি আছে?

হাশেম : ভয়ের কিছু নেই? তুমি হবে তার জীবন-সাথী। তোমাকে পাশে নিয়েই সে দাঁড়াতে চায় এ কঠিন দুনিয়ার বুকে। এমনিতে তার সবটুকু পরিচয়ে কেউ কেউ তেমন খুশী না-ও হতে পারে। নিজেকে সে চাপিয়ে দিতে চায় না কারও জীবনের উপর। বল সুমা।

সুমা : আমি আপনার মত অতসব বলতে পারব না।

হাশেম : কিন্তু এর জন্যই তো আমার বিশেষ করে আসা। তোমার ভাবীকে দিয়ে জেনে নেওয়াই ছিল সবচেয়ে শোভন, সবচেয়ে সহজ। কিন্তু সে শুনতে চায় আমার মুখ থেকেই। বল।

সুমা : সাধারণভাবে আমি তো জানি, মানুষের পরিচয় মনুষ্যত্বেই, তার চরিত্রে। জাত-ধর্মের বিচার - তা তো বিচারের এক সাধারণ মানদণ্ড মাত্র!

হাশেম : মন আমার আনন্দে আর গৌরবে ভরে গেল সুমা! ও, ভুলে গিয়েছিলাম— এই যে তার ফটো।

(ফটো নিয়ে সুমা উঠে চলে যায়। চাচাজান আসে)

www.pathagar.com

চাচাজান : ছেলের রাজী হওয়ার কথা বাড়ী ঢোকার পথেই তোমার চাচীআম্মা আমাকে বলেছে। ও! কি যে শান্তি দিলে বাবা। কি আর বলবো তোমাকে।

(সুমার মা আসে)

তাহলে শুভকাজে আর দেরী করা ঠিক নয়। তুমি পরের ব্যবস্থাগুলো সব করে ফেল। কি বল সুমার মা?

সুমার মা : হাশেম মিয়া আমাদের জন্য যা করলো, পেটের সন্তানও সব সময় তা করে না। এ–কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক, এ আমার সর্বক্ষণের কামনা।

চাচাজান : জান বাবা, আজ বহুদিন পর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুবো।

হাশেম : আমি এবার আসি?

সুমার মা : আর একটু বসবে না বাবা?

হাশেম : আরও কত আসতে হবে। আজ আসি।

(হাশেম উঠে পা বাড়ায়। সুমা আসে চা নিয়ে)

আবার চা নিয়ে এলে যে!

চাচাজান : খেতে আর কতক্ষণ লাগবে। সুমার মা, শোন তো!

(দুজনেই বেরিয়ে যায়)

হাশেম : কিন্তু চা–এ মনোনিবেশ করার মত মানসিক অবস্থা আমার নেই যে এখন!

সুমা : মনোনিবেশ করে চা কেউ খায় কখনো?

হাশেম : হয়তো খায় না। কিন্তু আল্‌তোভাবে মনে ভাসে তখন যেসব চিন্তা, বর্তমানে তা-ই আমার কাছে আর আল্‌তো নয়, রীতিমত সীরিয়াস্‌। বলা যায় হৃদয়–মন আচ্ছন্নকারী।

সুমা : আচ্ছন্নকারী এত চিন্তা কোন্‌ পক্ষের জন্য?

হাশেম : বর্তমানে আমি তো এক দ্বিপক্ষ জীব। বরং বলা চলে, দুই পক্ষের মধ্যে আমি এক হাইফেন মাত্র। খুবই সামান্য অস্তিত্ববিশিষ্ট।

সুমা : তাই নাকি?

হাশেম : হ্যাঁ, দুইপক্ষকে একপক্ষ বানিয়ে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিষ্পক্ষ করতে পারলেই বাঁচি। (ততক্ষণে চা খাওয়া হয়ে গেছে) তাই বিদায় নেওয়াটাই এখন পরম কর্তব্য আমার।

www.pathagar.com

(বেরিয়ে যায়। আলম খানের ফটো হাতে নিয়ে দেখে সুমা। টেবিলে রাখে ফটোটা। ভেসে ওঠে আলম খানের মুখ)

আলম খান : হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অরণ্য চিরকাল লুকিয়ে রেখেছে যে-বুভুক্ষা, তার দাবী এত দুর্নিবার — কই, আগে তো এতটা কখনো অনুভব করি নি।

সুমা : (মুগ্ধকণ্ঠে) কখনো কর নি? কখনো না?

আলম খান : এতটা উজাড় করে কখনো নয়।

সুমা : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার তো দেখাই হয় নি। অপরিচিতা একটি মেয়ে এত বুভুক্ষা জাগালো তোমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায়— কেন? শুধু একটা মেয়ে বলেই কি? শুধু কি একটি নারীর আসঙ্গ-লিপ্সা? কোন নারীর কোন সান্নিধ্যেই আস নি জীবনে?

আলম খান : হয়তো এসেছি, কিন্তু মনের যে-আকৃতি মানুষকে করে মাতাল দিশাহারা, সে-আকৃতি এত প্রবল হয়ে আর কখনো দেখা দেয় নি মনে। সুমা, কেন যে এই আকৃতি, তোমার কাছে তা প্রকাশ করতে কেউ দিচ্ছে না। কিন্তু — জান সুমা, আমি চাই এমন এক জীবন-সাথী মমতায় ভরা থাকবে যার ভালবাসা, যে সিক্ত করে দেবে আমার নিঃসঙ্গ জীবন, দূর করে দেবে বাইরের অনাকার অন্ধকার, ভরে দেবে শূন্য ঘরের নিঃসম্বল প্রাণ।

সুমা : এত একা কেন তুমি? এত নিঃসঙ্গ, নিঃসম্বল?

আলম খান : শুনবে সুমা, শুনবে তুমি এই কেন'র উত্তর?

(মা ও চাচাজান আসে)

চাচাজান : সুমা! (সুমার ধ্যান ভেঙে যায়) সুমা! হাশেমের কাছে আমরা সবই শুনলাম। আমরা খুশী হয়েছি। সবই তো ভাল, শুধু — মানে কেউ কেউ বলতে পারে — যাক গে', এমন ছেলে হাজারে একটা মিলে না।

(আলম খানের ঘর। আলম খান ভাবছে বসে বসে। টেবিলের উপর প্রতিপালিকা মা ম্যাটনের ছবি)

আলম খান : তবু আমি ভয় পাই। ভয় পাই, যখন ঘর বাঁধার জন্য স্বপ্নের মৌচাকে জমা হয় অনেক মধু। হয়তো পেতাম না ভয়,.

www.pathagar.com

হয়তো কেন — নিশ্চয়ই ভয় পেতাম না যদি তুমি আজ বেঁচে থাকতে মাম্মি! তোমাকে সামনে রেখে শক্ত পায় আমি দাঁড়াতে পারতাম। আমাকে হেয় করার সকল প্রচেষ্টা তুমি ব্যর্থ করে দিতে তখন। কিন্তু আজ? আজ আমি একা, সকল দুর্বলতা গায়ে মেখে আমি সম্পূর্ণ একা।

(হাশেমের ডাকে ফিরে তাকায় আলম খান)

হাশেম : এই যে, জনাব জানে আলম খান! — আবার বসে বসে ভাবছিস্? মনে হচ্ছে, এক মানসিক রুগীতে পরিণত হচ্ছিস্ তুই?

আলম খান : না না, কি যে বলিস্!

হাশেম : তাহলে সব সময় এত চিন্তা আর ভাবনা কেন? যেন সবাই তোর দিকে উপহাস ছুঁড়ে মারতে আসছে! দুনিয়ার মানুষ যেন বলতে আসছেঃ ওই যে, জানে আলম সেজে বিয়ে করতে চায় জন, আপনজন নিয়ে সংসারী হতে চায়।

আলম খান : না, আমি তা ভাবছি না। তবুও —

হাশেম : তবু টবু থাক। এবার চল্ আমার সঙ্গে।

আলম খান : কোথায়?

হাশেম : বাইরে। দেখবে — বাইরের আকাশটা যেমন উদার, মানুষগুলোও তেমনি সঙ্কীর্ণতার জাল নিয়ে তোকে আটকাবার জন্য ওঁৎ পেতে নেই। চল্। (হাত ধরে নিয়ে চলে) পায়ে চলার পথে পথে যত বাধাই আসুক, মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে হয়। আকাশের বিশালত্বকে অনুভব করতে হলে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয় কল্পিত ভয়-ভীতির সকল জঞ্জাল, কাপড়চোপড় থেকে যেমন করে ঝেড়ে ফেলি আমরা দৈনন্দিন ধুলোবালি।

(বেরিয়ে যায় দু'জনে)

•

(মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে হাশেম ও আলম খান। শব্দমুখর কর্মচঞ্চল পৃথিবী। শত মানুষের কর্মব্যস্ত আনাগোনা। পাশেই রমনার মাঠ, সবুজের মেলায় নারী-পুরুষ-শিশু। দুইবন্ধু নীরবে দেখে যায়)

www.pathagar.com

(শিশু–পার্কে শিশু–কিশোরদের কলকাকলী। পাশে কর্মব্যস্ত মানুষের ভিড়। ভিড় গাড়ী-ঘোড়ার। দুই বন্ধু দাঁড়ায় সেখানে।

খেলার মাঠে চলছে খেলা-ধূলা। দর্শকদের ভিড় সেখানেও। তাদের মধ্যে আছে দুই বন্ধু।

স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে ও তরুণ-তরুণীদের অবাধ বিচরণ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা–ই দেখে হাশেম ও আলম খান।

হোটেল-রেস্তোরাঁয় প্রাণবন্ত মানুষের মেলা। টেবিল থেকে উঠে বাইরে আসে হাশেম ও আলম খান।

নদীতে খেয়া পার হচ্ছে মানুষ, মাল-বোঝাই নৌকা চলছে কোন্ গন্তব্যে। দুই বন্ধু তীরে দাঁড়িয়ে তা–ই দেখছে।

মাঠে–ময়দানে কর্মরত ও চলিষ্ণু অনেক মানুষ। পথ চলছে হাশেম ও আলম খান।

রাস্তার ধারে গৃহহীন নোংরা ময়লা পড়া মানুষের ঘরকন্না, রান্নার আয়োজন। তারই পাশ দিয়ে হেঁটে যায় দুই বন্ধু।

রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে নগ্নদেহ শিশু। আলম খান দাঁড়ায়)

হাশেম : দাঁড়ালে কেন? আয়।

(হাত ধরে আলম খানকে নিয়ে চলে হাশেম)

জীবন চলছে, বেপরোয়া। হয়তো কখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কিন্তু চলছে।

(আলম খানের দৃষ্টিতে শাড়ীর দোকানে শাড়ী দেখছে হাশেম, পাশে আলম খান। তার চোখে ভাসতে থাকে: শিশু কোলে সর্বহারা এক ভিখারিণী। তা–ও মিলিয়ে যায় এক সময়;

www.pathagar.com

চল্, শাড়ীর দোকানটা ঘুরে আসি। সেই সঙ্গে গহনার দোকানও। ওসবের দরদামটা জেনে নিতে হয়। কিছু তো লাগবেই।

(সোনার দোকানে হাশেম আলম খানের চোখের সামনে মেলে ধরে একটা জালি-জালি গলার হার)

(চাচাজানের ঘর সেখানে রয়েছে চাচাজান, হাশেম ও আলম খান)

চাচাজান : তাহলে তো আর দেরী করার মানেই হয় না, কি বলো বাবা হাশেম?

(আলম খান চোখ নীচু করে বসে আছে)

হাশেম : জ্বি না, দেরী করার তো কোন কারণও দেখছি না। আলমের দিক থেকে যে-কোনও দিনই অসুবিধা হবে না।

(পাশের কোঠায় দাঁড়িয়ে সুমা শুনছিল সব। সরে যায় সে)

চাচাজান : আমরাও মনে করি, শুভকাজে আর দেরী করা উচিত নয়।

(বারান্দায় সুমার মা'র মুখে স্নিগ্ধ হাসি)

হাশেম : আপনারা যে-দিন স্থির করবেন — তা-ই ফাইন্যাল।

চাচাজান : তা বাবা ধর্মান্তরিত হলেও তোমার বাপ-মা —

(আলম খান মুখ তুলে তাকায়)

ও! তাঁরা তো কেউ বেঁচে নেই। সে যাক গে' — মা সুমার সঙ্গে তো তোমার দেখাসাক্ষাত হয়েছে?

আলম খান : জ্বি।

চাচাজান : এতে লজ্জার কিছু নেই বাবা। তোমরা ঘর-সংসার করবে, আগে কিছুটা আলাপ-পরিচয় করে নেয়া ভালো। শুধু আজকে নয়, আমাদের ফ্যামিলিতে কন্‌জারভেটিযম্ আগেও তেমন ছিল না। তখন অবিশ্যি এর জন্য সবাই কিছুটা নাক সিঁটকাতো।

হাশেম : ওর সব কিছুই পছন্দ হয়েছে এ-বাড়ীর।

চাচাজান : হ্যাঁ, না হবার তো কথা নয়। অভাব-অনটন পড়েছে আজকাল। তা না হলে দেখতে পেতে, বিয়ের পাকা কথায় কত ফর্‌ম্যালিটিয্! যাক — বলছিলাম কি হাশেম, একটা কাবিনের খসড়া তো তৈরী করে ফেলতে হয়। (আলম খানকে)

www.pathagar.com

কি বলো বাবা? (হেসে) না না, তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। ওটা খুবই সিম্পল্ — হাশেম বাবাজী রয়েছে। আমরাই করে ফেলবো। কোন কিছু নিয়েই তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আল্লাহ্ তোমার বাবা-মাকে নিয়ে গেছেন বলেই ভেবো না যে এ-দুনিয়ায় তোমার কেউ নেই। আমরা রয়েছি তো! আমাদেরকেই তুমি বাবা-মা বলে জানবে।

(আলম খানের চোখেমুখে পরম আকুলতা)

আলম খান ঃ আমি তো তা-ই জানতে চাই। এমনি করেই ভাবতে চাই।

চাচাজান ঃ তোমাকে দেখামাত্রই আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিলঃ তোমাকে ছেলে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারবো না।

আলম খান ঃ আমাকে একবার আম্মার সাথে —

চাচাজান ঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মাকে তো তোমার নিশ্চয়ই দেখবে। তিনি বোধ হয় একটু খাবার-দাবারের আয়োজনে ব্যস্ত।

আলম খান ঃ খাবার-দাবারের কি প্রয়োজন। তার চাইতে আম্মার আশ্বাসই আমার কাছে মহা মূল্যবান।

চাচাজান ঃ আসবে বাবা, সেই দিন আসবে। সারাজীবন ধরেই তো এরপর সবাই কাছাকাছি থাকব।

হাশেম ঃ ও বহুদিন স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বলা যায়, জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন।

চাচাজান ঃ একদিক থেকে চিন্তা করলে এমনি অভিজ্ঞতা জীবনে আসা ভালো। বঞ্চিত থেকে, বিচ্ছিন্ন থেকে, তারপর যে-জীবনকে পাওয়া যায়, তার মূল্য হয় অসীম। — এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। হাশেম কাবিনের খসড়াটা সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন নিয়ে রাখা যাক। কি বলো?

হাশেম ঃ জ্বি।

(কাগজ-কলম রেডি করে বলে-)

চাচাজান ঃ তা বাবা তোমার নাম তো জানি। তোমার বাবার নামটা?

আলম খান ঃ (মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়) আমার বাবার — আমার বাবার —

চাচাজান ঃ তাতে কি হয়েছে। তোমরা সবাই যে খৃষ্টান ছিলে তা তো জানিই। তোমার বাপ-মা বেঁচে নেই, কিন্তু খৃষ্টান হলেও তোমার বাবা তো আমার বেয়াই! নামটা বল বাবা, সঙ্কোচের কিছু নেই।

www.pathagar.com

আলম খান : না, সে-কথা নয় বাবা। আমার বাবার নাম —

(হাশেম উৎসুক, সপ্রশ্ন। বারান্দায় সুমার মা উৎকর্ণ)

আমার বাবার নাম যে আমি জানি না!

(হাশেম অবাক। সুমার মার মুখে প্রশ্ন। ও-ঘরে সুমার চোখেমুখে রাজ্যের জিজ্ঞাসা। চাচাজানের মুখে অন্ধকার নেমে আসে)

চাচাজান : জান না মানে? তুমি হাসপাতালের ম্যাট্রনের —

আলম খান : পালিত পুত্র। তিনি আমার জন্মদাত্রী নন।

চাচাজান : ও! তাহলেও তোমার একটা পরিচয় তো আছে?

আলম খান : গাঁয়ের এক দুঃখিনী মায়ের সন্তান আমি, এইটুকুই আমার ম্যাট্রন মা আমাকে বলতে পেরেছিলেন।

চাচাজান : দুঃখিনী মায়ের কথাটা তিনি জানতেন, জানতেন না দুঃখী বাপের কথাটা?

আলম খান : সে-সুযোগ মাম্মির হয়ে ওঠে নি, এটুকুই আমি জেনেছি।

চাচাজান : খুবই embarrassing situation!

হাশেম : কই, আমি তো এ-কথা কোনদিন শুনি নি?

আলম খান : বলি বলি করেও তোমাকে —

হাশেম : খুবই স্ট্রেঞ্জ!

আলম খান : বার বার তোমাকে আমি বলতে চেয়েছি- আগেই এখানে সবকিছু খুলে বল।

হাশেম : তুমি নিঃসঙ্গ, আমাদের সমাজে তুমি নবাগত। এই-ই আমি জানতাম। কিন্তু তুমি নিজের বাপের নাম জান না, একথা —

চাচাজান : থাক হাশেম, এ-জাতীয় কথা কম উচ্চারিত বা আলোচিত হওয়াই ভাল।

হাশেম : কিন্তু মিছিমিছি কয়েকদিন আপনাদের —

চাচাজান : অনেক সময় এমনটি ঘটে যায়। জানতে না যখন, কি আর করবে!

আলম খান : আসি।

(উঠে দাঁড়ায়। হাশেমও ওঠে)

www.pathagar.com

(বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় হাশেম দাঁড়ায়। আলম খান এগোয়। শোনে, হাশেমকে সুমা বলছেঃ "ছিঃ হাশেম ভাই, ছিঃ!" আলম খান বেরিয়ে যায়)

(রাত্রির ঢাকা নগরী। এখানে সেখানে আলোক সজ্জায় বিজ্ঞাপন, এখানে সেখানে অন্ধকার বাই-লেন। আলম খান পথ হাঁটছে একা। আলোকের বিজ্ঞাপন জ্বলছে, নিভছে, জ্বলছে। আলম খানের মনে হয়, বিজ্ঞাপনগুলো যেন পরিহাস করছে তাকে।

পথ চলছে আলম খান। হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছে জীবনের উল্লাস। জীবন এগিয়ে চলেছে আলম খানের জন্য অপেক্ষা না করেই, আলম খানকে বিবেচনায় না এনেই যেন।

এতিমখানার পাশ দিয়ে পথ চলছে আলম খান। এতিমখানার দালানটা যেন এক প্রাণহীন পাষাণ।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে আলম খান। পাশ দিয়ে চলে যায় একটা এ্যাম্বুলেন্স, সাইরেন বাজিয়ে। আলম খান চমকে ওঠে। বহুদিন আগে চলে যায় তার মন। সাইরেন বাজার শব্দ।

আলম খানের চোখে ভাসে হাসপাতাল — হাসপাতালে রোগী আর রোগী — নার্সদের কর্তব্য পালন — ম্যাট্রনের কোঠা — ম্যাট্রনের বাসা — ম্যাট্রন বসে আছে। জনরূপী আলম খান এসে ঢোকে)

ম্যাট্রন ঃ ও জন! তুই এসেছিস্?

জন ঃ হ্যাঁ মাম্মি। মাম্মি, আমি — আমি মিলিটারী সার্ভিসে জয়েন করছি।

ম্যাট্রন ঃ সে কি! কলেজে ভর্তি হলি, এরপর ডাক্তারী পড়বি তুই। এর মধ্যে লিমিটারীতে জয়েন করছিস্ —

জন ঃ সব দিক আমি ভেবে দেখেছি। মিলিটারীতেই আমি জয়েক করতে চাই।

www.pathagar.com

ম্যাট্রন : আমাকে ফেলে তুই চলে যাবি জন?

জন : এই দুনিয়াতে যখন-তখন একজন আরেজনকে ফেলে চলে যায় মাম্মি। এটাই তো নিয়ম। নিয়মকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ কর মাম্মি।

ম্যাট্রন : এই হাসপাতালেও রোগীদের সেবা করার একটানা কাজের মাঝখানে তুই-ই তো ছিলি আমার সব!

জন : আমি জানি মাম্মি। তুমিই তো দিয়েছ আমাকে জীবন। এক হতভাগার সামনে জ্বেলে দিয়েছ পৃথিবীর সব আলো। কিন্তু — কিন্তু মাম্মি, আমি আর পারছি না। সকল স্নেহ তোমার, সকল মহত্ত্ব আমাকে আর শান্ত হয়ে থাকতে দিচ্ছে না। সংগ্রামের কঠিন পথ আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে!

ম্যাট্রন : কলেজের জীবনেও তুই কি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিস্?

জন : বৌদ্ধযুগের কাহিনী — জাবালার সন্তান — এসব আমাদের পড়তে হয়। অথচ আজও মনে হয়, সময় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুই বদলায় নি। আমি তোমার পালিত পুত্র, এ-কথাই আজ যথেষ্ট নয়।

ম্যাট্রন : আমার সন্দেহ ছিল বরাবরই। তারই জন্য আমি তোকে ব্যাপ্‌টাইযও করি নি। কিন্তু ভাবছি, তোর মনের কাঁটা দূর করার সবরকম চেষ্টাই আমি করব।

জন : ততদিন আমাকে নূতন জীবনের উন্মাদনায় ডুবে থাকতে দাও। আমি মন স্থির করেছি মাম্মি।

ম্যাট্রন : বেশ। কেঁদে হলেও তোকে যেতে দিচ্ছি আমি। কথা দিয়ে যা, তুই ফিরে আসবি আমারই বুকে। এখানে তোর পথকে সুগম করার চেষ্টায় আমি রইলাম। তোর কাহিনী যতটুকু বলেছি তোকে, তার বাকিটা বলার ব্রত আমি নিলাম। তুই ফিরে আসিস্।

জন : আসব।

(সৈনিক জীবনের বিভিন্ন খণ্ড দৃশ্য। — বিমান আক্রমণের সাইরেন। — মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছে সৈন্যদল। — পজিশন নিচ্ছে সৈন্যরা এখানে ওখানে। — বোমা পড়ছে। — ধ্বংস হচ্ছে মানুষের সাজানো সংসার। — দৃঢ় সঙ্কল্পে সঙ্গীন উঁচিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা)

www.pathagar.com

(ম্যাটনের সেই ঘর। যুদ্ধফেরতা কে যেন দৌড়ে আসছে। ম্যাটন বসে আছে। তার পেছনটা দেখা যায়)

নেপথ্যে জন : (দৌড়ে আসতে আসতে) মাম্মি,আমি এসেছি! মাম্মি,আমার মাম্মি!

(ম্যাটন ফিরে তাকায়, বিস্মিত চোখে। দরজায় জন দাঁড়িয়ে)

জন : মাম্মি! (হাসি মিলিয়ে যায়) আপনি!

নূতন ম্যাটন : তিনি তো কয়েকদিন হল মারা গেছেন! আমি তাঁর জায়গাতেই এসেছি।

জন : ও, মারা গেছেন! মাম্মি নেই?

নূতন ম্যাটন : আপনি কি তাঁর —

জন : পালিত পুত্র, জন।

নূতন ম্যাটন : জন।

জন : আমার কথা উনি কাউকে কিছু —

নূতন ম্যাটন : উনি হার্টফেল করেছিলেন। কাউকে কিছুই বলে যেতে পারেন নি। তাঁর টেবিলের উপর পাওয়া গেছে একটা এ্যালবাম আর কিছু লেখা একটা ডায়রী। আমি সাজিয়ে রেখেছি। আপনি নিয়ে যান।

(একটা স্যুটকেস এনে দেয়)

জন : আমি তাহলে চলি।

(ঘরটা দেখে নেয় এদিক ওদিক তাকিয়ে)

(এতিম খানার পাশের রাস্তায় আলম খান। ভাবনা রেখে চলতে পা বাড়ায়। পাশে দেখে হাশেমকে)

আলম খান : তোমাকে খুবই লজ্জায় ফেললাম হাশেম।

হাশেম : তোমার লজ্জার তুলনায় আমারটা কিছুই নয়। আমি বুঝতে পেরেছি, চল।

আলম খান : (হাসে) জানে আলম সেজেও হল না বন্ধু!

(হাশেম গিয়ে আলম খানের হাত ধরে)

(আলম খান ও হাশেম বসে আছে আলম খানের ঘরে, জানালার পশে। জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরের আলো-আঁধারি শূন্যতা)

আলম খান : মাম্মি অনেক চেষ্টা করেছিলেন জানতে, কার ঔরশে কোন্ মায়ের কোলে আমি জন্মেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছুই জানতে

www.pathagar.com

পারেন নি। শুধু এইটুকুই জানা হয়েছিল, এক দুঃখিনী মায়ের সন্তান আমি।

(একটি শীর্ণকায় স্ত্রীলোক কোলে একটা ফুটফুটে শিশু নিয়ে ম্যাটনের কাছে ফল বিক্রি করছে। ফলগুলো নিতে নিতে ম্যাট্রন বলছে —)

ম্যাট্রন : তোমার ছেলেটা তো ভারি সুন্দর।

স্ত্রীলোক : ওর বাপের মতই দেখতে। গরীবের সন্তান বাপ-মায়ের বোঝা। কি যে খাওয়াই, কি পরাই। ওর বাপে কয়, এতিম খানায় দিয়া দেও।

ম্যাট্রন : তাই নাকি। তেমনটি ভাবছ নাকি?

স্ত্রীলোক : তাছাড়া উপায় কি মা?

ম্যাট্রন : সংসারে আমি একা। তোমার ছেলেটা আমাকে দেবে? আমি ওকে পালবো।

স্ত্রীলোক : আপনি নিবেন মা?

ম্যাট্রন : হ্যাঁ, মানে তুমি বললে কি না — ওকে এতিমখানায় দিতে চায় তোমার স্বামী। তাই বলছিলাম — যদি আমাকে দিতে, তাহলে —

স্ত্রীলোক : নেন্ না মা।

ম্যাট্রন : সত্যি দেবে?

(ম্যাট্রন ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করে)

নেপথ্যে

আলমের কণ্ঠ : সত্যি সত্যিই আমাকে দিয়ে দেওয়া হল ম্যাট্রনের কাছে। তিনি হলেন আমার মাম্মি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এমনিই যে, আমার সত্যিকার মা সেই যে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। হয়তো কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে তাঁর জীবনে। আমার সত্যিকার মায়ের খোঁজ নেওয়ানো হয়েছিল, কিন্তু কোন সন্ধানই তাঁর পাওয়া যায় নি। তাই আমি থেকেই গেলাম আমার ম্যাট্রন মায়ের কাছে, তাঁর আদরের জন হয়ে।

(নেপথ্যে কণ্ঠের বিবরণ দানের সময় দেখানো হবে, শিশুটির জামাকাপড় পরিবর্তিত হচ্ছে, তার আদরযত্নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে)

(ম্যাট্রন ছেলেটিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করাচ্ছে)

www.pathagar.com

ম্যাট্রন : হাঁটি হাঁটি পা পা — হাঁটি হাঁটি পা পা —। তোর মা যে গেল, আর ফিরে এলই না। তুই তো এখন ম্যাট্রন রেজিনার ছেলে জন। আমার জন হয়েই তুই বেঁচে থাক।

(ম্যাট্রন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে)

(আরও দিন গেছে। বড় হয়েছে জন। জনকে পাশে বসিয়ে ম্যাট্রন তাকে একটা এ্যালবাম থেকে জনের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন কাজের ছবি দেখাচ্ছে। তারপর একসময় দেখা যায়, ম্যাট্রন কোথাও নেই। যুদ্ধফেরত সাধারণ পোষাকে জন আপন মনে ম্যাট্রনের রেখে যাওয়া এ্যালবামটির পাতা উলটাচ্ছে। এক জায়গায় জনের সৈনিক বেশের ছবি। ছবিটির দিকে দৃষ্টি রেখে কত কি ভাবছে জন। সাইরেনের শব্দ ভেসে আসে জনের কানে। — আর ওদিকে টেলিফোনের শব্দ হতে থাকে ক্রমাগত)

(টেলিফোন অফিস। সেখানে অপারেটরদের কাজ করছে জন। পাশেই কাজ করছে তরুণী জোয়ান)

জোয়ান : যুদ্ধের জীবন এক অদ্ভূত উন্মাদনার জীবন বলেই তো জানি। সে–জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার পর একাজ ভালো লাগছে?

জন : না লেগে উপায় কি মিস্ জোয়ান?

জোয়ান : একটা কথা বলবো?

জন : বলুন।

জোয়ান : কিছু মনে করবেন না তো?

জন : না মিস্ জোয়ান, কিছু মনে করবো না।

জোয়ান : আমাকে ভুল বুঝবেন না তো?

জন : না।

জোয়ান : আপনি খুবই উদাস থাকেন।

জন : ও, এই কথা! আমি ভাবলাম, কি সীরিয়াস কথাই না আমাকে শুনতে হয়।

জোয়ান : কেন, এটা কি সীরিয়াস কথা নয়?

জন : সীরিয়াস!

জোয়ান : আপনার উদাস হয়ে থাকা মুখটা আমার খুব ভালো লাগে।

জন : (চট করে ঘুরে তাকায়) কি বললেন?

জোয়ান : আমি জানতাম, আপনি আঁতকে উঠবেন। সীরিয়াস্‌নেসের একটা ধাক্কা আছে তো!

www.pathagar.com

জন : ইয়ে মানে — .

জোয়ান : আমৃতা আমৃতা করছেন তো! এ-ও জানতাম। আচ্ছা, কোন মেয়ের মুখ থেকে ভালো লাগার কথা শুনলেই আপনারা এত আঁতকে ওঠেন কেন?

জন : না না, ঠিক তা নয়। মানে —

জোয়ান : হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগে?

জন : এত স্পষ্ট কথা-বলা মেয়ে আমি আর দেখি নি।

জোয়ান : অর্থাৎ খুব কম মেয়েকে দেখেছেন?

জন : আপনার কাছে বোধ হয় আমার সারেন্ডার করাই উচিত!

জোয়ান : বেড়াতে যাবে?

(অবাক হয়ে যায় জন)

আবার ধাক্কা লাগলো তো?

জন : আন্‌প্রিপেয়ারড্ কি না —

জোয়ান : অথচ I am sure মনে মনে preparation ঠিকই চলছিল। আমি 'তুমি' বলাতে ভালো লাগে নি তোমার?

জন : লেগেছে।

জোয়ান : তুমিও চাও 'তুমি' বলতে। কিন্তু তাওয়ানোই সার- তাই না?

জন : হ্যাঁ। বেড়াতে চল।

জোয়ান : কি বোকা বোকা তুমি? এখন কি ডিউটি শেষ হয়েছে?

জন : তাই তো! তাহলে?

জোয়ান : (কলকণ্ঠে হেসে ওঠে) ডিউটি শেষ হলে যাবো।

জন : কোথায় যাবো বেড়াতে?

জোয়ান : আকাশে।

জন : আকাশে!

জোয়ান : সময় পেলেই তো বসে বসে আকাশই দেখ। কি দেখ এত আকাশে?

জন : আকাশ দেখতে আমার ভালো লাগে।

জোয়ান : কবি নাকি?

জন : আকাশি কবির সংখ্যা আজ খুবই কম। তাছাড়া কবিতার ক'-ও আমি জানি না। তবু কেন জানি ভালো লাগে ওই আকাশটাকেই।

www.pathagar.com

(জন ও জোয়ানের একত্রে বেড়ানোর, একত্রে বসে থাকার অনেক ষ্টিল ছবি। শেষের একটা ছবিতে জোয়ানদের ড্রইংরুমে বসে আছে জন ও জোয়ান)

(জোয়ানদের ড্রইংরুম)

জোয়ান : বাবাকে তুমি বলবে, না আমি?

জন : (হেসে) ওসব আমি পারবো না।

জোয়ান : তুমি এত শাই কেন?

জন : এত শাই কেন তা জানি না। কিন্তু কথাটা তুমিই বল, প্রিয়।

জোয়ান : বেশ, আমিই বলবো। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে খুব ভালো হত।

জন : কে জানে!

(জোয়ানের বাবা আসে)

বাবা : এই যে জোয়ান, তোরা এসেছিস্?

জোয়ান : বাবা, জন আজ তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। বড্ড শাই।

বাবা : (হেসে) তাই নাকি?

জোয়ান : বাবা!

বাবা : কি মা, কিছু বলবে?

জোয়ান : হ্যাঁ–মানে–ইয়ে – জন আমাকে বিয়ে করতে চায়।

(জন মাথা নোয়ায়)

বাবা : বেশ তো। সে তো ভালো কথা। তুই এখন বড় হয়েছিস, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছিস। তা বাবা, তোমার বাবাকে তাহলে একবার –

জন : না, মানে – আমার বাবা –

বাবা : ও, sorry – আমি সত্যিই ভুল করেছি। এটা তাহলে তোমাকে বলাই উচিত হয় নি। তিনি যে বেঁচে নেই!

জোয়ান : আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম বাবা।

বাবা : আমার একেবারে মনে ছিল না। সে যাক গে' – তাতে কিছু যায় আসে না। তোমরা ঘর বাঁধতে চাও, এটাই হল আসল কথা। তা তোমার বাবা কি করতেন?

জন : তাঁর সম্পর্কে কিছুই আমার মনে নেই।

www.pathagar.com

বাবা : ও, তিনি মারা যাওয়ার সময় বুঝি খুবই ছোট ছিলে? তা তোমার বাবার নামটা —

জন : তা–ও আমি জানি না।

বাবা : মানে?

জন : আমার বাবার নাম আমি —

বাবা : (গম্ভীর কণ্ঠে) হোয়াট। কি বললে?

জোয়ান : জন! তুমি তোমার বাবার নামও জান না? এ তুমি কি বলছো! কই, কোনদিন তো সে কথা আমাকে বলো নি!

জন : বলতে তুমি আমাকে দাও নি জোয়ান। যখনই সে ইতিহাস বলতে গেছি, তুমি শুনতে চাও নি।

জোয়ান : আমি ভেবেছিলাম মৃত বাবার কথা উঠলে তুমি দুঃখ পাবে। কিন্তু — ছি ছি ছি —

জন : জোয়ান!

(জোয়ানের বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়)

জোয়ান : তুমি আমাকে এভাবে আঘাত দিলে জন? আমার সমস্ত স্বপ্ন তুমি অমন করে ভেঙে দিলে?

জন : জোয়ান!

জোয়ান : তুমি চলে যাও জন, তুমি চলে যাও। আমার ধারণা ছিল, কয়লার খনি থেকে মাঝে মাঝে হীরক খণ্ডও বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম।

(বলেই দ্রুত পায় বেরিয়ে যায় জোয়ান। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে জন। তার কানে বাজতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ — বাজতে থাকে জোয়ানের বলাঃ ছি ছি ছি —)

(আলম খানের ঘর। জানালার পাশে বসে আছে আলমখান ও হাশেম)

হাশেম : তোমার গায়ে ছি ছি–চাবুকের দাগ তাহলে আগে থেকেই লেগে ছিল?

আলম খান : সে–দাগ মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। জন থেকে সেজেছিলাম জানে আলম খান। ফলাফল–– একই।

হাশেম : এতটুকু কিন্তু আমি জানতাম না।

www.pathagar.com

আলম খান : জানি না, কেন যে তোমাকে সবটুকু বলতে পারি নি আগে। খানিকটা মিথ্যার আশ্রয় নিলে হয়তো ওই চাবুকের দাগ গায়ে লাগতই না। কিন্তু তার আশ্রয় নিলাম না। সাজানো পিতার একটা নামের আবরণ গায়ে জড়ালাম না। হয়তো দুর্বল মনের আশা ছিল, অজানা অতীতটুকু অব্যক্ত রাখলেও চলবে। — চলল না।

(দু'জনই কিছুক্ষণ নীরব)

হাশেম : কথা খুঁজে পাচ্ছি না যে বলব।

আলম খান : কথা আর নেই যে! বাইরের আকাশটাও দেখ– নিঝুম, নীরব।

হাশেম : এই আকাশের রূপও বদলাবে। দিনের শেষে আসে রাত, নামে অন্ধকার। তখন এই আকাশেই এখানে ওখানে ফুটে ওঠে অসংখ্য তারা। আবার ফুটে ওঠে ভোরের আলো। সময় বয়ে চলে।

(দিনের বেলায় জীবনমুখর রাস্তা। লোকজনের চলাচল। রাস্তায় বেরোয় আলম খান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রান্তে এসে দাঁড়ায় সে। মনের কথা শুনতে পায় যেন আলম খান—)

আলমের কণ্ঠ : (নেপথ্যে) নাই বা জানলাম আমার বাবার নাম। বাবা তো আমার ছিলেন একজন। জন্ম দিয়েছিলেন এক দুঃখিনী মা। আর এক মা একদিন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অন্য সবার মতই এ দুনিয়ার মাটিতে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন — তাহলে?

(আলম খানের দৃষ্টি আকাশের দিকে। তার চোখে ভাসে একের পর এক ছবি — মন্দিরের চূড়া, গির্জার চূড়া, মসজিদের চূড়া)

www.pathagar.com

বকুলগন্ধ ভোর

চরিত্র-লিপি

নঈম খান

(আশরাফ)

ফিরোজা বেগম

কবিয়াল হায়াত মুন্সি

যাবেদ চাচা

দীপু

দুঃখীর মা

হাসান

হাফিজ

বুড়া-বুড়ী

www.pathagar.com

(খবরের কাগজের অফিস। এক কোঠায় বসে বই পড়ছে রিপোর্টার হাফিজ। ঢোকে হাসান)

হাফিজ : অফিসে তাহলে শেষ পর্যন্ত এলেন হাসান সাহেব?

হাসান : রিপোর্টারের চাকরী করছি, না এসে উপায় কি? কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে— বেশ আরাম-আয়েষেই সময় কাটাচ্ছ? হাতে বই, আজ কোন এসাইন্‌মেন্ট্‌ নেই?

হাফিজ : থাকবে না কেন! কিন্তু হাসান সাহেব যে আরাম-আয়েষ বাদ দিয়ে ঢাকা নগরী চষে বেড়াচ্ছেন, তা তো মনে হচ্ছে না।

হাসান : চষে যখন বেড়াতে হয়, বেড়াই। লেখা-টেখা বাদ দিয়ে তোমার মত বসে বসে বই পড়ি না।

হাফিজ : তুমি আমার হাতে বই দেখছ ঠিকই, কিন্তু মনে মনে লেখা নিয়েই পরিকল্পনা করছি কি না, তা তো আর দেখতে পাচ্ছ না!

হাসান : সাব্বাস! নিশ্চয়ই লেখার হুকুম হয়েছে!

হাফিজ : এডিট্যর সাহেব বললেন- অনেকদিন ফিচার-টিচার লিখছি না। কিছু কিছু ফাঁকি দিচ্ছি বলেই তাঁর ধারণা হয়েছে হয়তো।

হাসান : ঠিকই ধরেছেন তাহলে?

হাফিজ : শোন ভাই হাসান সাহেব, আজকের দিনের এই ফাঁকির দুনিয়ায় তুমি-আমি-তিনি সবাই যে একটু-আধটু ফাঁকি দিচ্ছি- আমার মত তুমিও তা জান। এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করে কোন লাভ নেই। যাক, এবার একটা সিগ্রেট ঝাড় তো ওস্তাদ। ধোঁয়া বিনে মাথাটা ঠিক খুলছে না যেন!

হাসান : ওটা তো গাঁজার ধোঁয়া ছাড়া খুলবে না ইয়ার!

হাফিজ : যে কোন ভাবেই খুলুক- ভেবে দেখলামঃ ফিচারই লিখি আর গল্প-কবিতাই লিখি, ওই নঈম খানের কাছে সব কিছুই নস্যি।

হাসান : তাই তো নঈম খান আমাদের চীফ রিপোর্টার!

হাফিজ : তাঁর লেখা 'মানুষ মাটির ইতিকথা' বইটাই পড়ছিলাম। এক কথায়- চমৎকার! পড়ছি আর অবাক হচ্ছি। মনে হচ্ছে- তাঁর সঙ্গে একই পত্রিকা অফিসে কাজ করে ধন্য আমরা!

হাসান : ধন্য হব না? নঈম খান তো আর যে সে লোক নয়! দেশ-দেশান্তর সফর করেছেন। দেখেছেন স্বদেশসহ আরও কত

www.pathagar.com

দেশের মাটি আর মানুষকে। আর দেখেছেনও হৃদয় দিয়ে। তাই তো লিখতে পেরেছেন এমন বই।

হাফিজ : মনটা আমারও ঘুরে বেড়ায় দেশ–বিদেশের আনাচে–কানাচে। কিন্তু বেরুবার কোন সুযোগই পাচ্ছি না। অথচ নঈম খানের বইটা পড়ে দেখলাম– তিনি যা লিখেছেন, সেসব কথা আমিও ভেবেছিলাম।

হাসান : ভেবেইছিলে যদি, তার কিছু কিছু অন্তত কালির আঁখরে পাঠকদের উপহার দাও নি কেন?

হাফিজ : কিন্তু সেই ভাবনাটাকে চোখে দেখে পরখ করে লিখতে হবে তো! তার জন্য বাইরে যেতে হবে।

হাসান : তোমাকে তো দুলামিয়া সাজিয়ে কেউ আর বিদেশ সফরে পাঠাবে না! ইচ্ছা থাকলে নিজের দেশটাকে অন্তত ঘুরে ফিরে দেখতে পারতে! কিন্তু টাকার প্রলোভন ছাড়া তো এক পা' বাইরে রাখবে না। যে গাঁয়ে জন্মেছ সেখানেই বা কতবার গেছ?

হাফিজ : আমার যে কত সমস্যা তার কিছু তো তুমি নিশ্চয়ই জান। এত সমস্যায় থেকে ঢাকার বাইরে পা রাখি কখন? সমস্যাবিহীন একলা মানুষ ওই নঈম খানের অবস্থায় তো নেই আমি!

হাসান : নঈম খানের কোন সমস্যা নেই, ছিলও না কোন দিন– তাই বা তুমি জানলে কি করে? একই পত্রিকা অফিসে কাজ করি বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ বলতে যা বোঝায় তা তো আর নেই।

হাফিজ : কথাটা ঠিকই বলেছ। কেউ না জানলেও হয়তো এমন সমস্যা আছে তাঁর জীবনে যার জন্য আজও তিনি একলা মানুষ– বলা যায় ছন্নছাড়া। অবিশ্যি তাঁর বই পড়ে যে কেউ মনে করবে– 'মানুষ মাটির ইতিকথা'র লেখক আসলে একজন কবি।

হাসান : আর তাঁকে দেখে কি মনে করবে?

হাফিজ : নেশাগ্রস্ত অলস এক আজেবাজে লোক। (নিম্ন কণ্ঠে) ওই যে বলতে বলতে এসে গেছেন নঈম ভাই।

(নঈম খান আসে)

www.pathagar.com

হাসান : আসুন, আপনার বই নিয়েই আলোচনা করছিলাম। কি ব্যাপার, শরীরটা ভাল নেই নাকি নঈম ভাই?

নঈম : নাহ্, ভালই তো।

হাফিজ : কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে – শরীরটা আজ কিছু —

নঈম : বড় আপন ভাব কি না, তাই এমনটি মনে হচ্ছে। তবে খাটুনী কিছুটা বেড়ে গেছে বলে শরীরে তার ছাপ পড়েছে হয়তো।

হাফিজ : খাটুনী বেড়ে গেছে– কেন?

নঈম : ফিচার এডিট্যর বললেন– আসছে স্পেশ্যাল ইস্যুতে আমার একটা গল্প চাই। তাও প্রেমের গল্প।

হাসান : আপনি হলেন চিন্তাশীল এক পন্ডিত জাতীয় লেখক। আপনার কাছে হঠাৎ প্রেমের গল্পের আবদার?

হাফিজ : কেন, নঈম ভাইর কাছ থেকে প্রেমের গল্প আশা করা যায় না? প্রেমের তো কত রূপই থাকে। ফিচার এডিট্যর হয় তো নঈম ভাইর কাছ থেকে এমন এক প্রেমের কাহিনী আশা করছেন, যা হবে চিরাচরিত প্রেমের গল্প থেকে আলাদা।

(নঈম খান আলতোভাবে ম্লান হাসে)

হাসান : নঈম ভাই কি ওই গল্প লেখা নিয়েই ব্যস্ত এখন?

নঈম : হ্যাঁ, তারই একটা স্কেচ্ করে নিলাম আগে। আজ থেকেই লিখতে বসব।

হাফিজ : প্রেমের গল্প নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন – তাতে তো চেহারায় একটা রোশনাই ফুটে ওঠার কথা! অথচ তার বদলে চেহারায় পড়েছে একটা কষ্টের ছাপ।

হাসান : হাফিজ, তুমি ভুল করছ। আসলে একলা জীবনে মেসে থেকে নঈম ভাইর খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হচ্ছে। তার উপরে নতুন খাটুনী।

হাফিজ : আচ্ছা নঈম ভাই, আলাদা একটা বাসা নিলেই তো পারেন! এত বয়সে মেসে থাকার কষ্ট — মানে মানুষের জীবনে কিছুটা রঙ্গরসের কথাও আছে তো!

নঈম : হাফিজ কিন্তু সাহিত্যচর্চায় হাত দিলে ভাল করতে। লক্ষ্য করছি– তোমার ভাবনা–কল্পনা কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। খুবই গতিশীল।

(হাসান হেসে ওঠে)

www.pathagar.com

হাসান : যা বলেছেন নঈম ভাই!

নঈম : আলাদা বাসা নেওয়া আমার জন্য একটা ঝামেলা ছাড়া আর কিছু নয়। তার চাইতে বেশ তো কেটে যাচ্ছে আমার সময়। আর জান তো, রঙ্গরস মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় হলেও সব সময় জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে না।

হাসান : তা অবিশ্যি। আপনার হাতে কি ওই গল্পেরই মেনাস্ক্রিপ্ট্?

নঈম : হ্যাঁ, একটা প্রাথমিক 'স্কেচ্ মাত্র। অফিস থেকে ফিরে লিখতে বসব। গল্পটা দিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

হাফিজ : স্কেচ্টা একটু পড়তে পারি নঈম ভাই?

নঈম : পড়তে চাও, পড়। আমি এর মধ্যে নিউজ এডিট্যরের রুম থেকে আসি।

(নঈম চলে যায়)

হাসান : হাফিজ, এস এক সঙ্গে পড়ি।

হাফিজ : তার আগে একটা বিশেষ খবর তোমাকে দিচ্ছি।

হাসান : বিশেষ খবর?

হাফিজ : এক মহিলা এতিমখানায় দান করেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।

হাসান : ও, এই কথা? পঞ্চাশ হাজার টাকায় আজকাল আবার বিশেষ খবর হয়?

হাফিজ : হয় কি না জানি না, তবে আমাদের পত্রিকায় হতে যাচ্ছে। ডাবল কলাম, তাও আবার বক্স করে।

হাসান : কি জানি, দেখি নি তো!

হাফিজ : ইচ্ছা করলে দেখে আসতে পার। নিউজ এডিট্যর থার্ড পেজের মেকআপ করছেন।

হাসান : থার্ড পেজে বক্স করে ডাবল কলাম! এ যে দেখছি স্পেশ্যাল ব্যাপার! মহিলাটি কে? কোন বড়লোকের সহধর্মিণী?

হাফিজ : না, ষ্টাফের কথাবার্তা শুনে মনে হল না।

হাসান : কোন ফিল্ম এ্যাক্ট্রেস্?

হাফিজ : না ভাই হাসান ইউসুফ, তা–ও নয়।

হাসান : তাহলে?

হাফিজ : কোন এক ফিরোজা বেগম। স্রেফ একজন মহিলার নাম। ছবিও ছাপা হচ্ছে না।

হাসান : রিপোর্ট কে করেছে?

www.pathagar.com

হাফিজ : কেউ করে নি। এতিম খানা থেকে পাঠানো হয়েছে।

হাসান : অজ্ঞাতনামা এক মহিলা এত টাকা দান করে বসল। অবিশ্যি আজকাল অনেকের হাতেই অনেক টাকা।

হাফিজ : এবং তা-ই হতে পারে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা পত্রিকায় প্রকাশ করার খায়েশ, অথবা হতাশ জীবনে কিছুটা রোমাঞ্চ জাগানোর জন্যেই মহিলাটির এই প্রচেষ্টা।

হাসান : এর উপর আর কোন রিপোর্ট হবে না?

হাফিজ : খবরের ডেস্ক্‌তো এই নিয়ে আলোচনামুখর। মহিলা নাকি কোন এক কেমিক্যাল কোম্পানীতে ছোটখাটো কাজ করেন। যাক, আলোচনা যখন হচ্ছে, ফলাফল কিছুক্ষণের মধ্যে জানা যাবে। এবার নঈম খানের প্রেম-কাহিনীর স্কেচ্‌টা পড়া যাক।

হাসান : আমাকেও দেখতে দাও। এটা সত্যিই একটা স্কেচ্‌মাত্র। কিছু নোট টুকে রেখেছেন। প্রথমেই গল্পের নায়কের পরিচয়।

হাফিজ : নায়কের নাম আশরাফ। লিখেছেন-"আশরাফ ছিল এক এতিম তরুণ, বাপ-মাকে হারিয়ে আশ্রয় পেয়েছিল কবিয়াল হায়াত মুন্সির কাছে। কবিয়ালের কোন ছেলে ছিল না- একটি মাত্র মেয়ে, আশরাফের চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট। কবিয়াল হায়াত মুন্সি আশরাফকে গ্রহণ করেছিলেন নিজের ছেলের মতই। সারা এলাকায় কবিয়ালের খুব সুনাম। আর তাঁর কাছে থেকেই তরুণ আশরাফও হয়ে উঠেছিল এক কবিয়াল — খুদে কবিয়াল।" আরে, কবিয়ালের মেয়ের নামও যে ফিরোজা! দানশীলা ওই মহিলার নামে নাম।

হাসান : তাতে কি? বাকীটা পড়।

হাফিজ : "আশরাফ আর ফিরোজা এক সাথে স্কুলে পড়ে, খেলে বেড়িয়ে বড় হয়েছে। তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে- কি বলা যায় তাকে? ভালবাসা? হ্যাঁ, ভালবাসাই বলতে হবে। আশরাফ ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতা লিখত, গান লিখত, গাইতেও পারত। কবিয়ালের মেয়েও পারত গান লিখতে। সেদিন বকুল গাছের নীচে বসে বকুলের মালা গাঁথছিল ফিরোজা। আশেপাশে কেউ ছিল না। এমন সময় সেখানে এল আশরাফ। সুরে সুরে গান ধরল —

চারিদিক ফুল-গন্ধে হইল উতলা।
কার লাগি গাঁথ কন্যা বকুলের মালা?

www.pathagar.com

সুরে সুরেই উত্তর দিল ফিরোজা —

কবিয়ালের শিষ্য তুমি তরুণ কবিয়াল।
তাই কি ফুলের গন্ধে হইয়াছ বাচাল?

তখন আশরাফ বলে —

বকুলের এই সুবাসে মানুষ কিছুটা বাচাল না হয়ে পারে? মালা গাঁথতে তোমার তো আরও ফুল চাই। বকুলের ডালে আমি নাড়া দিই, আরও ফুল তুমি কুড়িয়ে নাও।

— নাড়া দিতে চাও, দাও না!

— দিচ্ছি। ছন্দ মিলিয়ে মানুষ যদি কবিয়াল হয়, তাহলে তুমিও তো কবিয়াল ফিরোজা।

ফিরোজা বলে —

কিছুটা কবিয়াল হলেও আশরাফ সাহেবের মত বেসামাল নই।

— বেসামাল হও কি করে? হাজার হলেও মেয়ে মানুষ তো। বাপজীর জান-প্রাণ! জান ফিরোজা, বকুলের ডাল আমি নাড়িয়ে দিচ্ছি, তুমি ফুল কুড়াচ্ছ- তাতে মনে পড়ছে বাপজীর গাওয়া সেই কবি চন্দ্রাবতীর পালা। জান তো, তরুণী চন্দ্রাবতীকে ভালবাসত যে তরুণ, নাম তার জয়ানন্দ।

— জানি!

আশরাফ বলে যায় —

চন্দ্রাবতীও সেদিন ফুল তুলছিল। আর ফুলের ডাল নুইয়ে ধরেছিল জয়ানন্দ।

(সুরে সুরে) ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী।।

এবার কণ্ঠে পরিহাস এনে ফিরোজা শুধায়—

তারপর? আর কোন্ কোন্ গীতি-পালার আশ্রয় নিয়ে নিজের বক্তব্যটা প্রকাশ করবেন তরুণ কবিয়াল?

আশরাফ তখন সুরে সুরে গায়—

চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠোঁট তেলাকুচ ফল।।

www.pathagar.com

জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি।
ভোমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি।।

তখন কণ্ঠে মমতা এনে ফিরোজা বলে—

চন্দ্রাবতী আর জয়ানন্দের এ ভালবাসার পরিণাম কি হয়েছিল, তা নিয়ে বাপজীর মুখে পালাকার নয়ান চান্দের শেষ পদ দুটিও আমার মনে আছে।

(সুরে সুরে) স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ান চান্দে গায়।
নিজের অন্তরের দুঃখ পরকে বুঝান দায়।।

পরের বানানো পদে আরও বলতে পারি —

(সুরে সুরে) পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কই বা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও।।

তখন আশরাফ বলে ওঠে—

না ফিরোজা, না। আমাদের ভাগ্যাকাশে দেওয়া গর্জালেও সুন্দর কন্যাকে স্ত্রী করে আমার মনপবনের নাও ঠিকই বয়ে যাবে। বাপজীর ইচ্ছা, বাপজীর স্বপ্ন আমি জানি। সেই স্বপ্নে তুমি আর আমি পাশাপাশি ফিরোজা।

তারপর দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'জনের চোখেই গভীর মুগ্ধ দৃষ্টি।

(কবিয়ালের ঘরের বারান্দায় কথা বলে কবিয়াল ও যাবেদ)

যাবেদ : কবিয়াল, আশরাফ আর ফিরোজা এখন বেশ বড় হইয়া উঠছে। আগের মত তাগোর চলাফেরা মানুষের কাছে অন্যরকম মনে হইতে পারে।

হায়াত : হুঁম্, ব্যাপারটা আমিও ভাইব্যা দেখছি। বুঝলে যাবেদ, আমার সংসারে তো আর কেউ নাই। তুমি আমার অনেকদিনের শিষ্য — বলা চলে, আমার ভক্ত। আমার মুখে তুমি আগেও শুনছ যে আশরাফরে আমি আল্লা'র দান বইলাই মনে করি। ওরে আমি জামাই কইরাই ঘরে রাখুম।

যাবেদ : মনে মনে যখন ঠিক কইরাই রাখছেন কবিয়াল, এখন আর দেরী না কইরা শাদীর কামটা শেষ কইরাই ফেলেন। মিছামিছি কবিয়াল হায়াত মুন্সির সুনামে অন্য কোন কথার তাগ লাগুক, এইটা আমি চাই না।

www.pathagar.com

হায়াত : আর দেরী করুম না। তুমি শাদীর আয়োজন কর যাবেদ —"

হাফিজ : এর পরে আর নাই রে হাসান!

হাসান : এ তো পুরনো ধরনের গল্প! আজকের দিনে এই গল্প —

হাফিজ : এই যে নঈম ভাই ফিরে আসছেন।

(নঈম আসে)

হাসান : নঈম ভাই, আপনার স্কেচ্ থেকে বাকীটা বোঝা যাচ্ছে না।

নঈম : হ্যাঁ, এটা তো গল্পারম্ভের একটা স্কেচ্ মাত্র। পুরোটা লিখে তোমাদের দেখাব।

হাফিজ : যাক, আজকের বিশেষ খবরটার কিছু আন্দাজ করতে পারলেন?

নঈম : কি আন্দাজ করব?

হাফিজ : যে মহিলা এতিমখানায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন, তার সম্পর্কে?

নঈম : আন্দাজ করার কি আছে? কাল ভোরেই ইন্টারভিউ নিতে যাব। তখনই সব কিছু জানা যাবে!

হাফিজ : ইন্টারভিউ নিতে যাবেন আপনি?

নঈম : হ্যাঁ, অফিস থেকে এই এসাইনমেন্টই দেওয়া হয়েছে আমাকে।

হাসান : যাক, ভালই হল। মহিলাটির কোন পরিচয় জানা নেই, অথচ এত টাকা দান করলেন— ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়তো! তাই আপনার মত একজন অভিজ্ঞ —

নঈম : জানা গেছে — প্রায় দশ বছর আগে নগরীর উপকণ্ঠে অল্পদামে কিছু জমি রেখেছিলেন। এলাকাটা এ্যাকোয়ার্ড হয়ে গেছে, উনিও তাই অনেক টাকা পেয়ে গেছেন। আজকের জমির দাম যে কত বেশী জানোই তো!

হাফিজ : তবু আমি বলব- আপনার মত একজন নামজাদা লোককে ইন্টারভিউ নিতে না পাঠিয়ে আমাদের কাউকে পাঠালে হত না?

নঈম : তাও হতে পারত। তোমাদের যে কাউকে —

হাসান : আপনি নিশ্চয়ই হাফিজকে মিন্ করছেন না নঈম ভাই!

নঈম : না না, তা মিন্ করব না কেন? তুমি হাফিজকে মিছিমিছি ক্ষেপাচ্ছ হাসান।

www.pathagar.com

হাফিজ : হাফিজ অত সহজে ক্ষেপে না নঈম ভাই। কেন না সে জানে —

নঈম : কি জানে হাফিজ?

হাফিজ : ঐ যে কিসে যেন কি বলে আর কিসে যেন কি খায়!

নঈম : আচ্ছা, আজকের মত আসি। কাল আবার দেখা হবে।

(চলে যায় নঈম খান)

হাফিজ : নাও, এসাইনমেন্ট নিয়ে তো বেরিয়ে গেলেন নঈম ভাই। এবার তুমি ফুটবলের উপর একটা ফিচার লিখে ফেল।

হাসান : মহিলাটির কাছে ছুটে যেতে পারলে না বলে মনে আঘাত পেলে ভাই? হাঃ হাঃ হাঃ —

(ফিরোজা বেগমের বাসার দরজায় কড়া নাড়ানোর শব্দ। রুমে থেকে দুঃখীর মা বলে –)

দুঃখীর মা : আবার কড়া নাড়ায়? হায় রে আল্লা', সকাল থনে খালি দরজায় খটাখট, খটাখট। খুলতেই জিগায় — ফিরোজা বেগম আছেন? একজনের পরে একজন আইতেই আছে। (গিয়ে দরজা খোলে) কে গো? কি চাই?

(এক বুড়া দম্পতি কথা বলে)

বুড়া : ফিরোজা বেগম বাসায় আছেন?

দুঃখীর মা : থাকব না ক্যান? আছেন। তা কি কওয়া লাগব? ডাইকা দিমু?

বুড়ী : হ্যাঁ, একটু ডেকে দাও। বলো — আমরা তাঁর পড়শী।

দুঃখীর মা : ঘরে আইসা বসেন। এই যে আম্মাও আইসা গেছেন।

(ফিরোজা বেগম আসে। চলে যায় দুঃখীর মা)

ফিরোজা : বসুন আপনারা।

বুড়া : আপনার পরমায়ু হোক মা। আমাদের শুধু দেখেই শান্তি। বাহ্, কী সুন্দর মায়ের মমতামাখা চেহারা। হ্যাঁগো, আমি বলেছিলাম না — যেমন চেহারা তেমনি আমার মায়ের মনটি। দেখ দেখ, ভাল করে তাকিয়ে দেখ — আমি ঠিক বলেছি কি না!

বুড়ী : আমি তো সকালে পত্রিকায় খবরটা পড়েই বললাম — এখনই চল মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি গে'।

www.pathagar.com

ফিরোজা : আপনাদের পরিচয় কিন্তু এখনও আমি —

বুড়ী : সে কি কথা মা! আমরা যে আপনার পড়শী।

বুড়া মায়ের খবরটা পত্রিকায় পড়ে কত যে খুশি হয়েছি, তা আর কি বলব।

ফিরোজা : কিন্তু এর আগে সম্ভবত আমাদের দেখা-সাক্ষাতটা হয়ে ওঠে নি, কি বলেন?

বুড়ী : আপনি হয়তো খেয়ালই করেন নি মা। কিন্তু আমরা তো আপনাকে খুবই চিনি।

ফিরোজা : হয়তো তাই। তা কেমন আছেন আপনারা?

বুড়া : এই বুড়া বয়সের থাকা। আছি কোন রকম। তা আমার মায়ের শরীরটা —

ফিরোজা : জ্বি, আল্লা' ভালই রেখেছেন।

বুড়া : এতিমখানায় টাকা তো দেওয়া হল। শুনলাম, বাকী টাকা দিয়ে নাকি কোন একটা কারখানা খুলতে যাচ্ছেন? বড় ভাল কাজ হবে। কত গরীব খেটে খেতে পারবে। তা কিসের কারখানা মা?

বুড়ী : কেমিক্যাল কোম্পানীতে কাজ করেছেন এতদিন, এখন কারখানা খুললে ওই কেমিক্যালের কারখানাই খুলবেন আর কি।

ফিরোজা : জ্বি না, আমি ওসব কিছুর কথা ভাবছি না এখন।

বুড়া : তা তো নিশ্চয়ই। ভাল করে চিন্তা করেই সবকিছু স্থির করতে হবে। আমাদের মা তো আবার একা মানুষ। এমনি অবস্থায় যে কাউকে বিশ্বাস করা মুস্কিল।

বুড়ী : তাছাড়া যা কিছু করবেন, চুপচাপ করাই ভাল। কারণে অকারণে মানুষের কত শত্রু বেরোয়।

ফিরোজা : আমার কথা থেকে আপনারা কি বুঝতে পারছেন না যে সত্যিই আমি ওসব কিছু করতে যাচ্ছি না?

বুড়া : ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। যখনই কিছু করতে যাবেন, আপনাকে সাহায্য করার জন্য বিশ্বাসী লোক এনে দেব আমি। আমার এক শ্যালক, মানে ওঁর ভাই — খুবই উপযুক্ত লোক। বাড়ীতে তো বসেই আছে। আমি চিঠি লিখে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। খুব ত্বরিৎকর্মা লোক মা।

www.pathagar.com

ফিরোজা : জ্বি না, আমার জন্য কাউকে কিছু করতে হবে না। আমি আবার এখ্‌খুনি একটু বাইরে যাব।

বুড়ী : তা তো যাবেই মা। এ অবস্থায় কি নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা যায়?

ফিরোজা : তাই বলছিলাম– আমি বেরিয়ে যাব, আর আপনারা একা একা বসে থাকবেন!

বুড়া : তাহলে আজকের মত আমরাও আসি। কাল না হয় আর একবার আসা যাবে।

ফিরোজা : তার চাইতে বরং একটু অবসর পেয়ে আপনাদের খবর দেব। দুঃখীর মা আপনাদের বাসাটা চিনে আসবে।

বুড়া : বেশ, সেভাবেই আসা যাবে। চল গো, আসি মা।

(চলে যায়। দুঃখীর মা আসে)

দুঃখীর মা : বাবারে বাবাহ্! খালি লোকজন আর লোকজন। আইসা তো কয় তারা আপনের পড়শী, কতদিনের চিনাজানা। কিন্তু কই, অদ্দিন তো ওনাগোর ছায়াও দেখলাম না!

ফিরোজা : থাক দুঃখীর মা, এমন করে বলো না।

দুঃখীর মা : ক্যান্ কমু না? দশ বছর আগে আপনে যখন দুঃখের সায়রে হাবুডুবু খাইতাছিলেন, তখন তো ওনাগো মুখ দেখি নাই। অখন শুনছে— টাকার মালিক হইয়া গেছেন, তাই দরজা ধাক্কানি বাইড়া গেছে। ওনাগো আমি চিনি না?

ফিরোজা : এবার থাম। শোন, আমি একটু বাইরে যাব। দীপুর তো সকালেই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, বাসায় এলে বলবে — আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব। ওর হাতমুখ ধুইয়ে খাইয়ে দিয়ো।

দুঃখীর মা : আপনে যান আম্মা, আমি দরজা বন্ধ কইরা দেই।

(ফিরোজা বাইরে যায়। দরজা বন্ধ করে আপন মনে বলে দুঃখীর মা–)

সুখের দিনে সুহৃদের অভাব নাই। অদ্দিন কই আছিল অতসব সুহৃদ। একজন কম বয়সের মাইয়া মানুষ সব কিছু হারাইয়া আইসা উঠল ঢাকায়। লগে তার মরা বাপের এক বুড়া বন্ধু। উঠল আইসা আমার ভাঙা ঘরে। তারপর বুড়া চালায় রিকশা আর ওই মাইয়া মানুষটা নিল একটা ছোটখাটো চাকরী।

www.pathagar.com

খাওয়াপরার কিছু সুবিধা হইল যখন, তখন ভাড়া নিল একটা টিনের ঘর। আমারেও ছাড়ল না। আমিও হইয়া গেলাম তাগো সংসারের একজন। তখন থাইক্যা হাড়ভাঙা খাটনী, বাসার খরচ, দীপুমণির ইস্কুলের খরচ —

(দরজায় খটখট)

কে?

দীপু : দরজা খোল বুবু। আমি দীপু।

দুঃখীর মা : ও, দীপুমণি আইসা গেছ? খাড়ও, দরজা খুলি।

(দরজা খোলে। স্কুল-ছাত্রী দীপু আসে)

দীপু : আম্মা কোথায় বুবু?

দুঃখীর মা : এইমাত্র বাইরে গেছেন। একটুক্ষণের মধ্যেই আইসা পড়বেন। জামাকাপড় ছাইড়া হাতমুখ ধোও। আমি খাওনের দেই।

দীপু : আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

দুঃখীর মা : ও মা, খাওনের ইচ্ছা করে না— ক্যান্?

দীপু : স্কুলে টিফিন নিয়ে যাই না? তাই খেয়েছি তো।

দুঃখীর মা : লক্ষ্মী বুবু, তোমার আম্মা কইয়া গেছেন খাওয়াইয়া দিতে।

দীপু : আম্মা এলে তাঁর সাথেই খাব।

(দরজায় খটাখট শব্দ হয়)

ওই কে যেন এল। আমি দরজা খুলি।

(দুঃখীর মা চলে যায়, দরজা খোলে দীপু, সামনে নঈম)

দীপু : আপনি কে? কি চান?

নঈম : আমার নাম বললে তো তুমি চিনতে পারবে না। এটা ফিরোজা বেগমের বাসা তো?

দীপু : জ্বি, এটা আমার আম্মার বাসা।

নঈম : আমি তোমার আম্মার সঙ্গে দেখা করতে চাই। গিয়ে বল — আমি পত্রিকা অফিস থেকে এসেছি।

দীপু : যে পত্রিকায় আম্মার টাকা দেওয়ার কথা ছাপা হয়েছে?

(চাপা হাসি)

নঈম : হ্যাঁ। কিন্তু তুমি মুখ বন্ধ করে হাসছে যে?

দীপু : (হাসতে হাসতে) আম্মা তো বাসায়ই নেই।

নঈম : তাই নাকি? কখন ফিরবেন?

দীপু : দুঃখীর মা বু' বলল—একটু পরে। আপনি বসবেন?

www.pathagar.com

নঈম : তা কিছুক্ষণ বসতে পারি। কিন্তু একা বসে বসে — মানে কথা বলার লোক তো চাই!

দীপু : কেন, আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি তো আম্মার মেয়ে! বাহ্, আপনি মুখ বন্ধ করে হাসছেন যে?

নঈম : (হাসতে হাসতে) তুমি শুধু আম্মার মেয়ে? আব্বার মেয়ে নও?

দীপু : (হাসতে হাসতে) আসলে আমি মুখ বন্ধ করে হাসছিলাম বলে তার শোধ নিতে আপনিও তা-ই করলেন। আবার আমার মতই হাসতে হাসতে কথা বললেন।

নঈম : তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।

(দূর থেকে দুঃখীর মা ডেকে বলে-)

দুঃখীর মা : দীপু, জামাকাপড় ছাড়বা না? দেরী করতাছ ক্যান্?

দীপু : জামাকাপড় পরে ছাড়ব। আমি এখন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি।

নঈম : তোমার নাম বুঝি দীপু? আমার আগেই জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

দীপু : উচিত ছিল তো নিলেন না কেন?

নঈম : খুব ভুল হয়ে গেছে। তুমি কোন্ স্কুলে কোন্ ক্লাসে পড় দীপুমণি?

দীপু : অরুণিমা স্কুলে, ক্লাস ফাইভে। জানেন, আমাদের স্কুলের আপারা আমাকে খুব আদর করেন। গতকালই আমাদের স্কুলে ফাংশান হয়ে গেছে। আমি এই বইটা প্রাইজ পেয়েছি। এই যে দেখুন। বইটার নাম 'মানুষ মাটির ইতিকথা' — লিখেছেন নঈম খান।

নঈম : বইটা তোমার খুব ভাল লাগছে বুঝি?

দীপু : হ্যাঁ-এ। লেখা আছে কত কথা! আমি না— পড়ে সব কথা বুঝতেও পারি না। আম্মা বললেন, একটু বড় হলে ঠিক বুঝতে পারব।

নঈম : তোমার আম্মা ঠিকই বলেছেন।

দীপু : আচ্ছা, আপনি তো পত্রিকা অফিসের লোক। পত্রিকার লোকেরা তো বইও লেখেন। আপনি এই বইটার পরে এমন একটা বই লেখেন না কেন যা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তখনই আমি বুঝতে পারব?

www.pathagar.com

(দুঃখীর মা আসে)

দুঃখীর মা : ইস্কুল থনে ফিইরা কিছুই খাইলা না। জামাকাপড় ছাড়তে কইলাম, তাও ছাড়লা না। সমানে কথা কইয়াই চলছ।

নঈম : ও, তুমি তো এখন জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোবে দীপু। আমি বরং যাই। তোমার আম্মুকে বলো আমার কথা। কাল আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসব, কেমন?

দীপু : আম্মুকে আমি বলে রাখব, আপনি আসবেন কিন্তু।

(নঈম খান চলে যায়। দরজা বন্ধ করে দুঃখীর মা)

(পত্রিকা অফিস। কথা বলছে হাসান ও হাফিজ)

হাফিজ : বুঝলে হাসান, আমি একেবারে থ' বনে গেলাম। এই পাবলিসিটির যুগে এত বড় একটা সুযোগ পেয়ে কেউ হেলায় হারাতে পারে?

হাসান : যা শুনলাম — ভদ্রমহিলার আচরণ সত্যি অদ্ভুত।

হাফিজ : অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না! ইন্টারভিউ দিতে কিছুতেই রাজী হল না।

হাসান : কিন্তু নঈম ভাইর এসাইনমেন্টে তুমি আবার নাক গলাতে গেলে কেন? আমার মনে হয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে কি অন্যায় তুমি করেছ।

হাফিজ : নঈম ভাই মহিলাকে না পেয়ে ফিরে এলেন যখন, তখনই তো আমি তক্কে তক্কে থেকে চান্সটা নিলাম। মহিলা তখন বাসায় ফিরে এসেছেন, কিন্তু এত করেও কিছু লাভ হল না।

হাসান : মাঝে থেকে নঈম ভাইর ইন্টারভিউ নেয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়াল। এবার আর অস্বীকার করতে পারবে না যে তোমার স্বভাবে কিছুটা হ্যাংলাপনা আছে।

(নিরুত্তর হাফিজ মুখ ফিরায়)

(ফিরোজা বেগমের বাসা। দরজায় খটাখট শব্দ। দুঃখীর মা এসে দরজা খোলে। আসে নঈম)

নঈম : ফিরোজা বেগম বাসায় আছেন?

দুঃখীর মা : আল্লারে আল্লাহ্! আপনেগো লইয়া আর পারলাম না। ক'ন আপনে কইথনে আইছেন।

www.pathagar.com

নঈম : গিয়ে বল, আমি পত্রিকার প্রতিনিধি।

দুঃখীর মা : কি নিধি?

নঈম : প্রতিনিধি, রিপোর্টার। পত্রিকা অফিস থেকে এসেছি, তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলব।

দুঃখীর মা : তাইলে আপনে যাইতে পারেন। আম্মা পরতিকার লোকের সঙ্গে কথা কইব না।

নঈম : তুমি অন্তত খবরটা দাও তাঁকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলা আমার খুবই দরকার।

দুঃখীর মা : ঠিক আছে, আমার কথা বিশ্বাস অয় না যখন, তখন জাইন্যাই আসি।

(চলে যায়)

নঈম : (আপন মনে) অন্যান্য পত্রিকার রিপোর্টাররা নিশ্চয়ই মহিলাকে বিরক্ত করেছে। কিন্তু যেভাবে হোক, তাঁর সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে। দীপুও নিশ্চয় এখন স্কুলে রয়েছে।

(দুঃখীর মা আসে)

দুঃখীর মা : এই যে নেন, আম্মা যা কওয়ার, কাগজে লেইখা দিছেন।

(স্লিপটা নিয়ে পড়ে)

নঈম : হুঁম্, লিখেছেন– 'মাপ করবেন। দেখা করার কোন দরকার মনে করছি না।'

দুঃখীর মা : হইল তো! এইবার যান, দরজা বন্ধ করি।

(চলে যায় নঈম, দরজা বন্ধ করে দুঃখীর মা)

(পত্রিকা অফিস। কথা বলছে হাসান ও হাফিজ)

হাসান : আমার মনে হয় হাফিজ, মহিলাটির জীবনে কোন রহস্য আছে।

হাফিজ : আর সে-রহস্যের উদ্‌ঘাটন করাতেই তো রিপোর্টারদের কৃতিত্ব!

হাসান : ওই যে নঈম ভাই আসছেন। মুখ অন্ধকার।

(নঈম আসে)

হাফিজ : আসুন নঈম ভাই। কি হল, মহিলাটির ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে গেছে?

www.pathagar.com

নঈম : না, ইন্টারভিউ নেওয়া বেশ ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, অন্যান্য রিপোর্টাররা তাঁকে বিরক্ত করেছেন। মহিলাটির জীবনে নিশ্চয়ই সেন্‌সিটিভ্ কিছু আছে। একটি চাকরাণী আর স্কুলে–যাওয়া মেয়ে নিয়ে বাসায় তিনি একলাই থাকেন। তাঁর স্বামী সম্পর্কে কারও কাছ থেকে কিছু জানা গেল না। যাক, এ নিয়ে তোমাদের ভাববার কিছু নেই। দেখি, কতটুকু কি করতে পারি। এডিট্যর সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

হাফিজ : প্রেমের গল্পটিতে বোধ হয় হাত লাগাতে পারেন নি?

নঈম : না, এখন তো ওই এসাইনমেন্ট্ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আসি।

(চলে যায় নঈম খান)

(ফিরোজা বেগমের বাসা। দীপু বইয়ের ছবি দেখছে। তখনই দরজায় খটাখট শব্দ)

দীপু : কে? আম্মা বাসায় নেই। দরজা দিয়ে আমি একা বাসায়।

নঈম : (বাইরে থেকে) দীপুমণি, দরজা খোল। আমাকে তুমি চেন। সেই যে পরশু দেখা হয়েছিল, পত্রিকা অফিসের সেই লোক আমি।

(দরজা খোলে দীপু। আসে নঈম খান)

দীপু : ও, আপনি! আপনার তো গতকাল আসার কথা ছিল! আসেন নি কেন?

নঈম : এসেছিলাম দীপু, কিন্তু তুমি তখন স্কুলে।

দীপু : আমি যখন স্কুলে থাকি, তখন আসেন কেন?

নঈম : তোমার আম্মার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কালও দেখা হল না।

দীপু : এখনও তো আম্মু বাসায় নেই। গেছেন পাশের বাসায় প্রফেসার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। দুঃখীর মা বু' সঙ্গে গেছে। এক্ষুণি এসে পড়বেন। আপনি বসুন।

নঈম : তোমাকে একা বাসায় রেখে ওরা পাশের বাসায় গেলেন?

দীপু : আমি খুব সাবধান আছি তো! আপনি ছাড়া আর কেউ বললে দরজাই তো খুলতাম না!

www.pathagar.com

নঈম : খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে তুমি। আচ্ছা, একা বাসায় তুমি যে আমাকে বসালে, এর জন্য তোমার আম্মু বকাবকি করবেন না?

দীপু : আম্মু তো আমাকে বকেন না। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু শাসন করেন। আচ্ছা, ক্যামেরাটা সব সময়ই আপনি কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন কেন?

নঈম : আমরা যে পত্রিকার রিপোর্টার। পথ চলতে দরকারী কিছু চোখে পড়লেই ফটো তুলে নিই। এস, তোমার ফটো তুলি।

দীপু : বেশ তো তুলুন।

নঈম : হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়াও। হ্যাঁ ঠিক আছে, ব্যস। ফটোটা প্রিন্ট করে তোমাকে দিয়ে যাব।

দীপু : জানেন, আমার একটা এলবাম আছে। তাতে আমার কত ফটো, আব্বা-আম্মার ফটো, আর নানাজানের ফটো। দাঁড়ান, এলবামটা নিয়ে আসি।

নঈম : বাইরের লোককে তোমাদের পরিবারের ফটো দেখাবে- এটা ঠিক হবে না।

দীপু : আপনি তো আমার চেনাজানা লোক। দাঁড়ান, নিয়ে আসি। এইতো, এখানেই শেলফে রয়েছে এলবামটা। এটা দেখুন, আমি আপনার জন্য প্লেটে করে চানাচুর নিয়ে আসি। জানেন, চানাচুর খেতে খুব মজা।

(চলে যায়)

নঈম : (আপন মনে) এই বয়স পর্যন্ত সবাই বুঝি এমনি সরল থাকে।

(নঈম খান এলবামের ছবি দেখতে আরম্ভ করে)

এ কি!

(কোথায় যেন মিউজিক ক্র্যাশ হয়)

এ যে আমার শ্বশুর কবিয়াল হায়াত মুন্সির ছবি!! আর এটা — আমার আর ফিরোজার বিয়ের পর তোলা ছবি!! তাহলে এই ফিরোজা বেগম আমার সেই — আর দীপু, দীপুমণি আমার মেয়ে!!

(দুঃখীর মা আসে)

দুঃখীর মা : আপনে! এই খালি বাসায় ঢুইক্যা একলা বইসা আছেন? বাসায় আমরা কেউ নাই — কেমন মানুষ আপনে?

www.pathagar.com

নঈম : আমাকে চিনতে পেরে দীপু দরজা খুলে দিয়েছে। দীপুর কোন দোষ নেই। আমি তাকে দরজা খুলতে বলেছি।

দুঃখীর মা : কাজটা ভাল করেন নাই। এই যে আম্মাও আইসা গেছেন।

(দুঃখীর মা ভেতরে যায়, ফিরোজা বেগম আসে)

ফিরোজা : (আসতে আসতে) কি হল দুঃখীর মা? – কে? — তুমি!!

নঈম : হ্যাঁ, আমি। দরজা দিয়েই বসেছিল দীপু। আমার সঙ্গে দীপুর পরিচয় হয়েছে গত পরশু, এখানেই। আজ আমার অনুরোধেই দরজা খুলে দীপু আমাকে ঘরে বসতে বলেছে। অপরাধ যদি হয়ে থাকে, তার ভাগী দীপু নয়- আমি। — এক যুগ পর আবার আমাদের দেখা হল। তোমার মত আমিও তা প্রত্যাশা করি নি। বলতে হবে- নেহায়েতই দৈবক্রমে। — তুমি কিছুই বলছ না ফিরোজা?

ফিরোজা : বলার তো কিছু নেই আমার। বলার যা ছিল, তা তো শেষ হয়ে গেছে সেই এক যুগ আগেই।

নঈম : এতিমখানায় তোমার দানের কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই ছাপা হয়েছে যে পত্রিকায় আমি তারই চীফ রিপোর্টার। গত দুইদিন ধরে তোমার ইন্টারভিউ নিতে আমি এখানে আসছি। তোমার দেখা পাই নি। আজও সে-উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম।

ফিরোজা : কোন রিপোর্টারকেই ইন্টারভিউ আমি দেই না।

নঈম : আমাকে কি চলে যেতেই বলছ?

ফিরোজা : পত্রিকার রিপোর্টাররা তো বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে খুবই শার্প হয় জানি।

নঈম : দীপু আমার জন্য চানাচুর আনতে গেছিল। দুঃখীর মা হয়তো এর মধ্যে মানা করেই দিয়েছে। যাক, আসি।

(চলে যায় নঈম খান। ফিরোজা দু'হাতে মাথা চেপে ধরে)

(রাস্তার স্বাভাবিক লোক চলাচল। তার মধ্যে হনহন করে হেঁটে চলেছে নঈম খান)

(ফিরোজা বেগমের বাসা। কোথাও যাবার জন্য গোছগাছ করা বিছানাপত্র)

www.pathagar.com

ফিরোজা : দুঃখীর মা, যা যা নিতে বলেছি- ঠিকমত গুছিয়ে ফেল। দেখো, দরকারী জিনিষ কোনটাই যেন না থেকে যায়।

দুঃখীর মা : আচ্ছা আম্মা, গাঁয়ে গিয়া আমরা কয়দিন থাকুম?

ফিরোজা : আগে তো যাই। তারপর দেখা যাবে। দীপু বইপত্র সব সাজিয়ে নিয়েছে?

দুঃখীর মা : গাড়ীর তো অখনও বহুত দেরী আছে আম্মা। কিন্তু কথা নাই, বার্তা নাই- হঠাৎ কইরাই গাঁয়ের বাড়ীতে যাইতাছেন ক্যান্? সেইখানে তো কেউ নাই শুনছি।

ফিরোজা : কেউ না থাকলেও বাড়ীর ভিটাটা তো আছে! আর আছে আমার আব্বুর কবর! (দীপু আসে) এই যে দীপু, তোমার জামাকাপড় সব নিয়েছ তো?

দীপু : নিয়েছি। আম্মু! আমি একবার পাশের বাসায় ডলি-পলিদের বলে আসব?

ফিরোজা : যাও, বেশী দেরী করো না কিন্তু! দুঃখীর মা, তুমি প্রফেস্যর সাহেবের বিবিকে আমার এই চিঠিটা দিয়ে এস। সেখানে আবার দেরী করো না যেন।

দুঃখীর মা : এক জায়গায় যামুই যখন, তখন দেরী করুম না।

(ভেতরে যায় ফিরোজা। তখনই নঈম খান আসে)

নঈম : দরজা খোলা দেখছি দুঃখীর মা? উনি আছেন?

দুঃখীর মা : আপনে আবার? দরজা যখন খোলা, দেখা করার চেষ্টা করেন।

(চলে যায়)

ফিরোজা : (আসতে আসতে) তুমি? তুমি আবার কেন?

নঈম : তাহলে কি ঘরে ঢুকেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল ফিরোজা?

ফিরোজা : আসাই উচিত হয় নি।

নঈম : এসে যখন পড়েছিই, একটু বসেই যাই।

ফিরোজা : কেন এসেছ?

নঈম : আমার বর্তমান পেশাগত পরিচয়টা তোমার অজানা নয় ফিরোজা।

ফিরোজা : আমার ইন্টারভিউ চাই তোমার?

নঈম : বাসার জিনিষপত্র গোছগাছ করা — কোথাও যাচ্ছ নাকি?

ফিরোজা : এ প্রশ্নটা বোধ হয় তোমার বর্তমান পেশার আওতায় পড়ে না।

www.pathagar.com

নঈম : এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই আমার প্রশ্ন– কোথায় যাচ্ছ?

ফিরোজা : আমার পিতৃপুরুষের ভিটায়।

নঈম : হঠাৎ করেই সেই বিরান ভিটায়? কারও ভয়ে নাকি?

ফিরোজা : কাউকে ভয় করার মত কিছু আমি করি নি।

নঈম : আরও একটু আপনজনের মত কথা বল ফিরোজা। রক্তমাংসের মানুষ বলেই আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

ফিরোজা : তা আর থাকবে না? গুণী লোক। কবিয়াল হায়াত মুন্সি আদর করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

নঈম : অনেকদিন চোখের আড়ালে থাকলেও দুই বছর– হ্যাঁ, দুই বছরই হবে– আমরা একসঙ্গে ঘর করেছিলাম। তখন দু'জনেরই ছিল একই স্বপ্ন। তার কোন স্মৃতিই কি তোমার মনে আর জেগে নেই ফিরোজা?

ফিরোজা : থাকলেও সব ছাপিয়ে জেগে আছে আমার আব্বু সেই কবিয়াল হায়াত মুন্সির শেষ মুখচ্ছবি। কত স্নেহ, কি বিশ্বাসই তিনি করতেন তোমাকে! আর তাঁর মুখচ্ছবিতে দেখেছি সব কিছু হারানোর মর্মান্তিক বিষাদ!

নঈম : (অস্থির কণ্ঠে) জানি, জানি ফিরোজা– সেই বিষাদের কালিমা তাঁর মুখে মেখে দিয়েছিলাম আমিই। কিন্তু তা মুহূর্তের ভুলে। যখন বুঝতে পারলাম আমার সর্বনাশা ভুলের স্বরূপ, তখনই জ্ঞানহারা উন্মাদের মত করে বসলাম আরেকটি গর্হিত অন্যায়। কলঙ্কিত এই মুখ রাতের অন্ধকারে ঢেকে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে হলাম দেশান্তরী।

ফিরোজা : মুহূর্তের জন্যও ভাবলে না, কাকে তুমি আঘাত দিতে যাচ্ছ, কোন্ মানুষটিকে, কেমন মানুষটিকে? যে মানুষটির জীবনে আদর্শ ছিল তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন!

(কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ফিরোজার। তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একের পর এক সেতারের তন্ত্রীতে পড়ে কঠিন আঘাত। ভেসে ওঠে অতীতের ছবি। হায়াত মুন্সির ঘরের বারান্দা। সেখানে কথা বলছে হায়াত মুন্সি ও যাবেদ)

হায়াত : আমি কবিয়াল হায়াত মুন্সি, যাবেদ। অত্যাচারী ওই হাশেম চেয়ারম্যান আমাকে যত প্রলোভনই দেখাক, কথার প্যাঁচে যত ভয়, যত খুন–খারাবীর ইঙ্গিতই দিক, এই ইলেকশানে

www.pathagar.com

তার পক্ষে গান বাইন্ধ্যা কোন আসরেই তা গাইব না আমি। কিছুতেই না। তার অত্যাচারের কাহিনী গাঁয়ের মানুষগুলা ভুইল্যা গেছে মনে কর? আর যদি ভুইল্যাই গিয়া থাকে, নতুন ইলেকশানে তার মিথ্যা ছলনায় সাধারণ মানুষগুলা যাতে আবার ভুলের পথে পাও না বাড়ায়, তার লাইগ্যা আমি নানান আসরে গান গাইয়া চেষ্টা করব সেইসব অত্যাচারের ছবি তুইল্যা ধরতে। ভুল যাতে না করে তারা, তার লাইগ্যা আমার কবিয়ালী ক্ষমতা আমি উজাড় কইরাই দিমু। তাতে যদি ধ্বংস হইয়া যাই, তবুও।

যাবেদ ঃ কিন্তু কবিয়াল, আপনের জামাই আশরাফ খানের কোন খবর রাখেন? গত দুইদিন দুই রাইত সে যে ঘরে আসে নাই, তা জানেন?

হায়াত ঃ কথাটা তো আমি খেয়াল করি নাই! আশরাফ কই এখন?

যাবেদ ঃ হাশেম চেয়ারম্যানের আস্তানায়।

হায়াত ঃ হাশেম চেয়ারম্যানের আস্তানায় আমার আশরাফ! কও কি যাবেদ?

যাবেদ ঃ হাশেমের প্রলোভনে পইড়া সে পথ হারাইছে। নেশা–টেশার অভ্যাসও হইছে কি না, কে জানে! খবরটা শুইন্যাই আমি গোপনে আপনেরে কইতে আইলাম, যাতে ফিরোজা এই খবরটা না পায়। চেয়ারম্যানের পক্ষে গান বাইন্ধ্যা সেই গানে সুর দিয়া পরম আনন্দে দুয়ারকি গো তা শিখাইতাছে আশরাফ মিয়া!

হায়াত ঃ (উত্তেজিত কণ্ঠে) যাবেদ, এ কি খবর তুমি শোনাইলা আমারে! আর ফিরোজা — বুদ্ধিমতী মাইয়া আমার, এই কথা সে শুনব না মনে কর? তার মনও কি এতে ভাইঙা খান–খান হইয়া যাইব না যাবেদ?

যাবেদ ঃ এই খবর চাপা দেওয়ার কোন পথ তো আমার জানা নাই কবিয়াল!

হায়াত ঃ যাবেদ, আশরাফ আছিল আমার শেষ জীবনের আশা, আমার গৌরব। কিন্তু সব যে আমার শেষ হইয়া গেল যাবেদ! যাবেদ, পার না তারে কোনরকমে এই খপ্পর থনে বাঁচাইতে? পার না

www.pathagar.com

আমার জীবনের শেষ আশা আর গৌরবটারে কোন রকমে রক্ষা করতে?

যাবেদ : তার কোন পথ আর খোলা নাই কবিয়াল! অবস্থা ভেদে আশরাফ এখন হাশেমের খপ্পরে বন্দী। ভাইব্যা দেখেন, হাশেমের বিরুদ্ধে আসরে আসরে গান গাইবেন কি না।

হায়াত : যাবেদ, আমার এই দোতারায় কোনদিন ভুল সুর বাজে নাই। এই গলা দিয়া কোনদিন বাইর অয় নাই মিথ্যার গান। এই শেষ জীবনে হাশেমের ভয়ে তা পরিবর্তন অইবো না। অত্যাচারী যালেমের বিরুদ্ধে আইজ থাইক্যাই আরম্ভ হইব কবিয়াল হায়াত মুন্সির গান। আমার একমাত্র ভরসা রাব্বুল আলামীন আর রাব্বুল ইয্যত ওই আল্লাহ্।

(সোসপেন্স মিউজিক, ড্রামের আঘাত- একের পর এক। মানুষের কোলাহল অল্প থেকে চরমে পৌঁছে। তারপর হঠাৎ নীরবতা। ফিরোজার কোঠায় কথা বলছে ফিরোজা)

ফিরোজা : সে রাতেই গানের আসরে আমার কবিয়াল আব্বার গায়ে লাগল এসে অনেক আঘাত। কবিয়াল হায়াত মুন্সির কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে আব্বা তোমাকে খুঁজেছিলেন। কিন্তু তখন তুমি হাশেম চেয়ারম্যানের গানের আসরে। আব্বার কাছে ছিলেন যাবেদ চাচা। সেই যাবেদ চাচার হাতে আমার হাত রেখে আব্বা চোখ বুজলেন। তোমাকে আর কাছে পাওয়া গেল না। এত বিশ্বাসের অপমান কেন করেছিলে তুমি? কেন, কেন?

নঈম : বাপজীর এই খবরে বজ্রপাত হল আমার মাথায়! সারা দেহ যেন পুড়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেল! হাশেমের খপ্পর থেকে বেরিয়ে ছুটলাম রাতের অন্ধকারে। ছুটলাম যেন আপনজন হারা এক নতুন এতিম! গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, নদী নালা পার হয়ে রওনা দিলাম অজানার উদ্দেশ্যে। বাপজীর মুখ, তোমার মুখ, তোমার কোলে আসছে যে নতুন মানুষ তার কল্পনা আগুনের হল্কা হয়ে আমাকে পাগলের মত ছুটিয়ে নিয়ে চলল!

ফিরোজা : কিন্তু কেন, কেন?

www.pathagar.com

নঈম : অনুশোচনা আর লজ্জার তাড়নায়। আমার কলঙ্কিত অস্তিত্বের অনুভূতিতে।

ফিরোজা : (অবসন্ন কণ্ঠে) আব্বু মারা গেলেন, একা আমার কি করে চলবে, কি ভাবে বেঁচে থাকবে আমাদের সন্তান, সেকথাও তোমার মনে পড়ল না কেন, কেন?

নঈম : বাপজীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার লজ্জা আমাকে স্বাভাবিক মানুষের মত ভাবতে দেয় নি ফিরোজা।

ফিরোজা : আমাদের কথা পুরাপুরি ভুলিয়ে দিয়েছিল সেই বিশ্বাসঘাতকতা, এই-ই কি বলতে চাও?

নঈম : হয়তো তা-ই। সেই অমানুষ আশরাফ খানকে গলা টিপে মেরে নঈম খানের আবির্ভাব। কিন্তু নঈম খানও মুক্তি পেল না আশরাফ খানের পিছুধাবন থেকে। বিশ্বাসঘাতকতার সেই লজ্জা, সেই অনুশোচনা ছায়ার মত লেগে থাকল নঈম খানের সকল অস্তিত্বে। কত দেশ ঘুরল তো নঈম খান। অবশেষে ফিরে এল দেশে। রচনা করল 'মানুষ মাটির ইতিকথা'। কিন্তু কই-(কান্নার নামান্তর যে হাসি, তা-ই কণ্ঠে এনে) সাহিত্যিক, চীফ রিপোর্টার নঈম খানের অস্তিত্বে আজও তো সেই সর্বদাহী গ্লানি।

ফিরোজা : আমার পাশে ছায়ার মত তখন শুধুমাত্র যাবেদ চাচা। দীপু এল কোলে, দিন কাটতে লাগল অতি কষ্টে। তারপর একদিন অসহায়তা চরমে পৌঁছল যখন, তখন যাবেদ চাচাকে নিয়ে চলে এলাম ঢাকায়। আশ্রয় পেলাম দুঃখীর মা'র ভাঙা ঘরে। বুড়া বয়সেও রিকশা চালাতেন যাবেদ চাচা। অনেক চেষ্টায় এক কেমিক্যাল কোম্পানীতে পেলাম একটা সাধারণ চাকরী। দুঃখীর মাকে সঙ্গে নিয়েই উঠে এলাম একটা টিনের বাসায়। কিছু কিছু করে টাকা জমল। ঢাকার উপকণ্ঠে কম দামে কিছুটা জমি কিনলাম। বছর দশেক আগের সেই জমির দামই সেদিন পেলাম- পাঁচ লাখ টাকা। কিছুদিন আগেই টিনের বাসা বদলে উঠে এসেছি এই পাকা বাসায়। দীপু একটা ভাল স্কুলে পড়ে তো। তাই কাছাকাছি এই বাসাটাই নিলাম।

নঈম : যাবেদ চাচা কোথায়?

www.pathagar.com

ফিরোজা : গত বছর গাঁয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে। অসুখে পড়ে সেখানেই মারা যান। চাচার ইচ্ছানুসারে আব্বুর কবরের পাশেই তাঁর কবর দেওয়া হয়েছে।

নঈম : যাবার আগে আমি জেনে যেতে পারি না– সেখানে গিয়ে বাকী টাকা দিয়ে কি করার পরিকল্পনা তোমার? অবিশ্যি বলতে না চাইলে আমি আর প্রশ্ন করব না। সে অধিকার আমার আর নেই জানি।

ফিরোজা : কবিয়াল হায়াত মুন্সি আর যাবেদ চাচার কবরকে সামনে রেখে একটা স্কুল গড়ে তুলব আমি। আব্বু চেয়েছিলেন, তাঁর জীবনের আশা–আকাঙ্খা যেন নিঃশেষ হয়ে না যায়। আল্লা' আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, চেষ্টা করব তাঁর সেই আশা–বৃক্ষে ফুল ফোটাতে। তার পরও যা থাকবে, তা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করব দীপুর ভবিষ্যতটাকে।

নঈম : বিদেশ থেকে দেশে ফিরে গোপনেই গিয়েছিলাম তোমাদের পতিত ভিটায়। বাপজীর কবরের পাশে বকুল গাছটায় অনেক ফুল ফুটেছিল। তোমাদের কোন খবর সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারি নি। শুধু বকুল ফুলের সুবাস নিয়েই ফিরে এলাম। ছাপা হয়ে বেরুলো 'মানুষ মাটির ইতিকথা'। তারপর পত্রিকায় এই চাকরী।

(দীপু আসে)

দীপু : আম্মু, আমি এই মেহ্‌মানের জন্য চানাচুর আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখীর মা বারণ করল।

ফিরোজা : আচ্ছা, দুঃখীর মাকে বলছি এক কাপ চা দিতে। তুমি চানাচুর নিয়ে এস। আপনি একটু বসুন। চা খেয়ে যাবেন। আমার কিছু কাজ পড়ে রয়েছে।

(চলে যায় ফিরোজা)

দীপু : (নঈমকে) আচ্ছা, আমি আপনাকে কি বলে ডাকব?

নঈম : (আবেগে) দীপু, দীপুমণি! তোমরা তো এখ্‌খুনি চলে যাবে। ফিরে আসার পর আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব আমি। সেদিন তোমার দেওয়া চানাচুর খেয়ে যাব। তোমার আম্মুকে গিয়ে বল– আজ আর চা খাব না, আমি চলে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

আর আমাকে কি বলে ডাকবে– তা তোমার আম্মাকেই জিজ্ঞেস করো।

দীপু : আমি বুঝেছি, আপনি মন খারাপ করে চলে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা করতেই আসবেন না।

নঈম : না না দীপু—একদিন না একদিন তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবই। তাছাড়া, তুমি তো রয়েছই আমার এ ক্যামেরার বুকে। তোমার ছবি প্রিন্ট করে সব সময় আমার বুকের কাছে রাখব। এবার চায়ের কথা তুমি মানা করতে যাও, আমিও চলি।

(ফিরোজা বেগম আসে)

ফিরোজা : না, চা–চানাচুর খেয়েই যেতে হবে আপনাকে। দীপু, তুমি গিয়ে চা–চানাচুর আনতে বল।

দীপু : আচ্ছা।

(দীপু খুশী হয়ে চলে যায়)

নঈম : ঠিক আছে, বসছি। কিন্তু একটু আগে দীপু আমাকে জিজ্ঞেস করছিল– সে আমাকে কি বলে ডাকবে। আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি। বলেছি— তোমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে।

(ফিরোজা নিরুত্তর)

তুমি কি আর কোন কথাই বলবে না? ফিরোজা, যত বড়ই হোক আর যত গর্হিতই হোক — একটা ভুলেই মানুষের জীবনের সব সত্য চাপা পড়ে যায় না, যাওয়া উচিত নয়। দ্বীপান্তরের সাজা থেকেও আসামী একদিন না একদিন মুক্তি পায়। কিন্তু আমার মুক্তি — যাক। আমার এত কথার পরও তুমি নিরুত্তর। অথচ আমাকে চা খাওয়ানোর জন্য বসিয়ে রাখলে।

ফিরোজা : এতদিন পর দীপুকে আমি কি উত্তর দিতে পারি?

নঈম : উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে বলতে পার না — আমাদের সঙ্গে চল বাপজীর কবরের পাশে? বলতে পার না— সেখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলতে হবেঃ সকল অপরাধের জন্য মাফ চাইতে এসেছি বাপজী। এসেছি ভাঙা জীবন আবার জোড়া লাগাতে। বকুলগন্ধ ভোরে এই প্রতিশ্রুতি দিতে যে কবিয়াল হায়াত মুন্সির আশা–বৃক্ষে ফুল ফুটতেই থাকবে, ফুটতেই

www.pathagar.com

থাকবে! আর তা যদি একান্তই বলতে না পার, তাহলে আমাকে যেতে দাও ফিরোজা! — আর এক কথা– বলতে পার আমার শেষ অনুরোধঃ আমার সামনে না হলেও একা একা তুমি দীপুকে আমার পরিচয়টা দিয়ো। আমার মহামূল্য এই সত্যটাকে আঁকড়ে ধরেই যেন আমি একদিন মরতে পারি!

(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ফিরোজা বেগম ডাকে–)

ফিরোজা ঃ দীপু!

দীপু ঃ জ্বি আম্মা!

(দীপু আসে)

ফিরোজা ঃ আজ আমরা আর যাচ্ছি না। কয়েকদিন পর তোমার এই আব্বুকে নিয়ে একসঙ্গেই যাব। তুমি তোমার আব্বুর কাছে বস, আমি আসছি।

(চোখে আঁচল চেপে ফিরোজা বেগম চলে যায়)

দীপু ঃ (নঈমের কাছে গিয়ে) আপনি আমার আব্বু?!

নঈম ঃ (অশ্রুরুদ্ধ আবেগে) হ্যাঁ দীপুমণি, আমি তোমার — আমিই তোমার আব্বু!

(দীপুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নঈম। ট্রে-তে করে চা-চানাচুর নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায় দুঃখীর মা, তার মুখে হাসি)

*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার 'জীবন-কথা'র কিছু কথা

আসকার ইবনে শাইখ

। বার ।

'আসকার রচনাবলী'র পঞ্চম খন্ডে আমার 'জীবন-কথা'র শেষ অংশে নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, এবং তাতে প্রতিষ্ঠা-কালের বিবরণীও দেওয়া হয়েছে। সে সময় বিভিন্ন সভার কার্য বিবরণী ইংরেজিতে লেখা হত; পরে তা বাংলায় লেখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নাট্য একাডেমীর প্রতিষ্ঠা সে-সময়কার আমার কর্মোৎসাহে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং, বলতে গেলে, আমার 'জীবন-কথা'য় একটা দুর্যোগময় মাত্রা সংযোজন করে। সে সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়ার আগে নাট্য একাডেমীর কার্য বিবরণীর পুরোটাই (খানিকটা পুনরুল্লেখসহ) এখানে তুলে ধরছি। উদ্দেশ্যঃ আমার এ প্রয়াসে, একাডেমীর বিভিন্ন কমিটি গঠনে ও এর সামগ্রিক কর্মকান্ডে বড় ধরনের যুক্তিগ্রাহ্য কোন ত্রুটি আছে কি না তা সকলের কাছে তুলে ধরা।

GENESIS
of the
NATYA ACADEMY

1. Under the sponsorship of the Saat Rong Natya Goshthi, the first meeting of the Ad-hoc Organizing Committee for the establishment of an Academy of Dramatics was held on 23.7.1969 at 19/A, Sir Syed Ahmed Road with Dr. Hasan Zaman in the chair. The other two members were Mr. A, Z. Khan (Director, Student-Teacher Centre, Dhaka University) and Mr. Askar Ibne Shaikh. It was resolved that Mr. A. I. Shaikh be requested to act as Convenor of the Ad-hoc Organizing Committee and to prepare a scheme for the establishment of the Academy.

www.pathagar.com

2. The second meeting of the Ad-hoc Organizing Committee was held on 1.7.1970 at 14, Haji Osman Ghani Road with Dr. Hasan Zaman in the chair. Messrs A. Zaman Khan and A. I. Shaikh were present. Dr. Mahbub Uddin Ahmad (Dr. M. Ahmad) was co-opted as a member of the Ad-hoc Organizing Committee. It was further resolved that the convenor be authorized to explore possibilities for collection of funds for the said Academy from different sources.

3. The third meeting held on 10.9.1970 with Dr. Hasan Zaman in the chair resolved that the following notable personalities be requested to join with the venture of establishing the Academy:

   i) Mr. Zoynal Abedin, the retired Principal of the Govt. Art College, Dhaka.

   ii) Mr. Serajuddin Hossain, the notable journalist; and

   iii) Mr. Syed Hasan Imam, the famous actor.

4. A meeting of the Ad-hoc Organizing Committee and some notable personalities of the city of Dhaka was held on 4.10.1970 at 19/A, Sir Syed Ahmed Road with Mr. Serajuddin Hossain in the chair. Messrs Syed Hasan Imam, Dr. M. Ahmad, A. Z. Khan and A. I. Shaikh were present. It was resolved in the meeting that the Ad-hoc Organizing Committee be dissolved and the Executive Committee for the Academy of Dramatics be formed with the following members with powers to co-opt:

   i) Mr. Zoynal Abedin

   ii) Mr. Serajuddin Hossain

www.pathagar.com

iii) Mr. Syed Hasan Imam

iv) Dr. Hasan Zaman

v) Mr. A. Zaman Khan

vi) Dr. M. Ahmad

vii) Mr. A. I. Shaikh

(All are members of the dissolved Ad-hoc Organizing Committee)

It was further resolved that the meeting may be regarded as the first meeting of the Executive Committee, and that the following notable personalities be co-opted as members of the Executive Committee :

i) Dr. Mohd. Enamul Huq

ii) Prof. Munier Chowdhury

iii) Mr. Nurul Momen

iv) Dr. Mrs. Neelima Ibrahim

v) Dr. Mir F. Zaman

vi) Mr. Ashrafuzzaman Khan

vii) Mr. Khan Ataur Rahman

viii) Mr. Nitun Kundu

ix) Mr. Räziullah

xx) Prof. Nazmul Karim

xxi) Mr. A. Zaman Khan.

It was resolved that the number of members in the Executive Committee be not more than 18, and the quorum of the meeting from the second one be formed with 6 member's.

Resolved that Mr. Askar Ibne Shaikh be appointed as the first honorary Director of the Academy of Dramatics for a period of 3 years. Further

www.pathagar.com

resolved that the following members be the office-bearers of the Executive Committee:

i)	Mr. Zoynal Abedin	Chairman
ii)	Dr. Hassn Zaman	Treasurer
iii)	Mr. Syed Hasan Imam ...	Jt. Secretary
iv)	Mr. A. I. Shaikh	Secretary

Also resolved that two Vice-Chairmen be made in the next meeting of the Executive Committee to be held on 11.10. 1970. Resolved also that Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, the Vice-Chancellor, Dhaka University, be requested, (a) to be the Patron of the Academy of Dramatics, and (b) to allow Mr. Askar Ibne Shaikh to work as the honorary Director of the Academy of Dramatics as he happens to be a teacher of the said University.

5. A meeting of the Executive Committee was held on 11.10 1970 at 10 a. m. at 19/A. Sir Syed Ahmed Road, Dhaka-2 with Mr. Zoynal Abedin in the chair. The following members were present:

i) Mr. Nurul Momen
ii) Dr. Mrs. Neelima Ibrahim
iii) Mr. Ashrafuzzaman Khan
iv) Mr. Serajuddin Hossain
v) Mr. Khan Ataur Rahman
vi) Dr. Mir Fakhruzzaman
vii) Dr. M. Ahmad
viii) Mr. A. Zaman Khan
ix) Mr. Nitun Kundu
x) Mr. Raziullah
xi) Mr. Syed Hasan Imam
xii) Mr. Askar Ibne Shaikh

www.pathagar.com

Resolutions:

(1) Resolved that the name of the Academy be "Natya Academy".

(2) Resolved that Mr. Nurul Momen and Mrs. Neelima Ibrahim be made the two Vice-Chairmen.

(3) Resoleved that the classes for the Certificate and Diploma Courses of the Natya Academy be started from the first week of January, 1971.

(4) Resolved that a Committee of Courses be formed with the following members (with powers to co-opt):

i) Mr. Nurul Momen .... Chairman
ii) Prof. Munier Chowdhury
iii) Mr. Ashrafuzzaman khan
iv) Mr. Nitun Kundu
v) Mr. Raziullah
vi) Mr. Zia Hyder
vii) Mr. Askar Ibne Shaikh ... Convenor

Further resolved that the Committee finalizes the syllabii of the Certificate and Diploma Courses in Dramatics for the Academy within 3 weeks from the 12th of October, 1970.

5. Resolved that Constitution Drafting Sub-Committee to draft a constitution with rules and regulations for the Natya Academy be formed with the following members:

(1) Dr. Mohd. Enamul Huq ... Chairman
(2) Mr. Serajuddin Hossain
(3) Mr. Amanuzzaman Khan
(4) Dr. M. Ahmad
(5) Mr. Syed Hasan Imam
(6) Mr. Askar Ibne Shaikh .... Convenor

www.pathagar.com

Further resolved that the Sub-Committee finalizes the constitution with rules and regulations of the Natya Academy within 3 weeks from the 12th of October, 1970.

6. The third meeting of the Executive Committee of the Natya Academy was held on 14.11.1970 at 11 a.m. at the Teacher-Student Centre, Dhaka University with Mr. Zoynal Abedin in the chair. The following members were present:

i) Dr. Mrs. Neelima Ibrahim
ii) Dr. Hasan Zaman
iii) Dr. M. Ahmad
iv) Mr. A. Zaman Khan
v) Mr. Syed Hasan Imam
vi) Mr. Nitun Kundu
vii) Mr. Askar Ibne Shaikh

Resolutons:

(1) Resolved that the Constitution and Rules & Regulations as set out in Appendix-A be approved.

(2) Resolved that the syllabii for different Courses in Dramatics as set out in Appendix-B be approved.

(3) Resolved that Mr. Mohd. Yakub Ali, Advocate and Mr. Syed Badruddin Hossain, Registrar, Dhaka University, be co-opted as members of the Executive Committee as Prof. Munier Chowdhury and Dr. Mohd. Enamul Huq expressed their unwillingness to act as member of the Executive Committee for their other pre-occupations.

(4) Resolved that a Saving Bank Account be opened with the Eastern Banking Corporation in the name of the Natya Academy and this Account be jointly operated by any two of the following :

www.pathagar.com

Chairman, Treasurer, Secretary of the Executive Committee of the Natya Academy.

(5) Resolved that the Director be authorized to make arrangement for organizing classes by appointing teachers, tutors, technicians and other auxiliary staff on remuneration considered reasonable.

(6) Resolved that two regular teachers be appointed on a monthly salary of, Rs 200/=p.m from the Ist of December, 1970. Further resolved that other teachers, tutors and technichians be appointed as and when consideerd necessary by the Director.

(7) Resolved that a Selection Committee be formed with the followoing members:

i) Mr. Askar Ibne Shaikh
ii) Dr. Mrs. Neelima Ibrahim
iii) Mr. A. Zaman Khan
iv) Mr. Nitun Kundu
v) Mr. Syed Hasan Imam

(8) Resolved that an Office Assistant-cum-Typist and one Class-cum-Stage Assistant on a monthly salary of Rs. 150/= p.m. and 75/= p. m. respectively be appointed from the Ist of December, 1970.

(9) Resolved that the Director be authorized to purchase furniture, fittings and equipments for the Natya Academy.

(10) Resolved that students be admitted into the courses from the Ist of December, 1970 and classes be started from the 2nd of January, 1971.

(11) Resolved that the Natya Academy be registered.

(12) Resolved that the Director prepare a service plan in P.C.-1 form for the Natya Academy.

www.pathagar.com

(13) Resolved that the Budget for 1970-1971 as set out in Appendix-C be approved.

(14) Resolved that the future proceedings of meetings etc. be written in Bengali.

(15) Resolved that the rules as laid down under be approved:

a) **Session:**

The session of the Natya Academy commences on the Ist of July and ends on the 30th of June each year.

b) **Demonstration and public and special classes:**

(i) In order to encourage the students and to accustom them with the styles of dramatic presentation, demonstrative play-productions will be arranged periodically by the students themselves in presence of invited audience;

(ii) Reputed dramatists, actors-actresses and drama-critics will occasionally be invited to give lectures and instructions from time to time;

(iii) Special coaching classes will be arranged, besides regular classes, by experts on the subject;

(iv) Tours outside Dhaka and abroad may be specially organized by the Natya Academy.

c) **Tours :**

It is compulsory for all selected students to join such tours. The Director, however, may

www.pathagar.com

allow any of the selected students on resonable grounds to avoid such tours.

d) **Class hours:**

(i) For the present, classes will be taken in the evening.

(ii) Classes will be held according to routines prepared by the Director from time to time.

e) **Female students :**

Female students shall have to make their own arrangement for escorts and conveyance. Neither the Director nor any teacher of the Natya Academy shall be held responsible if a female student leaves the Academy premises without attending classes or without information.

f) **Vacations :**

The Natya Academy shall ordinarily observe periodical vacations as are normally observed by the general Universities.

g) **Admission:**

(i) Minimum educational qualification for students to be admitted to the Certificate Course in Dramatics shall be Secondary School Certificate. In very special cases, the minimum qualification, however, may be waived out by the Director.

(ii) Minimum educational qualification for students to be admitted to the Diploma Course in Dramatics shall be Higher Secondary School Certificate.

www.pathagar.com

h) Tuition and other fees :

(1) For Certificate Course :
Tution Fee ...... Rs. 10.00 p.m.; Admission Fee .... Rs. 10.00 p.m.; Materials Fee..... Rs. 10.00; Examination Fee .... Rs. 10.00; Reeipt Fee .... Rs. 01.00.

(2) For Diploma Course :
Tution Fee .... Rs. 12.00; Materials Fee :.. Rs. 12.00; Examination Fee .... Rs. 12.00; Receipt Fee .... Rs. 01.00.

(3) Minimum qualification and different fees for Higher Diploma Course in Dramatics will be fixed as and when needed.

i) Duration of the Courses :

(i) The duration of the Certificate Course in Dramatics will be one year;

(ii) The duration of the Diploma Course in Dramatics will be one year for part one and one year for part two; and

(iii) The duration of the Higher Diploma Course in Dramatics will be two years.

j) Others:

(1) The tuition fee for each month has to be paid by the 7th of the month. A delay fine of fifty paisas per week or any part thereof will have to be paid;

(2) Names will be struck off from the register for non-payment of tuition fees for two consecutive months; and

www.pathagar.com

(3) Re-admission on satisfactory ground will be allowed on a payment of a fee of Rs. 5,00 (Rupees five) only.

। তের ।

নাট্য একাডেমীর কাজ এগিয়ে চলার মাঝখানে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও প্রফেস্যর মুনীর চৌধুরী সাহেব এই একাডেমীর সঙ্গে জড়িত থাকতে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশের কথা কার্য বিবরণীতে উল্লেখিত হয়েছে। তদনুসারে তাঁদেরকে বাদ দিয়েই নাট্য একাডেমীর কাজ এগিয়ে চলে। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানীদের জন্য 'স্বকীয় সত্তা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা'র আন্দোলনও জোরদার হয়ে ওঠে। এগিয়ে আসে উনিশ শ' একাত্তর সাল।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাট্য একাডেমীর কার্যস্থল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা (১৯/এ) তখন বেশ জমজমাট। সবচেয়ে উৎসাহীদের মধ্যে সর্বজনাব আফতাবউদ্দিন আহমেদ, মোস্তফা জব্বার, আতিকুর রহমান আতিক, সাঈদ তারেক, নূরুল আলম তালুকদার, মোহাম্মদ জালালউদ্দিন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (স্মৃতির ওপর নির্ভর করে লিখছি বলে আরও উল্লেখযোগ্য কারও কারও নাম বাদ পড়তে পারে; এর জন্য আমি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমাপ্রার্থী)।

এর মধ্যে একদিন— আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসেন (উভয়েই আমার খুবই ঘনিষ্ঠ আপনজন) এলেন আমার বাসায়। বিভিন্ন বিষয়ে পারিবারিক আলাপচারিতার মধ্যে তাঁরা, বিশেষ করে সৈয়দ নজরুল, খোলাখুলিই বললেন— এই নাট্য একাডেমীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হবে। এখানে আবারও উল্লেখ্য যে নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আওয়ামী ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত কর্মীরাই প্রধানত সক্রিয় ছিল।

এগিয়ে আসছে একুশে ফেব্রুয়ারী, একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারী। আমি তখন কয়েক মাসের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান রূপে যোগদান করেছি; উদ্দেশ্য, সেখানে পরিসংখ্যান বিভাগকে গড়ে তোলা। (সেখানে ৯ মাস চাকুরী করার পর আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে স্বপদে যোগ দেই।) কিন্তু থাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসাতেই। জনাব আ. স. ম. আবদুর রব তখন ডাকসুর ভিপি। তিনি জানালেন, একুশে ফেব্রুয়ারীতে ডাকসুর

www.pathagar.com

ফাংশানে আমার সক্রিয় সহযোগিতা চাই। একে তো নাচুনে বুড়ী, তার উপর ঢোলের বাড়ি। রাজী হয়ে গেলাম।

আরম্ভ হল একুশে ফেব্রুয়ারীর জন্য ফাংশানের আয়োজন। নাচগানের জন্য তো আর্টিস্ট আছেই। তার জন্য আর বিশেষ মহলার প্রয়োজন নেই। যা অতি-প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল, তা হচ্ছে দিবসটির গুরুত্ব অনুযায়ী কোন নাটিকা লিখে তাকে মঞ্চায়নযোগ্য করে তোলা। মোস্তফা জব্বারকে দিয়ে লেখানো হল নাটিকা, শিরোনাম—'এক নদী রক্ত'। পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে কে? আফতাবউদ্দিন আহমেদ। পরমোৎসাহে চলল মহলা, আমারই বাসায় এবং স্বভাবতই সব কিছু আমারই তত্ত্বাবধানে। মহলার মধ্যেই আ. স. ম. আবদুর রব এলেন বাসায়; ফাংশানে তাঁরা হয়তো উপস্থিত থাকতে পারবেন না, কিন্তু এই আশা নিয়ে যাচ্ছেন যে ফাংশানটা সময়োপযোগীই হবে। খেয়ে যেতে সাধলাম, কিন্তু পরে একদিন এসে খেয়ে যাবেন বলে চলে গেলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারীর ফাংশান সময়োপযোগীই হয়েছিল। পাকিস্তানী জেনারেল সেজে একজন তো উৎসাহের আতিশয্যে আহতই হয়েছিলেন। ছেলেমেয়েসহ আমার গোটা পরিবার উপস্থিত কার্জন হলের ফাংশানে। পরের দিন আবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাংশান। একুশেতে আমি ডাকসুর ফাংশান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাংশান পরের দিন বাইশে ফেব্রুয়ারী। নাটিকা নয়, গান-বাজনার ফাংশান। গরম গরম বক্তৃতাসহ সেই ফাংশানও ভালই হয়েছিল। ডাকসুর ফাংশান তখন ভীষণভাবে প্রশংসিত।

হ্যাঁ, আ. স. ম. আবদুর রব সাহেব আমার বাসায় হঠাৎ করেই খেতে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন স্বপন চৌধুরী। সেদিন ছিল ৭ই মার্চ, বেলা সাড়ে এগারটার দিকে ব্যস্তসমস্তভাবে বাসায় এসেই বললেন- ক্ষুধার্ত আছি স্যার, খেতে দিন। তাড়াতাড়ি করেই খেতে দেওয়া হয়েছিল। মাছভাত খেয়ে তাঁরা খুশীই হয়েছিলেন। 'মনে হল মায়ের হাতের রান্নাই খেয়ে গেলাম' — বলে তাঁরা আবার চলে গেলেন ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার তদারকিতে।

আমাদের 'স্বকীয় সত্তা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা'র আন্দোলন তখন রূপ নিয়েছে 'মুক্তির সংগ্রাম'-এ, 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এ। এরই মধ্যে গ্রীন রোডের গ্রীন কর্নারে আমার নিজস্ব বাসা নির্মাণের প্রাথমিক কাজও আপাতত শেষ হয়েছে। এতদিন নাট্য একাডেমীর ক্লাস হত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায়। স্থির হল— এখন থেকে আমার গ্রীন কর্নারের বাসাতেই নেওয়া হবে নাট্য একাডেমীর ক্লাস। তদনুসারে, ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ সে-বাসায় মিলাদের আয়োজন করা হল। বলা

www.pathagar.com

চলে, তা ছিল নাট্য একাডেমীর গৃহ-প্রবেশের আয়োজন। কিন্তু তা আর কার্যকরী হল না। আরম্ভ হয়ে গেল স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় পর্যায়। তারপর ৭ই মার্চ এবং ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল; এবং মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস।

এই নয়টি মাসের আরম্ভটা হঠাৎ করেই আমাকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে দিল। ২৫শে মার্চের সকালেও সৈয়দ নজরুলের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। পাকিস্তানী আর্মি যে ক্র্যাকডাউন করতে পারে এমন সম্ভাবনার আভাসও তাঁর কাছ থেকে পাই নি। সে আভাস তিনিও নিশ্চয়ই পান নি। বরং ২৫ শে মার্চের সকালেও সৈয়দ নজরুল তাঁর সম্বন্ধীর বাসা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বাসায় যাওয়ার পথে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটা সমঝোতার কথা আমাকে খুলেই বলেছেন। কিন্তু ২৫ তারিখের দিনগত রাতেই ঘটে গেল ঠিক তার বিপরীতটা। এদিকে নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে জড়িত আমার সাথী-কর্মীদেরও কোন হদিস নেই। পরে জানা গেল- তারা সবাই চলে গেছে দেশ বা ঢাকা ছেড়ে, আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ না করেই। পঁচিশে-ছাব্বিশে মার্চে সেরকম যোগাযোগ সম্ভবও ছিল না। ফলে, ছ'জন ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি, পরিবার-প্রধান, আটকে পড়ে গেলাম ঢাকায়। সারা দেশের অবস্থা এমন যে ছেলেমেয়ে নিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে যেতেও সাহস পাচ্ছি না।

আমার এক শ্বশুর-শ্রেণীর আত্মীয় তাঁর পরিবার নিয়ে চলে যাবেন গাঁয়ের বাড়িতে। কাওরাইদ থেকে নদী পথে ময়মনসিংহ জেলার দিকে বেশ কিছু দূর গেলেই নদীর ধারে তাঁদের সুরক্ষিত বাড়ি। তাঁদের সঙ্গী হলে তাঁদের বাড়ি থেকে সুযোগ মত এ-গ্রাম সে-গ্রাম পেরিয়ে নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারব বলে স্থির করলাম- তাঁদেরই সঙ্গী হব। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে কথামত তাঁদের বাসায় গিয়ে জানলাম- খুব ভোরেই তাঁরা চলে গেছেন। অবাক হলাম নিশ্চয়ই। কিন্তু কয়েকদিন পর শুনলাম — তাঁরা বাড়িতে এসেছেন শুনে ডাকাত পড়েছিল এবং সেই আত্মীয়ের ছোট ভাই ডাকাতদের হাতে নিহত। — তার পরেও গাঁয়ের বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সপরিবারে গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শুনেছি—নারায়ণগঞ্জের পথে মিলিটারি এ্যাকশ্যন হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি বাসায়: ঢাকা থেকে আর বেরুতে চেষ্টা করি নি। মুক্তিযুদ্ধের ওই প্রথম দিকটায় মানুষ যখন পাকিস্তানী আর্মির ভয়ে ঢাকা ও অন্যান্য শহর-বন্দর ছেড়ে সপরিবারে গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার জন্য ছুটাছুটি করছিল, তখন পথে পথে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যেমন তাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্যও করেছে, তেমনি দুষ্কৃতকারীরা তাদেরকে নানাভাবে বিপন্নও করে তুলেছে।

www.pathagar.com

সৈয়দ নজরুলের সঙ্গে কথা ছিল— সংগ্রামের স্বাভাবিক দিনগুলিতে তিনি অন্য কোন আত্মীয়ের বাসায় না থেকে আমার গ্রীন কর্নারের বাসাতেই থাকবেন। কিন্তু দিনগুলি আর স্বাভাবিক থাকল না। সৈয়দ নজরুল সেই দিনগুলিতে রইলেন কলকাতায়; বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তিনি। আমার গ্রীন কর্নারের বাসা খালিই রইল। ভাড়া নিতে চেয়েছিলেন কেউ কেউ। আমি রাজী হই নি; কারণ, আমার নাট্য একাডেমীর কর্মীরা ফিরে এসে এ–বাসাতেই উঠবে তো।

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস ছিল ঢাকায় আটকে পড়া অনেকেরই মত আমার জন্যও এক নিঃসঙ্গ দুর্বিসহ দীর্ঘকাল। নাট্য একাডেমীর কাজকাম আপাতত বন্ধ, একাজে আমার সহকর্মীরা কেউ কাছে নেই; মঞ্চ–নাটক তো দূরের কথা, রেডিও–টেলিভিশনের জন্য নাটক লেখা বা নাটকে কিংবা অন্য কোন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করাও পুরোপুরি বন্ধ; সত্তর সালে আরম্ভ করা সৈয়দ হাসান ইমামের পরিচালনাধীন আমার রচিত 'লালন ফকীর'–এর চলচ্চিত্রায়নও আপাতত আর এগুচ্ছে না। সুতরাং পেশার দিক দিয়ে তো আমি একেবারেই কর্মহীন।

তদুপরি, মার্চের গোড়ার দিকে এদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিসারী আহত দুর্গতদের সাহায্যের জন্য গঠিত আওয়ামী লীগের ত্রাণ তহবিলে চাঁদা দাতাদের যে তালিকা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাতে আমার নামও রয়েছে প্রথম দিকে। এমনিতে পঁচিশে মার্চের পাকিস্তানী আর্মির ক্র্যাকডাউনের পর ঢাকায় অবস্থানরত সকল বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলের ওপর সরকারী বাহিনীর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি সকলের মত আমাকেও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তদুপরি, সহকর্মীরাও কেউ কাছে নেই। তাই একা–একাই এখানে–সেখানে ঘুরাফেরা করি। এহেন অবস্থায় 'জগন্নাথ হলে পাকিস্তানী আর্মির ক্র্যাকডাউন' সংক্রান্ত ঘটনার ওপর সরকারের তৈরী এক স্টেটমেন্টে ৫৫ জন শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আমাকেও বাধ্য হয়ে অন্যতম স্বাক্ষর দানকারী হতে হল। এবং এর মধ্যে গাঁয়ের বাড়িরও খবর পেলাম। সেখানে আমাদের বাড়িতেই কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছে এসে পাশের গাঁয়ের কতিপয় হিন্দু পরিবার। এ খবরটিও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হবে না– এমন সম্ভাবনাও কম। কাজেই দুশ্চিন্তার আর শেষ থাকল না।

অতঃপর শত দুশ্চিন্তায় ডুবে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যাই। ততদিনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এসেছি 'মরণাশঙ্কায়'। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সকল অধ্যাপককেই কাজে যেতে হত ঢাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে চেপে, মীরপুরে অবস্থিত 'বিহারীদের' নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা পার হয়ে। ওখানকার 'বিহারীরা' তখন 'বাঙালীদের' ওপর খুবই মারমুখী। খুন–খারাবীর ব্যাপারে আমি কখনও খুব 'সাহসী' ছিলাম না। তাই 'মরণাশঙ্কা'কে

www.pathagar.com

কিছুটা দূরীভূত করতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেওয়াই শ্রেয় মনে করলাম, যাতে মীরপুর এলাকা মাড়াতে না হয়। ফিরে এলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, ছাত্রছাত্রীদের পড়াই, নাট্যসাহিত্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর কিছু পড়াশুনা করি, আর বিকালে ফুলার রোডে আমাদের কলোনির মাঠে বসে অন্যান্য বাঙালী-অবাঙালী সহকর্মীদের আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর শুনি এঁর-তাঁর মুখে, কখনও কিছু মন্তব্যও করি, যা পরে আমার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এভাবেই কেটে যায় একঘেয়ে দিন আর রাত। এগিয়ে আসে একাত্তরের ডিসেম্বর।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। সফল হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম' বাংলাদেশ। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় এসে উঠেছেন জনা চল্লিশেক তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, দু'টি বাসে চেপে। তাঁদের অধিকাংশই আমার নাট্যকর্মের সঙ্গে জড়িত। দীর্ঘ নয় মাস পর আমি যেন আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠলাম। মনে উচ্চকিত আশা — স্বাধীন স্বদেশে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের নাট্য একাডেমী। কিন্তু সেই উচ্চকিত আশার আলো হঠাৎ করেই নিভে গেল।

আমি চিহ্নিত হয়ে গেলাম স্বাধীনতা বিরোধী বলে। আমার বাসায়-ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম আফতাবউদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে ডক্টর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেস্যর) একদিন আমাকে বললেনঃ কলকাতায় জমায়েত তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ধারণা জন্মেছিল যে আমি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে রেডিও-টেলিভিশনে পাকিস্তানী আর্মির সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছি। আরও বললেনঃ গত জুলাই মাসে ঢাকায় এসে সন্ধ্যার আগখানে আমার বাসায় অবস্থান করে যখন একরাত কাটিয়ে যান, তখন তিনি পড়েছিলেন এক চরম দ্বন্দ্বে। পাকিস্তানী আর্মির সঙ্গে বেনামে সহযোগিতা করার জন্য আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং তিনি ঢাকাতে আমার বাসায় এসেছিলেন আমার সম্বন্ধে ও-ব্যাপারের সত্যতা যাচাই করতে। কিন্তু আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং অন্যান্য সোর্স থেকে খবরাখবর নিয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে আমার বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। আফতাব আহমেদের কথা শুনে মনে হল — 'সেই একটি বিশেষ মহল'-এর বিরোধিতা আমার জন্য দুর্যোগের কালো মেঘে পরিণত হচ্ছে! প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, রেডিও-টেলিভিশনে ছদ্মনামের যেসব প্রোগ্রাম আমার 'অবদান' বলে 'প্রচারিত' হয়েছিল, সেসব প্রোগ্রামের প্রকৃত রচয়িতাদের সন্ধান পরে পাওয়া গিয়েছিল।

www.pathagar.com

আমার সম্পর্কে এই 'প্রচারিত' ধারণা সাথী-কর্মীদের মন থেকে বেশ কিছুটা দূরীভূত হলেও একেবারে নিঃশেষ হল না। অনেকের কাছেই তা নিঃশেষ হল তখন, যখন জনাব সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন 'জাসদ'-কর্মীদের পক্ষ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে পাকিস্তানী আর্মি বা সরকারের সঙ্গে আমার সহযোগিতার কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। তদুপরি, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ডক্টর নীলিমা ইবরাহীমের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাকারী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে আমার নাম খুঁজে পান নি। তাই 'জগন্নাথ হলে পাকিস্তানী আর্মির ক্র্যাকডাউন' সংক্রান্ত ব্যাপারে 'স্টেটমেন্ট' দানকারী সেই ৫৫ জনের একজন হওয়া ছাড়া আর কোন অপবাদ থেকে আমি মুক্ত হলাম।

১৯৭২ সালে সূর্যসেন হলের নাট্যাভিনয়ে আমার 'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটক মঞ্চস্থও হল। 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকায় বেনামে-স্বনামে নিয়মিত লিখতেও থাকলাম। কিন্তু তাতে কি। সেই বিশেষ মহলটির কাছে আমি পাকিস্তানী আর্মি ও সরকারের সঙ্গে 'কোলেবোরেশন' বা সহযোগিতা করার অপরাধে অপরাধীই হয়ে থাকলাম। এবং তারই জন্য স্ক্রীনিং বোর্ডের সুপারিশক্রমে সাসপেন্ডেড্ হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী থেকে। কোথায় আমাদের নাট্যোন্নয়নের জন্য নাট্য একাডেমীর সুপ্রতিষ্ঠা আর কোথায় জীবন ও জীবিকা নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত টানা-হিঁচড়া। আমাকে নিয়ে সৈয়দ নজরুল ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা-বন্ধুরা তখন খুবই 'লজ্জিত'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী নেই, মাইনাও নেই। গাঁয়ের সম্পত্তি থেকে যা আয় হয়, তার পুরোটাই ব্যয় হয়ে যায় জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভদ্রভাবে জীবন ধারণের দাবি মেটাতে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রশ্ন আছে; সবাইকে নিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে বসবাস করতে যাওয়াও সুবিবেচনা সম্মত নয়। অগত্যা ঢাকায় থেকেই জীবিকা নির্বাহের 'সংগ্রাম' আরম্ভ করতে হল। তখন আমি 'প্রচারিত-বিবেচিত' হয়ে আছি প্রো-পাকিস্তানী বলে; শুনি, প্রো-পাকিস্তানী বিপন্ন শিল্পী-সাহিত্যকদের জন্য কিছুটা গোপন সাহায্যের ব্যবস্থাও নাকি আছে। আমার বেলায় তারও কোন প্রমাণ পেলাম না। ভাবলাম—বিভিন্ন বিদেশী সংস্থায় বইয়ের অনুবাদ করানো হয়; সেদিকে চেষ্টা করি। কিন্তু কোন সুরাহাই হল না। প্রো-ইন্ডিয়ান বা প্রো-আমেরিকান বলে পরিচিত জনদের ধরেও ফল হল নাস্তি।

অবশেষে ইংরেজিতে বই লিখতে পারে — এমন একজনকে পাওয়া গেল। চট্টগ্রাম নিবাসী ব্যারিস্টার এস. এ. সিদ্দিকী। বেশ বড়লোক। ডক্টর মীর ফখরুজ্জামান সাহেবের মাধ্যমে তাঁর একটা পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ করে দিলাম।

www.pathagar.com

টাকা পেলাম বেশ ভালই। অতঃপর আরম্ভ হল তাঁর বিভিন্ন ইংরেজি লেখার অনুবাদ করে এবং নিজেও কিছু সংযোজন করে তাঁর নামে বই তৈরী করে ঢাকা থেকেই সেগুলোর প্রুফ দেখাসহ প্রকাশের ব্যবস্থা করার কাজ। ঘর–সংসার কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার মত রোজগার হতে লাগল। আরও দু'য়েকজনের নামে বই লিখে দিয়েও রোজগার করেছি। তবে ব্যারিস্টার সিদ্দিকীই হয়ে উঠলেন আমার রোজগারের প্রধান উৎস। তাঁর 'রচিত' ও তাঁর নামে প্রকাশিত 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস'–এর অর্ধেকেরও বেশি আমার রচনা। এসব বই–এর রচয়িতা রূপে তিনি তাঁর নামের সঙ্গে আমার নাম দিতেও অনুরোধ করেছিলেন। আমি রাজী হই নি। তখন নামের চাইতে টাকাই আমার একমাত্র কাম্য বস্তু। আমার দিন চলতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এর মধ্যে বড় মেয়ে এইচ. এস. সি. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, বড় ছেলেও কলেজের ছাত্র, অন্যান্যরা স্কুলের পড়ুয়া। অর্থাভাব মানুষকে যে কতটা দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে, তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগলাম। সর্বোপরি, এত অভাব–অসুবিধার মধ্যে নাট্য একাডেমীর ক্লাসও যথাসম্ভব চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

যেসব অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম স্ক্রীনিং বোর্ড কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সহকর্মীর সাক্ষ্যদান সত্ত্বেও আমাকে চাকুরীচ্যুত করার সুপারিশ করে, তার মধ্যে 'মারাত্মক' অভিযোগগুলো ছিলঃ

"Whereas it has come to the notice of the Board that you, Mr. M. Obidullah (Askar Ibne Shaikh). Associate Professor, I.S.R.T., University of Dacca, signed a statement in May, 1971 supporting the activities of the barbarous Pakistani Army after the Army Crackdown on the 25th March, 1971 and went upto the length of saying that Jagannath Hall in the University Campus was a secret arsenal of such military equipment as machine guns and mortars, and the training ground of the "Banagladesh Mukti Fouz" which you knew to be utterly false ;

2. And whereas you often used to talk in favour of the Pakistani Army and displayed Pakistani mentality during the period of Occupation besides speaking in favour of

www.pathagar.com

Pakistan during the Indo-Pakistan war which you knew full well to be the liberation struggle of Bangladesh;

3. And whereas you often used to talk against the liberation struggle of Bangladesh in a taunting way in course of discussion with other teachers of the University and in pursuance of it made observation to the effect that those who had taken up arms against the Pakistani Army were Indian Agents and should be crushed;

4. And whereas after the arrest of Mr. Zahurul Huq, a teacher of the University, on the 17th November, 1971 and on his release thereafter, on the 18th or 19th November, 1971 you enquired from the said Mr. Zahurul Huq whether he does 'Joy Bangla' and whether his arrest was a sequel to that besides making further observation that Syed Nazrul Islam, a friend of Mr. Zahurul Huq, had become President of Bangladesh running and thereby ridiculed the cause of the liberation struggle of Bangladesh; ....."

'অভিযোগগুলো' আমার কাছে যত ঠুনকোই মনে হোক, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত প্রথম স্ক্রীনিং বোর্ডের সুপারিশ মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট আমাকে চাকুরী থেকে অপসারিত করে ১৯৭৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে। তখন একমাত্র করণীয় হিসাবে আমি হাইকোর্টে রীট পিটিশনের মাধ্যমে (WRIT PETITION NO. 336 of 1974) মোকদ্দমা দায়ের করি ১৯৭৪ সালে। কিন্তু মোকদ্দমার সুরাহা হতেও সময় লাগে তো। চাকুরীচ্যুতির প্রায় তিন বছর গড়িয়ে চলল। চেষ্টা করে মোকদ্দমার শুনানীর সময় এগিয়ে আনা হল। এর মধ্যে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা জনাব আবুল ফজল সাহেব আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠান। গেলাম তাঁর দফতরে। তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝলাম— আমি অপরাধমুক্ত বলে তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাই চাকুরী সংক্রান্ত ব্যাপারের সমাধান হিসাবে তিনি আমাকে মোকদ্দমা বাদ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপদে নতুন করে যোগদান করতে বললেন। এভাবে যোগদান করার ব্যাপারে আমার অসম্মতি

www.pathagar.com

জানানোর পর বিকল্প হিসাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে রাজী আছি কিনা জানতে চাইলেন। এ প্রস্তাবেও সবিনয় অসম্মতি জানিয়ে বললামঃ নামের ওপর দালালির ছাপ নিয়ে এদেশে আমি কোন চাকুরীই করব না স্যার। দেশের মাননীয় বিচারপতিদের রায় পেতে আমি আগ্রহী। আইনের মাধ্যমেই আমি কলঙ্কমুক্ত হতে চাই। — তাঁর ব্যবহার থেকে মনে হল, আমার কথায় তিনি অখুশী হন নি।

মহামান্য হাইকোর্টের গেজেট অনুয়ায়ী আমার রীট পিটিশনের শুনানীর তারিখ নির্দিষ্ট হল। আমার পক্ষে আইনজ্ঞ ছিলেন সর্বজনাব মোঃ নূরুল হুদা, মোঃ ইয়াকুব আলী, এম. জি. ভূঁইয়া ও এ. কে. এম. নূরুন্নবী খান। এই রীট পিটিশনের শুনানী হয় ১৯৭৬ সালের ২, ৬ ও ৮ এপ্রিল; এবং রায় প্রদান করা হয় ১৯৭৬ সালের ১৫ এপ্রিল। মাননীয় বিচারপতিগণ উক্ত রায়ের শেষে মন্তব্য করেন; " — From the facts and circumstances stated above, we are satisfied that the impugned resolution of the Syndicate purporting to termination of service of the petitioner was illegal and without any lawful authority."

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের মে মাসে জগন্নাথ হলে পাকিস্তানী আর্মির ক্র্যাকডাউন সংক্রান্ত স্টেটমেন্টে স্বাক্ষর দানকারী ৫৫ জন শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে সবাই ছিলেন ঢাকায় অবস্থানকারী বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী। সর্বজনাব মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, আশরাফ সিদ্দিকী, শাহেদ আলী প্রমুখ সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ এবং খান আতাউর রহমান, ফেরদৌসী রহমান, সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ সঙ্গীত শিল্পীদের মত আমাকেও প্রাণের ভয়েই স্বাক্ষর দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারও এ স্টেটমেন্টে স্বাক্ষর দানকে 'under duress' বা 'বলপ্রয়োগ'-মূলক স্বাক্ষর দান হিসাবে বিবেচনা করত বলে শুনেছি। এবং এ-বিবেচনাতেই এ স্বাক্ষর দানের জন্য কাউকেই হেনস্তা পোয়াতে হয় নি। অথচ আমার বেলায় এ স্বাক্ষর দানই 'প্রথম অপরাধ' বলে বিবেচিত হল।

কিন্তু কেন এমনটি হল? এ প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একাধিক কারণ। আর সেসব একাধিক কারণের মধ্যে রয়েছে জীবনাদর্শের কথা, অধুনা প্রচলিত 'চেতনা'র কথা, এবং তারই প্রেক্ষাপটে আমার নাট্য সংক্রান্ত কার্যাবলী, বিশেষ করে নাট্য একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। 'আসকার রচনাবলী'র পরবর্তী খন্ডে এসব নিয়ে কথা বলার আশা রইল।

www.pathagar.com

মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে অতঃপর যথারীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপদে আমি আবার যোগদান করি এবং এতদিনের বাকী বেতনাদি পেয়ে সংসারের অভাব-অসুবিধা মোচনে সক্ষম হই।

হাইকোর্টের এই মোকদ্দমা প্রসঙ্গে যাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী, তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী। হাইকোর্টে যে সময় তাঁর সাহায্যে রীট পিটিশন পেশ করি, তখন আমি আর্থিকভাবে খুবই সঙ্কটাপন্ন। এমতাবস্থায় ইয়াকুব আলী সাহেব প্রবীণ আইনজ্ঞ জনাব নূরুল হুদা সাহেব ও অন্য দু'জন সহযোগী এডভোকেটকে নিয়ে বিনা পয়সায় আমার কেসের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে দেন। ১৯৭১ সালের সেই ছাব্বিশে মার্চ থেকে আমার সকল বিপদে-আপদে ভাইয়ের মত আমার কাছে ছুটে এসেছেন আমার সশ্রদ্ধ প্রীতিভাজন এই ইয়াকুব আলী সাহেব। অন্য কোন বন্ধুকে তখন কাছে পাই নি। অন্য কথায় বলা যায়, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে আরম্ভ করে অবশেষে ১৯৭৬ সালে হাইকোর্টের মাধ্যমে আমাকে বিপদমুক্ত করে আনা পর্যন্ত জনাব ইয়াকুব আলী সাহেব ছিলেন আমার দুর্যোগ কালের সাথী।

www.pathagar.com

জীবন বৃত্তান্ত

নাম : এম. ওবায়দুল্লাহ সাহিত্যিক নাম : আসকার ইবনে শাইখ
জন্ম : ৩০ মার্চ, ১৯২৫ সাল জন্ম-জেলা : ময়মনসিংহ

শিক্ষা

১৯৮৩ : পিএইচ. ডি.(সমাজ-পরিসংখ্যান... ডেমোগ্রাফি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫১ : এম. এসসি. (পরিসংখ্যান), পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ম-পরিচিতি

১৯৮৪-'৯০ : প্রফেস্যর, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আই. এস. আর. টি.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৮-'৮৩ : পরিচালক, ঐ
১৯৬৭-'৮৪ : সহযোগী অধ্যাপক, ঐ
১৯৫১-'৬৭ : প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা

পি-এইচ. ডি. থিসিসঃ
বিষয় - Incidence of Induced Abortion in Rural Bangladesh
প্রকাশিত নিবন্ধ :

(ক) আন্তর্জাতিক জার্নালে	৫	
(খ) দেশীয় প্রথম শ্রেণীর জার্নালে	৪৪	৪৯
(গ) বিদেশী অর্থ সাহায্যে রিসার্চ রিপোর্ট		১১

থিসিস-তত্ত্বাবধানঃ

(ক) মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য	২১
(খ) পি-এইচ. ডি. ডগ্রীর জন্য	১

www.pathagar.com

সাহিত্য–কর্ম (আসকার ইবনে শাইখ নামে)

প্রকাশিত ঃ

(ক) সামাজিক নাটক–নাটিকা ১৮

[বিরোধ (১৯৪৭); পদক্ষেপ (১৯৪৮); বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৯); দুরন্ত ঢেউ (নাটিকা সংকলন, ১৯৫১); শেষ অধ্যায় (১৯৫২); অনুবর্তন (১৯৫৩); বিল-বাওড়ের ঢেউ (১৯৫৫); এপার–ওপার (১৯৫৬); প্রতীক্ষা (১৯৫৭); প্রচ্ছদপট (১৯৫৮); লালন ফকীর (১৯৫৯) ইত্যাদি।

(খ) ঐতিহাসিক নাটক–নাটিকা ৫৬

[অগ্নিগিরি (১৯৫৭); তিতুমীর (১৯৫৭); রক্তপদ্ম (১৯৫৭); অনেক তারার হাতছানি (১৯৫৭); কর্ডোভার আগে (১৯৮০); রাজপুত্র (১৯৮০) ইত্যাদি; এবং **"রাজ্য-রাজা-রাজধানী"** শিরোনামে ১৪টি নাটিকার সংকলন (১৯৮১) ঃ একটি বিশ্বাস; গোরক্ষ–বিজয়; রাজা হরিশ্চন্দ্র; গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস; নির্বাচিত সম্রাট; সিংহাসন; বিদ্রোহী কৈবর্ত; সাগরের ঢেউ; রক্ত গোলাপ; অশ্বারোহী; বিদ্রোহী তুগরল; সুলতান ও সুফী; আযান; ও জাম–জামরুলের স্বপ্ন;

এবং

"মেঘলা রাতের তারা" শিরোনামে ১১টি নাটিকার সংকলন (১৯৮১)ঃ পলাশীর পথে; পলাশী; পলাশীর কান্না; অন্ধ রাতের ডাক; মন্বন্তর; বিদ্রোহ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; রেনেসাঁ; বাঁশের কেল্লা; ঝড়ের ডাক; ও ঝড়ের রাতে।

তাছাড়া

"কন্যা-জায়া-জননী" শিরোনামে দুই খণ্ডে ৩১টি নারীচরিত্রভিত্তিক নাটিকার সংকলন (১৯৮৭) ঃ নাম–না–জানা মা; কবি রহিমুন্নিসা; নবাব-নন্দিনী যীনাতুন্নিসা; গদীনশীন বেগম; সিরাজ– বেগম লুৎফুন্নিসা; সিরাজ–দুহিতা; ফরহাদ বানু; মনুজান; সুলতানা রাজিয়া; চাঁদ সুলতানা; মহিলা–নবাব; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত; নূরজাহান; শাহ্যাদী জাহানারা; বেগম উদয়পুরী; বিজাপুরের বড়ে সাহেবা; শাহ্যাদী জেবুন্নিসা; ক্রন্দসী কবি গন্না; বেগম হাসরত মহল ইত্যাদি]

(গ) কিশোর কাব্য–নাট্য ও রূপকথা ৬

[দৃষ্টিফুল (১৯৬২); কন্যা ডালিমফুলী (১৯৬২); বাদুড় (১৯৬৩); মুক্তি অভিনব (১৯৮২); ইত্যাদি]

(ঘ) নবজীবনের গান

(একাত্তর–পূর্ব দেশাত্মকবোধক গানের সংকলন সম্পাদনা, ১৯৫৯) ১

www.pathagar.com

(ঙ) অন্যান্য গ্রন্থ

কালো রাত তারার ফুল (ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন, ১৯৮২)	১
বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি (প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯৮৬)	১
মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা (ইতিহাস গ্রন্থ, ১৯৮৭)	১
বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯৯১)	১
প্রফেস্যর গলব্রেথ, প্রফেস্যর হেইলব্রোনার ও প্রফেস্যর বার্লির ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ, এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের লেখা ও বক্তৃতা সংকলনের অনুবাদ (১৯৬১-৬৫)	৫
মোট সংখ্যা ঃ	৯০

অপ্রকাশিত ঃ

সামাজিক ও ঐতিহ্য-ভিত্তিক লোকনাট্য	২৬
প্রাচীন বাংলার উদ্ভব-কথা (সেন আমল পর্যন্ত)	১
বাংলায় ইসলাম (বাংলায় ইসলামের রূপ ও প্রকৃতি)	১
ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস গ্রন্থ)	১
স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার কথকতা	১
অন্যান্য	২

টেলিভিশনে ৩০টির মত নাটক ও ৮টি নাট্য-সিরিজ এবং রেডিও-তে ৫০টিরও বেশি নাটক প্রচারিত। ১৯৪৭ সালে 'বিরোধ' নাটক প্রকাশের মাধ্যমে নাট্যকার হিসাবে আসকার ইবনে শাইখের আত্মপ্রকাশ। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত নাটক-নাটিকা, দেশাত্মবোধক গানের সঙ্কলন-সম্পাদনা, ইতিহাসের গল্প, ইতিহাস, অনুবাদ ও অন্যান্য প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা ৯০। সামাজিক, ঐতিহ্য-

www.pathagar.com

ভিত্তিক লোকনাট্য, গীতিনাট্য ও অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ–সংখ্যা ৩২।'বাংলা মঞ্চ–নাট্যের পশ্চাৎভূমি' নামক প্রবন্ধ–গ্রন্থে লেখক পরিচিতি প্রসঙ্গে জনাব তোফা হোসেন বলেন ঃ "– জনাব শাইখ মঞ্চ– রেডিও– টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক লিখে আসছেন এবং নির্দেশনা করছেন। এদেশের মানুষের মন ও মানস, তাদের ধর্মীয়–সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনা, তাদের জীবন সংগ্রাম ও আশা–বাসনার প্রতিফলন তাঁর নাট্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনলস নাট্যকর্মী। বাংলা নাটকের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। চারদিকে আজ নাট্য–প্রয়াসের যে শুভ কর্মচাঞ্চল্য বিদ্যমান, তার সূচনাকারীদের প্রধান পুরুষ জনাব শাইখ। পঞ্চাশ দশকের আরম্ভ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাইরে এবং ৭০ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত স্বগৃহে 'নাট্য একাডেমী' স্থাপন করে তিনি বহু উৎসাহীকে হাতে–কলমে নাট্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একজন সফল অভিনেতাও।"

সাহিত্য পুরস্কার ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৮৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার (১৯৮৭), টেনাশিনাস (টেলিভিশন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার সংসদ) পুরস্কার, (১৯৮৯)
এবং বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৯১)।

ঠিকানা ঃ আসকার ইবনে শাইখ
২৫ গ্রীন কর্ণার, গ্রীন রোড
ঢাকা – ১২০৫
ফোন (বাসা) ঃ ৮৬১৩২০

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ অফিস কক্ষে কার্যরত আসকার ইবনে শাইখ

'লালন ফকীর' নাটকের একটি দৃশ্যে উজ্জ্বল, সোহেল, শোয়েব ও তাহসিন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com